অনেক লোক আসিয়াছে আমাদের পশ্চাৎ অনেক লোক আসিবে। নির্জ্জন মরুতে আমি একমাত্র জীব নহি। অনেক লোকের সহিত আমার সম-দুঃখ-সুখতা। আমার সমক্ষে আজ যে ঘোরপ্রশ্ন, যে ভীষণ সন্দেহ, সেই ঘোর প্রশ্ন, সেই ভীষণ সন্দেহ অনেক পূর্ব্বতন লোকদিগের হৃদয় আক্রমণ করিয়াছে, মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছে। যদি আমাদিগের প্রত্যেককে স্বকীয় প্রতিভা ও আয়াসবলে প্রতি প্রশ্নের উত্তর করিতে হইত, আমাদিগের জ্ঞান আমাদিগের সৃজন করিতে হইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্র মনুষ্য কত ক্ষুদ্র থাকিত, পশু ও মানবের জ্ঞানমূলক পার্থক্য কোথায় বিলোপ পাইত। মানুষ সৃষ্টির প্রধান,—মানুষ দেবত্বের প্রতিমায় গঠিত। কেন? কবর ও চিতানলে মানবের জ্ঞান বিলুপ্ত বা ভস্মীভূত হয় না বলিয়া কাহারও উপার্জ্জিত জ্ঞান নষ্ট হইবার নহে। একের জ্ঞানে অপরাপর সকলেই জ্ঞানবান্। যাহা একজন অনেক আয়াসে লাভ করিল তাহাতে তাহার বিশ্বময় জ্ঞাতিমণ্ডলী অংশীদার। এইরূপ জ্ঞানের সাধারণ-তন্ত্র জ্ঞানের উপচয়সাধন করিতেছে। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিরা বাণীকে দেবতা করিয়াছেন, শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

অতএব দেখুন, আমরা কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। কত শত দেশে, কত শত বার, কত শত ব্যবস্থাপক কত শত দায়বিধি সংস্থাপন করিয়া সমাজ স্থিতি-রক্ষায় চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আমরা কি গুরুতর দায়ের, মহত্তর বিভবের অধিকারী। মানব জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার উহার প্রধান অধিকার। এখানে দেশকাল ভেদ নাই; কি যাজ্ঞবল্ক্য, কি পরাশর, কি সক্রেটিস, কি প্লেটো যিনি যে জ্ঞানরত্ন সমাহরণ করিয়াছেন তাহা সকলই আমাদের। এখানে গোত্রভেদ নাই, পুরুষ ভেদ নাই, বয়োভেদ নাই একটী নির্ব্বিরোধ ভ্রাতৃভাবময় সাধারণ-তন্ত্র। যে এই মহান্ উত্তরাধিকার বিসর্জ্জন করে, যে আপনাকে পৃথিবীর একমাত্র সন্তান জ্ঞানে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সত্য-রাজ্যে প্রবেশ করিতে চায়, অভিমান-বশ হইয়া অতীত ও অনিব্যমাণের সহিত জ্ঞাতিত্ব অঙ্গীকার না করে, সে মূর্খ, সে অন্ধ। আমাদের জীবন গহনে মহাজন প্রোক্ত-বাণীই অনুসরণীয় পাদচিহ্ন স্বরূপ। সাধুজনের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ আমাদিগের পরম সহায়। মানবের প্রধান রত্ন জ্ঞান, পুস্তক সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার।

মহামতি বেকন বলিয়াছেন পুস্তকের জ্ঞানের উপর আর একটী জ্ঞান আছে যাহাতে জ্ঞানের ব্যবহার শিখায়। সাংসারিক লোকের পক্ষে এটি একটী অতি বিজ্ঞ কথা। কিন্তু টাকা পয়সার কথা ছাড়িয়া দিলে, আরও সূক্ষ্মতর রূপে দেখিলে, তাঁহার কথার আধ্যাত্মিক ক্ষুদ্রতা স্বতঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রফেসর বেনের মত লোকেরা বলুন না কেন জ্ঞান অবান্তর উদ্দেশ্য; উপায়, উদ্দেশ্য ভাব ধারণ করিয়াছে। জ্ঞান সমাজের বা নিজের সুখস্বচ্ছন্দের উপায় মাত্র। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সম্বন্ধে এ কথা সত্য কখনই হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন সত্য জানিলে তোমরা স্বাধীনতা লাভ করিবে। শাক্য মুনি বলিয়াছেন জ্ঞানাম্মুক্তি র্নসংশয়ঃ। মানুষ চক্ষুষ্মদন্ধ; মোহে আবৃত হইয়া রহিয়াছে; সত্যাসত্যের বিচার করিতে পারে না। জ্ঞান এই মোহ তিমিরের সূর্য্য; জ্ঞানালোক উদিত হইলে তমোবিভূতি স্বতই বিলোপ হয়। নেত্র অব্যাহত ভাবে অর্থ দর্শন করে; অবিদ্যার শৃঙ্খল আপনা হইতে চ্যুত হয় ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা স্বয়ং উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন বহু জ্ঞানী পুরুষেরা মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় কদাচার-পরায়ণ, অতএব জ্ঞান নিষ্ফল। কিন্তু যে জ্ঞান সৎকার্য্য প্রবর্ত্তক ও অসৎকার্য্য নিবর্ত্তক নহে, সে জ্ঞান জ্ঞান

পদবীর যোগ্য নহে। নলিনীদলগত তুষার বিন্দু এইরূপ ক্ষীণজ্ঞানের উপমাস্থল। কি সুন্দর বিন্দুটী! স্থূলমুক্তাটীর মত নাচিতেছে! একটী বাত্যা আসিল অমনি বিন্দুটী মুক্তার মত খসিয়া পড়িল। যখন প্রলোভন নাই, তখন ক্ষীণমতি পুরুষের জ্ঞান উজ্জ্বল সুন্দর দেখায়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতম কারণে উহা খসিয়া পড়ে। হৃদয়ের সহিত জ্ঞানের একত্ব যতক্ষণ না হইবে, প্রতি গ্রন্থিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান দৃঢবদ্ধ না হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কমলদল ও নীহার বিন্দুর ন্যায় আমাতে ও আমার জ্ঞানের পার্থক্য থাকিবে, ততকাল জ্ঞানের রাজ্য অতি দুর্ব্বল, উহার স্থিতি সন্দেহস্থল। কিন্তু যে জ্ঞান বস্তুতঃ হৃদয়ঙ্গম হয়, যে জ্ঞান জ্ঞানীর আত্মার অভেদ অংশ হইয়াছে সেই জ্ঞানই জ্ঞান। সুরাপায়ীর সুরাপানের নিন্দায় জ্ঞান তাহার জ্ঞান নহে, সে সেই জ্ঞানকে কোন পুস্তক হইতে, বা ব্যক্তি হইতে বা সমাজ হইতে ধার করিয়া লইয়াছে। সে ব্যক্তি জ্ঞানের নহে, জ্ঞানও তাহার নহে।

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি বিচিত্র; ইহা তিনটী বস্তুর সমবায়-মনঃ, হৃদয় ও কার্য্য প্রবর্ত্তিনী ইচ্ছা। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হৃদয় ভক্তি প্রভৃতি ভাবের স্থান ও ইচ্ছা কার্য্য প্রবর্ত্তন। এই তিনটীর সমবায় না থাকিলে মানবের প্রকৃতি যন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। সাম্যের ভঙ্গ হইল ও সাম্য সম্ভব উন্নতির সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল। জ্ঞানবাদী জ্ঞানকে সিংহাসন দেন, ভক্তিবাদী ভক্তিরই প্রাধান্য প্রকটন করেন, কর্ম্মবাদী কর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ফলতঃ তিনই এক, একেই তিন। প্রভেদ অভেদ তাহাদের প্রাকৃত ধর্ম্ম, মেল তাহাদের জীবন। প্রকৃত সাধুজনে কখনও তাহাদিগের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না। তাহার সুন্দর হৃদয়ে তিনটী সুন্দর ভাই ভগিনী হাত ধরাধরি করিয়া সদাই নৃত্য করিতেছে। কি স্বর্গীয় নৃত্য, কি প্রেমালিঙ্গন, ঠিক যেন তিনটী সুন্দর পুত্তলি এক কলকাটিতে নাচিতেছে—খেলিতেছে।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

অনাহূত।

তোদের মতন, অতিথি এমন
দেখিনি ত কভু জনমে।
কোন্ দেশে ছিলি, কোথাহতে এলি,
জুড়াতে তাপিত মরমে।
চুরী করে খাস্ কেড়ে নিয়ে যাস্
উলটী পালটী সব।
বকিবারে গিয়ে, ফেলি যে হাসিয়ে।
কি মধুর উপদ্রব!

বকিয়ে, বকিয়ে, দিলি মেরে ফেলে
একই কথা শত বার,
কোথায় শিখিলি, ভাঙা চোরা বুলি?
উত্তরে মেনেচি হার!
উঁকি ঝুঁকি চেয়ে, ছুটে যাও ভয়ে,
পুনঃ এসে, ধর গলে,
মিঠে মিঠে হেসে, কোলে চড়ে বসে,
প্রেম উৎস দাও খুলে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিভা।

[৭ম সংখ্যা সন ১২৯৪ সাল ১ম খণ্ড]

বাল্যবিবাহ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

এক্ষণে আমরা "নবজীবনের" "হিন্দু-বিবাহ" নামক প্রস্তাবের শেষ অংশে আসিয়া পড়িলাম। এই অংশে লেখক "কম বয়সে বিবাহের ফলস্বরূপ শারীরিক অপকার হয় কি না" এই কথার আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি ওকালতির পাকা রকম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি যে শাস্ত্র লইয়া এতক্ষণ মহা গোলযোগ বাধাইয়াছিলেন, এ অংশে সে শাস্ত্রাড়ম্বর নাই। কারণ, শাস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে। শাস্ত্র বিরুদ্ধে বলিয়া তিনি কেবল নিজ যুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমুদায়ের আলো[illegible]র পূর্ব্বে একবার আমাদের শাস্ত্রোপ[illegible]না করা যাউক।

সমা[illegible]ব লিখিবার পূর্ব্বে লেখক বি[illegible]তেন যে "বাল্য বিবাহের ফল[illegible]শারীরিক অপকারিতা" বিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্য বড় অনুকূল নহে। এজন্য তিনি সেই শাস্ত্রোক্তি একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে কেমন শাস্ত্রোক্তি একেবারেই জাহার্ণবে দিয়া গিয়াছেন, দেখুন:—

"কিন্তু চরক শুশ্রুতের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর বেন্জামিন্ ব্রোডির

মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, যিনি যেমন করিয়াই বলুন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য-বিবাহের ফল, তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"*

এখানে লেখক হিন্দু আয়ুর্ব্বেদকে, একেবারে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "শারীরিক দুর্ব্বলতা" সপ্রমাণিত হয় না। আয়ুর্ব্বেদ ত সে কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে নাই। আয়ুর্ব্বেদ শুদ্ধ মত মাত্র দিয়াছে, সেই মত হিন্দুর শিরোধার্য্য। লেখক আয়ুর্ব্বেদের কিছু ধার ধারেন না, অথচ কি সাহসে হিন্দু হইয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদকে অগ্রাহ্য করিলেন? অন্য স্থলে এত হিঁদুয়ানি দেখাইয়া এখানে সেই হিঁদুয়ানি ছাড়েন কেন? তাঁহার নিজ যুক্তি কি এত পাকা যে এখানে হিঁদুয়ানির বাঁধ ভাঙ্গিতে অনায়াসে সক্ষম? [illegible] জন্য বুঝি তিনি "নবজীবনে" আর চ[illegible]ক শুশ্রুত কে আসরে আনেন নাই।

লেখকের যুক্তিই ব[illegible] তিনি বলিয়াছেন "বাঙ্গালী[illegible] দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য [illegible] ফল তাহা সপ্রমাণিত" হয় [illegible] শুশ্রুত কিছু বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার [illegible] কারণ অনুসন্ধান করেন নাই যে বলিবেন কোন্‌টী তাহার প্রধান কারণ। আমরা প্রধান কারণ দেখিতেছি না। আমরা বাল্য বিবাহের ফল কি, তাহাই দেখিতেছি। যদি বাল্য-বিবাহের ফল শারীরিক দুর্ব্বলতা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার অপরাপরও কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু অপরাপর কারণ থাকিলে যে বাল্য বিবাহ অন্যতম কারণ নহে এমত প্রমাণিত হয় না। দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ না হউক, অপ্রধান কারণ বাল্য বিবাহ হইলেই লেখকের যুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল।

চরক শুশ্রুত বাল্য-বিবাহসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, তাঁহারা অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদনের ফলসম্বন্ধে মত দিয়া গিয়াছেন। শুশ্রুতের মত এই:—

"ঊন ষোড়শ বর্ষায়াম্ প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্
যদ্যাধিত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে
জাতোবান চিরং জীবেদ্ জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়
স্তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"

অর্থাৎ "২৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষের ঔরসে ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে প্রায় কুক্ষিতে মৃত হইবে, কোন স্থলে যদি ঐরূপ ঘটনা না হয়, তবে জন্মিবার পরে অধিক দিন জীবিত থাকিবে না, যদি বা জীবিত থাকে তবে দুর্ব্বল হইয়া জীবিত থাকিবে। অতএব অত্যন্ত বালিকার গর্ভাধান যেন না হয়।" এস্থলে দেখা গেল অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদনই দোষ, বিবাহ দোষ নহে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলেই যে অল্প বয়সে সন্তানোৎপাদন করিতে হইবে শাস্ত্রের ব্যবস্থা তাহা নহে। এই জন্য হিন্দু জাতি মধ্যে "দ্বিরাগমনের" ব্যবস্থা। দ্বিরাগমনের ব্যবস্থা থাকাতে আয়ুর্ব্বেদের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ নাই। স্মৃতিতে কন্যার বিবাহ অল্পবয়সে ব্যবস্থা থাকাতে কিছু এমন বুঝায় না যে

* "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত লেখকের "বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য" নামক প্রস্তাবের শেষাংশ দেখ।

অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদন ও করিতে হইবে। যদি শাস্ত্রানুগামী হইয়া চলা যায়, তবে অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদনও হয় না। অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদন না হইলেই শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটে না। অতএব, ঠিক বাল্যবিবাহের ফল শারীরিক দুর্ব্বলতা নহে। কিন্তু এক্ষণকার কালে শাস্ত্রশাসন ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে, এবং দ্বিরাগমনের ও তত বাঁধাবাধি নিয়ম নাই, সুতরাং এক্ষণে বাল্যবিবাহ জন্য অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন হইয়া বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটিতেছে। বাল্যবিবাহ বাধ দিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অল্পবয়সে যাহাতে সন্তানোৎপাদন না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলে সকল দিক বজায় রহিল। সো *

আয়ুর্ব্বেদ হিন্দুজাতির প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র, এজন্য আয়ুর্ব্বেদের মত হিন্দুর নিকট অতি শ্রদ্ধেয়। এই চিকিৎসাবিদ্যাকে লেখক শারীরিক বিজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন, "শারীরবিজ্ঞান মানিতেই হইবে।" শারীর বিজ্ঞান স্ত্রীগমন, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য।" নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ে শারীর বিজ্ঞানের মত প্রতিপালন করা কিরূপ তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, লেখক নিজেই স্বীকার করেন যে সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে শারীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পালন করা কর্ত্তব্য। তবে তিনি আবার কি বলিয়া চরক শুশ্রুতকে রসাতলে দিতে চাহেন? ওকলাতিতে অন্ধ হইয়া লেখক একবার এদিকে আসেন একবার ওদিকে যান। নিজের মত অটল যুক্তিতে স্থির করিয়া তবে চরক শুশ্রুতকে অবহেলা করা উচিত ছিল।

দ্বিরাগমনের কথা উল্লেখ হওয়াতে আমরা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও লেখকের একটি মত সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। লেখক বলেন হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার মণ্ডলে বাল্যবিবাহের একান্ত আবশ্যক, যে হেতু যে কন্যাকে পাঁচজন লইয়া ঘর করিতে হইবে, তাহাকে অল্পবয়স হইতে শিক্ষা দিয়া পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া উচিত। এ মত সম্বন্ধে বিপক্ষগণ বলেন যখন একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তখন এ যুক্তির বল কমিয়া পড়িতেছে; একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা থাকিলেও কি বাল্যবিবাহের আবশ্যকতা হয়? দ্বিরাগমনের ব্যবস্থা থাকাতে কি বালবধূকে অল্পবয়সে শ্বশুরালয়ে সচরাচর আনা হয়? বিবাহিতা কন্যা যতদিন না একটু সিয়ানা হইত, যত দিন না শ্বশুর ভাসুরের সম্মান জানিত, যত দিন না স্বামীর সমাদর জানিয়া শুশ্রূষার যোগ্যা হইত, ইতি পূর্ব্বকালে তত দিন তাহাকে পিত্রালয়েই রাখা হইত। এই জন্য পূর্ব্বে দ্বিরাগমন প্রায় কন্যার ১৪। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম নহিলে ঘটিত না। আজ কাল এ নিয়ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে চলিলে দ্বিরাগমনের নিয়ম পূর্ব্বকার মত রাখাই উচিত। সমাজে যখন দ্বিরাগমনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন কি অল্প বয়সে বিবাহ

হইলেই কন্যাকে অল্পবয়স অবধি একান্নবর্ত্তী পরিবার মণ্ডলে রাখা হইবে, না রাখা উচিত বলিয়া শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত বোধ হয়? আবার দেখুন বাল্য শিক্ষা কি জন্য? শিক্ষার উদ্দেশ্য—ভবিষ্যৎ ফল। লোকে শিক্ষা দেয় ভবিষ্যতে ভাল হইবার জন্য। কিন্তু বালিকা কন্যা যখন শ্বশুরালয়ে প্রথমে আসেন, তখন তাহার শ্বশুরালয়ের অবস্থা ও গঠন যেরূপ থাকে, বধূ বড় হইলে কি সে রূপ থাকে? না তখন শ্বশুরকুলে যে সকল গুরুজন বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহারা চিরকালই বর্ত্তমান থাকেন? শ্বশুরকুল ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তবে বাল্যশিক্ষা ভবিষ্যতের উপযোগী হইবে কি প্রকারে? শ্বশুরালয়ে আসিয়া শিখিবেই বা কি? যাহা শ্বশুরালয়ে শিখিবে, পিত্রালয়ে কি তাহা শেখা হয় না? তবে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা থাকিলে বাল্যবিবাহের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় কই?

সে যাহা হউক, লেখক বঙ্গদর্শনে যে কথা বলিয়াছিলেন আমরা তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন—"বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন, যে শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতি হস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায়, এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু ঢেক শঙ্করের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর্ বেন্‌জামিন্ ব্রোডির মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্যবিবাহের ফল, তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা পত্নী তাহার জন্য নয়। সে পশু; বালিকারূপ পবিত্র কুসুম তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকাপত্নী তাহারই প্রাপ্য।"

তবে কি লেখক বলিতে চান, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য মনে মনে স্মরণ রাখিয়া শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রতি অশ্রদ্ধা করিব? শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করা কি হিন্দুধর্ম্মের প্রয়োজন নহে? যাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, যাহাতে সন্তান সন্ততি রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, যাহাতে তাহাদের আয়ুঃ কমিয়া যায়, তাহা করা কি কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম সঙ্গত? বালিকার অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদন হইলে শুদ্ধ যে সন্তান সন্ততিগণ দুর্ব্বল হয় এমত নহে, নিজে প্রসূতীও রুগ্ন এবং অনেক স্থলে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হন। যিনি সেই কলিকারূপ পবিত্র কুসুমের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে পারেন, এবং নিজ সন্তান সন্ততি গণের আয়ু কমাইতে পারেন, তাঁহার উদ্দেশ্য যত বড় আধ্যাত্মিক হউক না কেন আমরা বলি সেই

পশু। বালিকারূপ পবিত্র কুসুম তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না।

লেখক বৈজ্ঞানিক মতামত লইতে বড নারাজ, যেহেতু বৈজ্ঞানিক মত তাঁহার বিপক্ষে। তিনি বলেন "বিজ্ঞানের কোন কথারই ত একটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায না, সকল কথাতেই ত (Theory, hypothesis) মতের মাবামাবি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি দেখিতে পাই।" তবে তিনি বিজ্ঞানের মীমাংসা কিরূপে লইতে পারেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন, তাহা কি আমাদের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারে? সন্তানোৎপাদনের ফলাফল সম্বন্ধে চবক ও শুশ্রুতের যে মত, তাহার বিরোধ কি হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রে কোথাও দেখিতে পান? যদি না পান, তবে তিনি চরক শুশ্রুতকে বেনজামিন ব্রোডির দলে ফেলিলেন কেন? আমাদের শারীরিক নিয়ম সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের কথা ও মতামত খুব সাবধানে গ্রহণ করা উচিত সত্য, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের মত কি তদ্বৈধচ হইতে পারে? আয়ুর্ব্বেদের যে মত নির্ব্দ্বন্দ্ব ও নির্ব্বিরোধে উক্ত হইযাছে, তাহা কখনই অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

লেখক নিজেই বলিতেছেন যে "শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতি হস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বযসে সন্তানোৎপাদন করিয়া তিনি যেমন স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন আজকাল এ সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায়।" যাহা তিনি অনেকের মুখে শুনিতে পান তিনি তাহা মানিতে চান না। কিন্তু তিনি স্বকীয় মতের অনেক অনুকূল কথা অনেকের কথায় মানিয়া লইয়াছেন। তার বেলা কোন ওজোর আপত্তি ও সংশয উঠে নাই। তাহা তিনি স্থির সিদ্ধান্তরূপে শিরোধার্য্য করিযা লইযাছেন। এই দেখুন নিজ অনুকূল মত সম্বন্ধে লেখক কি বলিতেছেন—

"ষষ্ঠ কথা এই (১) বাঙ্গালীর আঁতুড় প্রণালীর দোষে বাঙ্গালায় অনেক শিশু মরে এবং বাঙ্গালীর শরীর প্রথম হইতেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, এ কথা সকলেই বলিযা থাকেন। (২) বাঙ্গালী সন্তান পালন করিতে জানে না বলিযা অনেক বালক বালিকা মরে এবং বাঙ্গালী প্রথম হইতেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। (৩) বাঙ্গালীর খাদ্য খুব পুষ্টিকর নয়, এবং বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণ আহার পায না বা করে না—এ কথা সকলেই জানেন। (৪)বাঙ্গালী ব্যাযাম অভ্যাস করে না এবং সেই জন্য বাঙ্গালীর দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয না, বাঙ্গালীর মধ্যে লাঠিয়ালদিগের ন্যায় যাহারা ব্যাযাম অভ্যাস করে তাহারা বেশ বলিষ্ঠ এ কথা সকলেই জানেন ও বলিয়া থাকেন। (৫) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা হেতু বাঙ্গালি অস্বাস্থ্যকর প্রণালীতে জীবনযাপন করে একথা সকলেই বলিযা থাকেন। (৬) এখনকার শিক্ষা প্রণালীর দোষে বাঙ্গালী রুগ্ন হইতেছে একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। (৭) বাঙ্গালীর দুর্ব্বলত্ব হইবার আরও অনেক কারণ আছে। জড়বিজ্ঞানের Inductive প্রণালীতে যদি বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ নিরূপণ হয়, তবে এই সমস্ত

কারণ গুলি হইতে কতটা দুর্ব্বলতা আছে তখন সেই অবশিষ্ট দুর্ব্বলতা বাল্যবিবাহ ঘটিত কিনা বিচার করিতে হইবে। এই সমস্ত কারণ হইতে কতটা দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় এই সমস্ত কারণ নষ্ট করিলেই নির্ণয় করিতে পারা যায়, নতুবা পারা যায় না। অতএব, এই সকল কারণ নষ্ট করাই সংস্কারক দিগের সঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত কাজ।"

এস্থলে লেখক একেবারে মন্ত্র পড়িয়া গেলেন। "একথা সকলেই বলেন" "একথা অনেকেই বলেন" এই মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করিয়া তিনি নিশ্চয় স্থির করিলেন যে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ আর সবই, কেবল বাল্যবিবাহ নয়। অথচ পূর্ব্বেই লেখক নিজেই বলিয়াছেন যে বাল্যবিবাহ যে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ একথা অনেকেই বলেন। তিনি "সকলের" স্থানে সাবধান হইয়া "অনেক শব্দ" ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু সে কৌশল করিলেও "সেই অনেকে বলেন"ও তাঁহার নিজ মন্ত্রের ভিতর আসিয়া পড়িল। তিনি (৬) মত "অনেকে" বলিয়া থাকেন বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। যে যুক্তি অনুসারে তিনি সকল মতই গ্রহণ করিয়াছেন সেই যুক্তি অনুসারে কেবল বাল্যবিবাহের অপকারিতার মতটী বাদ দিলেন, এ কি রকম যুক্তি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। একে কি পাকা ওকালতি বলে না?

আবার দেখুন লেখক শারীর বিজ্ঞানের মত খুব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ না হইলে লইতে চাহেন না। তিনি বলেন শারীর বিজ্ঞান "যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য।" এর বেলা লেখকের খুব আঁটাআঁটি। কিন্তু যে মত গুলি "সকলেই বলেন" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে? কৈ তাহা ত দেখিতে পাই না অথচ লেখক সে গুলিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

ঐ ষট্‌বিধি মত তো কেবল একটা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল, কিন্তু বাল্য বিবাহের ফলাফল ঠিক কিনা তাহার বেলাই লেখক "জড়বিজ্ঞানের Inductive প্রণালী" আনিয়া ফেলিলেন। লেখক কেন বলুন না যে "জড়বিজ্ঞানের Inductive প্রণালীতে যদি বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ নিরূপণ হয়," তবে তদুক্ত ষট্‌বিধ কারণ কি বাস্তবিক বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। একথা না বলিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন Inductive প্রণালীটি কেবল বাল্যবিবাহের ফলাফল নির্ণয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে। বাঙ্গালির "দুর্ব্বলতা বাল্য বিবাহ ঘটিত কিনা বিচার করিতে হইবে।" এর বেলাই যত বিচার আর অন্যের বেলা "সকলেই বলিয়া থাকেন" বলিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত! এ কিরূপ ওকালতি!

যদি বিচার করিয়া লইতে হয়, সকল বিষয়ই বিচার করিয়া লওয়া উচিত। লেখক কোন্ বিচারে স্থির করিলেন যে বাঙ্গালির আঁতুড় প্রণালী খারাপ, এবং বাঙ্গালি সন্তান পালন করিতে জানে না? লেখকের

বিপক্ষেরা বলিয়া থাকেন বাঙ্গালীর আতুড় প্রণালী বেশ এদেশের উপযোগী এবং অপরাপর জাতিতে যেরূপ সন্তান লালন পালন করেন বাঙ্গালিও সেই রকম করেন। যে সকল নিয়ম বাঙ্গালা দেশের উপযোগী সেই নিয়মানুসারে বাঙ্গালি সন্তান পালন করিয়া থাকে। তবে মরাবাঁচা কাহার ও হাত নয়। লেখক কি হিন্দুর জন্ম জন্মান্তরের মত এবং বিধির নির্ব্বন্ধ ও অদৃষ্টের কথা এ সময় ভুলিয়া গেলেন? বাঙ্গালির খাদ্য খুব পুষ্টিকর নয় একথা কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি বিচার করিয়া লইয়াছেন? না গো-খাদকদের কথা লইয়া বলিয়াছেন? লেখক বলেন সকল জাতিতে যে পরিমাণে আহার পায় বাঙ্গালি সে পরিমাণে পায় না। লেখকের বিপক্ষেরা বরং বলিতে চাহেন অপর সর্ব্বজাতি অপেক্ষা শাকান্ন ভোজী বাঙ্গালী বেশী আহার পায়। লাঠিয়াল সর্ব্বজাতিতে যেরূপ বলবান বাঙ্গালিতেও সেই রূপ বলবান এবং সর্ব্বজাতিতে অপরা পর লোক যেমন ব্যায়াম অভ্যাস করে, বাঙ্গালি তদপেক্ষা কিছু ন্যূন ব্যায়াম করে না। বাঙ্গালীর ছেলেপুলে ও ভদ্রলোক সকলই অপর জাতির ছেলে পুলে ও ভদ্রলোকের মত সমান শরীর চালন করিয়া থাকে। সাধারণ লোকে যেমন সকল দেশেই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, বাঙ্গালী তদপেক্ষা কিছু বেশী অনভিজ্ঞ নহে। এসকল কথাই লেখকের বিপক্ষগণ বলিতে যদি প্রস্তুত থাকেন তবে লেখকের উক্ত ষট্‌বিধ সিদ্ধান্তের দশা কি হয়? লেখক এক কথায় স্বীকার করিলেন বিপক্ষেরা এক কথায় তাহা সমুদায় অস্বীকার করিলেন সবই ফুরাইয়াগেল। তখনই কি চরক শুশ্রুতের মত জোর করিয়া উঠিতেছে না। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া লেখক যাহা স্থির করিয়াছেন, আগে সে সমস্ত কারণ প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্ণীত হউক তবে ত সংস্কারকগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন। লেখকের কথায় সে সকল কারণকে তাঁহারা লইতে পারিবেন না। সে সকল বিষয়ে যাহাদের বলিবার অধিকার আছে যেমন বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের বলিবার অধিকার আছে, যদি তাঁহারা কোন কথা বলিতেন তবে ত গ্রাহ্য হইত। বাল্যবিবহের অপকারিতা সম্বন্ধে যাহার বলিবার অধিকার আছে, সেই হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যার মত গ্রহণ করা এই জন্য সংস্কারকদিগের উচিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে অষ্টবিধ বিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে বাল্য বিবাহ জন্য অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন হইলে সেই সন্তানেরা দুর্ব্বল হইত দেখিয়া শুশ্রুত ও চরক নিজনিজ মত দিয়াছেন। তাঁহাদের মত পরীক্ষার ফল অপসিদ্ধান্ত নহে।

লেখক যে রূপ অন্যায় ওকলাতি করিয়া বাল্য বিবাহের অপকারিতা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহার নমুনা আমরা দেখাইলাম। তিনি আর ও উটিকতক কথায় তাহা উড়াইতে চাহেন। তন্মধ্যে একটি কথা তিনি শোভাবাজারের রাজবাটির খৃষ্টান বক্তার নিকট হইতে ধার করিয়া বলেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেও বাল্য বিবাহ করে অথচ তাহারা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ।

তাহারা বাল্যবিবাহ করে সত্য, কিন্তু তাহারা কি বালবধূর সহিত অল্পবয়সে সহবাস করে? তাহাদের সন্তানাদি কি কন্যার অল্প বয়সে সমুৎপন্ন হয়? বিবাহ অল্পবয়সে হইলে ক্ষতি নাই সন্তানাদি অল্পবয়সে না হইলেই তাহাদের বলবান হইবার সম্ভাবনা। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দ্বিরাগমনের বিলক্ষণ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। তথায় অনেক বয়সে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে আনা হয় এবং তজ্জন্য কন্যার তরুণ বয়সে সন্তানোৎপাদন হয় না।

এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে দ্বিরাগমনের বাঁধাবাঁধি নিয়মনাই সুতরাং কন্যার অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদন হইতেছে এবং তজ্জন্য তাহাদের দুর্ব্বল হইবারই কথা। পশ্চিমের জল হাওয়ার গুণে ও লোকে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে।

লেখক বলেন বাঙ্গালার জলহাওয়ার দোষে লোকে দুর্ব্বল হয়। বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষ যদি দুর্ব্বলতার কারণ হয় আর অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদন হওয়া যদি অন্য বিধ কারণ হয় তবে যে দেশে দুই কারণই বর্ত্তমান সে দেশে তাহার একটী কে নিবারণ করা কি উচিত নহে? জল হাওয়ার দোষ কেহ নিবারণ করিতে পারে না, কিন্তু যে দোষ নিবারণ করা যায় তাহা কি নিবারণ করা উচিত নহে? জলহাওয়ার দোষে একেত লোকে দুর্ব্বল হইতেছে আবার অল্পবয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়া আরও দুর্ব্বল হইবে? জলহাওয়ার দোষে যদি বাঙ্গালী জাতি দুর্ব্বল হয় সে দোষ কিছু সংস্কারকেরা অপনয়ন করিতে পারেন না, কিন্তু যে দোষ নিবারণ করিতে তাহাদের হাত আছে সেই দোষ নিবারণ করা তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। সেই দোষ যে বাস্তবিক দোষ, আয়ুর্ব্বেদ তাহার প্রমাণ।

লেখক আর ও বলেন 'ট্যাস ফিরিঙ্গিরা বাল্যবিবাহ করে না, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বলবান নয় অতএব শারীরিক দুর্ব্বলতা বাল্যবিবাহের ফল নহে। ফিরিঙ্গিরা যে বাঙ্গালি অপেক্ষা বলবান নহে এ সিদ্ধান্তটি কি বৈজ্ঞানিক কোন প্রণালী ক্রমে সিদ্ধ করা হইয়াছে, না কেবল মুখের কথা মাত্র। যদি কেবল অনুমান মাত্র হয়, তবে লেখকের বিপক্ষগণ বিপরীত কোটির অনুমান করিলে সে অনুমানের খণ্ডন করিবার কি কোন উপায় আছে? তিনি কেমন করিয়া জানিলেন ফিরিঙ্গিরা বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান নয়?

আধুনিক বাল্যবিবাহের ফল স্বরূপ সন্তানগণের দুর্ব্বলতা লেখক এই রূপ কৌশলে উড়াইতে চাহেন৭ "কৌশলে" বলিবার কারণ এইযে তিনি এই বিচারে যতটা কৌশল খেলিয়া ছেন, যুক্তি তত দেখাননাই। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যাহা ইচ্ছা তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া কতকগুলি মত ধরিয়া লইয়াছেন, তার বেলা বিচার নাই, যুক্তি নাই, বৈজ্ঞানিক ন্যায় প্রণালী নাই কেবল যত বিচার বিপক্ষের কোটি গ্রহণ করিবার সময়। কিন্তু লেখকের জানা উচিত ছিল তিনি যে কৌশলে বিপক্ষ কোটি উড়াইতে চাহেন, সেই কৌশলেই তাঁহার নিজ কোটি

সমুদায় উড়ান যায়। তিনি কি কতিপয় সাজান কথা বলিয়া বিপক্ষের চক্ষে ধূলি দিতে চাহেন ?

অল্প বয়স হইতে সন্তানোৎপাদন করিয়া প্রসূতির স্বাস্থ্য শীঘ্র ভঙ্গ হইয়া যায়—বিপক্ষগণের এই কোটি লেখক আরও চমৎকার কৌশলে উড়াইতে চাহেন। এ বিষয়ে তিনি আরও খেলো যুক্তি দ্বারা লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই—

১। "এখন কলিকাতার অঙ্গনের বিশ ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। কলিকাতার ন্যায় সহরে এখন স্ত্রীলোকেরা বড়ই শ্রম-বিমুখী হইয়াছে তাঁহারা রন্ধন, গৃহ মার্জ্জন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য গৃহ কার্য্য করে না। যে সকল কার্য্য তাহাদের আপনাদের করা উচিত, তাহা দাস দাসী দ্বারা করাইয়া লয়। আপনারা শুইয়া বসিয়া গল্প গুজব করিয়া তাস খেলাইয়া দিন কাটায়। এজন্য তাহারা বড়ই রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে"।

২। "তাহাদের বাবুমহাশয়েরাও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। * * *

* * । তাহারা সকাল সন্ধ্যা বিচার করেন না, দিবা রাত্রি বিচার করেন না, অসুখ অসুস্থতা বিচার করেন না, তিথি বিচার করেন না, ঋতুকাল বিচার করেন না, সূতিকাগার বিচার করেন না। তাঁহাদের মহিষী মহাশয়েরা যৌবনে বৃদ্ধা হইবেন না ত হইবে কে ? তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না তো হইবে কাহার ?"

এই দুই কথা বাহির করিয়া লেখক কি বলিতে চান? তাঁহার যুক্তি এই—কলিকাতার বড় মানুষের ঘরে (যেখানে দাস দাসী আছে) মেয়েরা শ্রম-বিমুখী হইয়াছে বলিয়া, এবং তাহাদের পতিগণ সকাল সন্ধ্যা বিচার করে না ও পঞ্জিকা না দেখিয়া তিথি বিচার না করিয়া স্ত্রীগমন করে না বলিয়া বাঙ্গালীর মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কলিকাতার বড় ঘরের মেয়েরা বাবুগিরি করিয়া দিন কাটায় তাহাতে সমুদায় বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যার জন সাধারণ লোকের কি ? কলিকাতার বড় ঘরের মেয়েদের স্বামী স্বেচ্ছাচারী, তাহাতে অন্য দেশীয় জন সাধারণের প্রসূতিগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে কেন ? একেই বলে একদেশে ঢেঁকী পড়ে, আর এক দেশে মাথা ব্যথা। কলিকাতার যে যে মেয়েরা বাবুগিরি করিয়া দিন কাটায়, তাহাদের কি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, লেখক তাহাই বলিলেন, তাহাতে বিচার্য্য বিষয় কিছুই প্রমাণ হইল না, অপ্রমাণও হইল না। তিনি যে কোটি অপ্রমাণ করিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যেমন তেমনিই রহিল। অথচ লেখক যেন মস্ত যুক্তি দেখাইয়া কি একটা খণ্ডন করিয়া দিলেন, লোককে এমনি বুঝাইতে চাহেন। একেই বলে চক্ষে ধূলি দেওয়া।

সে যাহা হউক, লেখক কলিকাতার বড় মানুষের মেয়েদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায় দেখা যাউক। যাহারা দাস দাসী রাখিয়া মেয়েদের বসাইয়া রাখিতে পারেন, তাহারা ত সম্পন্ন লোক। সে রকম সম্পন্ন পরিবার

রূপটা আছে ? যত থাক, সে রকম সম্পন্ন পরিবার ত সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বজাতিতে দেখা যায়, তজ্জন্য ত অন্য দেশের অন্যজাতীয় স্ত্রীগণের দুর্ব্বলতা হয় না। কলিকাতায় বা [illegible] কেন ? ইংরাজের ধনীলোকের মহিলাগণ ত আর এ বাবু। তজ্জন্য কি ইংরাজ জাতীয় সামান্যজনগণের প্রসূতিগণ রুগ্ন হইয়া পড়েন ? আর ধনী লোকের গৃহিণীরাই রুগ্ন হইবেন কেন ? বাবুগিরি তাঁহাদের অভ্যাস এবং ভোগের শরীর সবল হইবার কথা, দুর্ব্বল হইবে কেন ? লেখক পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্ন পায় না, এবং খুব পুষ্টিকর খাদ্য পায় না বলিয়া দুর্ব্বল। এখন বলিতেছেন যাহারা তাহা পায় তাহারাও দুর্ব্বল। এ কেমন যুক্তি ?

বড়মানুষের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গরিব ও মধ্যবিত্ত জন সাধারণের কি কোন বিষয় প্রমাণ হয় ? ধনীর ঘরে হয় বলিয়া গরিবের কি ? অতএব জন সাধারণ লোকের কথা ধর। তাহাদের মেয়েরা ত শ্রম করিয়া থাকে। তবে তাহাদের মেয়েরা অল্প বয়স হইতে সন্তানোৎপাদন করিয়া রুগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, কেন ? সাধারণ জনগণের অবস্থা অন্যদেশে এবং অন্যজাতিতে যেমন বাঙ্গালা দেশও কি তেমনি নহে ? যদি না হয়, তবে তাহা প্রমাণ করা চাই ; শুধুমুখের কথায় বলিলে হইবে না। আর যদি তেমনি হয়, তবে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার বিশেষ কারণ কি ? অন্যদেশের জনসাধারণের তুলনায় বাঙ্গালীর [illegible] সাধারণের অবস্থা যদি হীন [illegible] মন্দ না হয়, তবে বাঙ্গালীর যাহা পার্থক্য, সেই শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ অবশ্য এমত এক বিশেষ কারণ জন্য হইবে, যাহা অন্য দেশীয় অন্য জাতীতে নাই। সেই বিশেষ কারণ কি বাল্যবিবাহ জনিত অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন নহে ? তবে লেখক কলিকাতার বড় ঘরের দুচারি জন গৃহিণী বাবুর কথা তুলিয়া কি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে চান ?

আমরা আর এ প্রস্তাব বাড়াইতে চাহি না। আমরা মনে করিয়াছিলাম স্মৃতিকারের যুগ রঘুনন্দনের কাল হইতে শেষ হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি, কায়স্থ জাতীয় ইংরাজীওয়ালরাও আমাদের স্মৃতিকার হইতে পারিবেন। লেখক বরাবর আমাদের বর্ত্তমান বিবাহপ্রথার সমর্থন করিয়া আসিয়া শেষে স্মৃতিকারের [illegible] গর্ব্বিতভাবে ব্যবস্থা দিয়া ফেলিলেন যে "পুরুষের বিবাহের বয়স ২০ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহা সাধারণ নিয়ম। আবশ্যক হইলে বা কোন রকমে অসঙ্গত না হইলে দুই এক বৎসর অধিক ও দিক ও হইতে পারে।"

এই লও—"ইংরাজীওয়ালা অমৃতলাল কায়স্থ বিরচিত অধ্যাত্মিক স্মৃতির ব্যবস্থা"
হা দম্ভ ! তুমি লোককে কি না গড়িতে পার ! অপার তোমার শক্তি। আর তোমার মহিমা !

শ্রীঅমৃতলাল বসু।—

নিভৃতে কুসুম।

অসীম আকাশ দেশ করি বিচরণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত এক ফোঁটা চাঁদের কিরণ,
নীরব নিঝুম রেতে, ঘরে ফিরে নারে যেতে,
নীরব নিকুঞ্জ মাঝে করিল শয়ন ;
ধরাতলে তৃণ-কোলে ঘুমে অচেতন।
এড়াইয়া জগতের ভীষণ শাসন,
নিভৃতে লুকায়ে যেন যুড়ায় জীবন।

২

ছাড়ি স্বর্গ, ছাড়ি চন্দ্র, ছাড়ি ছায়াপথ,
গ্রহ তারা তার আর নহে মনোরথ,
ছাড়ি মেঘ, ছাড়ি গিরি, পশে এসে ধীরিধীরি,
সৌধসারি স্তম্ভমালা ছাড়ি সমুদায়,
অমুলোক আলোক ছাড়ি লোক লোকালয়,
বিজন গহন বন—তথা তরুমূলে।
শৈশবের নিদ্রাসুখে গেছে সব ভুলে।

৩

পাশে তার তমোরাশি তমালের ডালে,
একেলা কোকিল ছিল নিদ্রা নিশাকালে;
চমকে আলোকে প্রাণ, ঢেলে দেয় গাহি গান
ঘুমান্ত-জাগন্ত স্বর স্বপনের প্রায়,
নিরানন্দে নৃত্য করি খেলিয়া বেড়ায়।
কেঁপে কেঁপে উঠে আলো কোকিল কূজনে;
জাগে পিক হেরে তারে নিকুঞ্জ-ভবনে।

তয়ে তয়ে ভয়ে ভয়ে প্রাণ-বায়ু প্রায়,
কোথা থেকে একটুকু মধুময় বায়,
সরায়ে গাছের পাতা, সোহাগে সরায়ে লতা
টিপিটিপি চুপিচুপি উপজে তথায়,
সুচারু চাঁদের আলো যথায় ঘুমায়,
বিশদ বদন তার নীরবে চুমায়,
আবেশেতে অঙ্গ ঢালি শেষে মিশে যায়।

৫

আর সে নিভৃত কুঞ্জে, বিজন কাননে,
ঘুমায় চাঁদের আলো না পড়ে নয়নে ;
কিন্তু পিক সেই কালে, বসিয়া তমাল ডালে
সেই রূপে সেই স্বরে গায় প্রাণ ভরি,
মলয় সমীর আসে নিতি তেয়ি করি,
ঘুমায় তথায় পড়ি যথা আলো ছিল,
সুখের স্বপনে নিশি বঞ্চিত অনিল।

৬

একদা তথায় দেখি কানন-বাসনা।
ফুটেছে কুসুম একাকিনে চন্দ্র-কণা।
উন্মাদ কোকিল গায়, উন্মাদ পবন ধায়,
কানন উন্মাদ চায় পরাণ নয়নে ;
হাসে ফুল আপনার হাসির যৌবনে।
একেলার হাসি তার হাসে সর্বক্ষণ,
ক্ষুদ্রমুখে ক্ষুদ্রহাসি ভাসায় ভুবন।

৭

ঊষার সলাজ মুখ—তার ক্ষুদ্র রেখা,
জীবন্ত বসন্ত-বিন্দু যায় যেন দেখা,
হৃদয়-বাসনা কার, ধরে হেন কলাকার,
ফুটেছে প্রেমের বুঝি প্রথম চুম্বন,
সাধের হিল্লোলকার—জাগ্রত স্বপন,
কামিনী-কটাক্ষ কিবা টেপা-হাসি ছাঁদে,
প'ড়ে বাঁধা দেব আলো ধরা লতা ফাঁদে ॥

৮

সুখে দুঃখে জগতের সারটুকু রাখি,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এক ভাবে মাখি
কে যেন নির্জ্জনে আসি, সংসারের শোভারাশি
সুখকর ক্ষুদ্রতর গড়িয়া রেখেছে,
চিত্রবিশ্ব বনাদৃশা ঘটিয়া রেখেছে
আকাশের তারা যেন পড়ি তরুতলে।
দেখাইছে স্বর্গসুখ ধরার আঁচলে।

৯

স্বর্গের সুষমা তার স্বর্গীয় বদনে,
কোমল কল্পনা-কান্তি বিমল লোচনে।
সুখে দুঃখে এক কবি, অন্তর বাহিরে ধরি,
শোভে যেন লাবণ্যের ঘনবিন্দু প্রায়,
হেরিলে পরাণ তার উধাও হ'য়ে যায়।
হাসিমাখা মুখ খানি—সুখে ঢল ঢল,
বিরলে বিরাজে কোন্ বিধির কৌশল।

১০

ত্যজি তমালের ডাল কোকিল নামিল,
নিস্পন্দ কুসুম-পাশে বসিয়া রহিল;
আরক্ত লোচনে চায়, অনুরাগে মত্ত প্রায়।
ভুলেগেছে সুখকণ্ঠ জীবন-সঙ্গীত,
ভুলেছে বসন্ত সখা আপনার রীত।
কুসুমের পানে চাহি চিত্ত হারা হ'য়ে,
হাসিছে কুসুম যেন তার চিত্ত লয়ে।

১১

ছুটাছুটি করি ফেরে মলয় পবন,
সুখী হোয় কুসুমের সুখের জীবন;
লতা পাতা সরাইয়া বৃক্ষ-অন্তরাল দিয়া,
সেথায় মিলেমেশে, চাঁদে কুসুম রতন;
উঁকি ঝুঁকি মারে তারে যত তারাগণ।
করত কী দেয় শাখী, পাখী গায় গান,
[illegible] সমীরণ উদার পরাণ।

১২

হৃদয়-বাসনা ফুটে কুসুমের সনে,
ধায় বায় উন্মাদ ভ্রমর-আলাপে।
আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে, নিভৃত কানন-কুঞ্জে,
প্রেমালাপ করে কত কুসুমের কাণে,
লম্পটের তোষামোদ লাগে কিসে প্রাণে?
মধুলোভী মধুকর সে কথা কি জানে?
ভুলে পাবে ফুল-হিয়া বৈতালিক-গানে।

১৩

গুন গুন—এক কথা—সেই এক গান,
চাহে তাহে হরিবারে কুসুমের প্রাণ।
লোলুপ লোচনে চায়, লুটায় কুসুম-পায়,
হাসে ফুল হাসিমুখে আপনার মনে;
সংসারে সরল হাসি বুঝে কয় জনে?
খল অলি ভাবে এবে কুসুম ভুলিল,
হৃদয়ের বাস তার হরিতে চাহিল।

১৪

কুসুম কোমল হৃদে যেই সুধা বয়
সহজে কে পায় তায় ওরে দুরাশয়?
অসাধ্য সাধিতে পার কিন্তু সাধ্য আছে কার
ছলে বলে ফুল-হিয়া হরে এক দিন?
যত যে কোমল ভবে তত সে কঠিন।
পদরজ মাখি গায় ধায় অন্ধমন
ভাবি হৃদি-মকরন্দ মূঢ় অলিগণ।

১৫

ডাকে ফুল সমীরণে সুহাস বয়ানে,
বলে-সুধাধর, রাখি তোমার কারণে
জীবনে তোমারি রব, মরণেও সবতব,
ধর, হিয়া খুলি সুধা করি তোমা দান,
তুমি সে বাসনা মম—তুমি মম প্রাণ।
জীবন্তে তোমায় আজ দিলাম যে ধন
মরিলে জগতে তাহা কারো [illegible]

১৬

কুণ্ঠিত মলয়ানিল সেকথা শ্রবণে,
শোভিল শিশির-বিন্দু কুসুম নয়নে।
ফুল মুখে ঘুম ঘোর, ভাবে ভোর মনোচোর,
চাহে অলক্ষিতে যেন তথা মরে যায়,
প্রেমময় প্রেমপদে জীবন বিকায়।
প্রেমপদে কেবা কোথা নহে নতমাথা
প্রেমে গড়া প্রেমেঢালা—বিশ্বপ্রেমেগাঁথা

১৭

পিয়া সুধা সুধাময় হইল পবন,
দিক দশ আমোদিত সৌরভে এখন।
বিলাইল দুই করে, প্রেমসুধা চরাচরে,
আনন্দে বিহগকুল কূজিয়া উঠিল,
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রকৃতির সোহাগ বাড়িল
লতাপাতা শাখীশাখা সবে সুখমন
প্রেমে আজ, ফুল, তোর উথলে কানন।

১৮

কুসুম রে বড় সাধ থাকি তোর কাছে,
গড়েলই নর-হৃদি তোর হৃদি ছাঁচে।
হাসির জগত খুলে, রাখি নর হৃদে তুলে,
থাকুক মানুষ ভুলে আপনি আপনে
[illegible] যে হৃদয় সদা দারুণ দহনে।
তোর এ হাসির প্রাণ করি তারে দান,
হাস্যময় করি বিশ্ব—হাসির তুফান

১৯

আমাদের হৃদি-বৃন্তে ফুটে যেই ফুল,
দহে সদা, করে নিতি জীবন্ত আকুল।
বিষম মায়ার দায়, ছেঁড়া নাহি যায় তায়
জ্বলে সদা অনলাকার [illegible] ভীষণ,
জ্বলে নর নিরন্তর—জীবন মরণে।
কোথা জ্বালা তার সম এ তিন ভুবনে,
মনের আগুনে নর মরে মনে মনে।

২০

তোর মত তার মুখে চন্দ্রিমার হাস,
তোর মত তার শ্বাসে মলয় বাতাস;
অধরে সে তোর মত, ধরে সুধা অবিরত,
বসন্ত সে তোর মত জাগে তার প্রাণে,
হেরিলে প্রাণের প্রাণ যেন টেনে আনে।
সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়—লজ্জা মাখা মুখ,
জগতে বিরাজে যেন মূর্ত্তিমান সুখ।

২১

শুধু নেই তোর সেই সরল পরাণ
তাই সে কোমল হিয়া পাষাণ সমান।
হৃদি-রক্ত চুষে খায়, কেহ নাহি জানে তায়,
মরমে মরমে পশি মরম চিবায়,—
মরমের অন্তস্তলে সে যে যেতে পায়,—
অবরোধ তার বল, আছে বা কোথায়,
খুলিয়া যখন প্রাণ দিয়াছি তাহায়।

২২

তাই ত্যজি সংসারের বিষাক্ত নিশ্বাস,
সাধ সদা থাকি, ফুল, হেথা তোর পাশ
হেরে তোরে প্রাণ খুলে, ভবের ভাবনা ভুলে,
ধ্যায়ি তোর নিরমল সরল জীবন,
কল্পনা-সংসার সুখে করিয়া সৃজন
গড়ে লই তোর ভাবে জীবন নূতন,
থাকি, ফুল, গৃহ ছাড়ি তোর নিকেতন।

২৩

স্বপ্নরাজ্য—স্বপ্নবিশ্ব—আশ্চর্য্য স্বপন,
হেরে তোর সুধাধরে হয় রে সৃজন।
ফুটে উঠে স্তরে স্তরে, অন্তরের ঘরে ঘরে,
কত শত নিরমল কুসুম সুহাস।
বরিষার নদী মত মনের উচ্ছ্বাস।
জীবনে বসন্ত জাগে, পাখী ডেকে উঠে,
যৌবন তরঙ্গ যেন পুনঃ বেগে ছুটে।

২৪

ভুলে যাই তোরে হেরে জগত-যাতনা,
ভুলে যাই ভয়ঙ্কর কালের তাড়না,—
বার্দ্ধক্য কঙ্কাল-মালা, তুষার-পরশ জ্বালা,
ভুলে যাই পাপ তাপ মনের দহন,
পাই না কলেবর—নূতন জীবন।
পূর্ব্বকথা ভুলে যাই—পূত হয় মন।
থাকি সব ভব-ব্যাধি হ'য়ে বিস্মরণ॥

২৫

শৈশবের সাদা প্রাণ যেন ফিরে আসে,
সুখের সাগরে যেন ত্রিভুবন ভাসে!
শোকতাপ সবে যায়, হৃদে হৃদি শান্তি পায়।
ফিরে আসে হাসিমুখ তরুণ যৌবন,—
স্বচ্ছ— শুভ্র—শান্ত—নহে পূর্ব্বের মতন
যাহা গেছে আসে ফিরি—নব শোভা ধরি।
ভাবি শুই দেখি দূরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।

২৬

প্রেমের মূরতি তুমি, কুসুমরতন।
প্রেমিক উদার কোথা তোমার মতন?
জীবন্তে সুবাস দাও, সবে সকরুণে চাও,
মরিলে সুবাস সবে কর তুমি দান,
কোথা প্রেম পৃথিবীতে তোমার সমান।
শত্রু মিত্র সমজ্ঞান সদা মুখে হাস,
জগতে জাগ্রত প্রেম তোমাতে প্রকাশ।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে ডেনিস্ উপনিবেশ।

হাওড়া হইতে ছয় ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে পূর্ব্ব পশ্চিমে অর্দ্ধ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে অর্দ্ধক্রোশবিস্তৃত শ্রীরামপুর নগর অবস্থিত। উক্ত নগরে প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের বসতি হইবে। এই নগর ১৭৫৫ অবধি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ

---

* এই প্রবন্ধের অনেক অংশ কোন ডেনিস আমলের প্রাচীন ব্যক্তির অনুবাদ [illegible] লেখা হইয়াছে।

নবতি বৎসর কাল দিনেমারদিগের উপনিবেশ থাকিয়া ইঙ্গরেজশাসনাধীনে আনীত হয়। এই অল্পকালমধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব মহান্ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন বর্দ্ধন,এবং দৃঢ়ীকরণের ইতিহাস লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। দিনেমার বণিক সমিতির প্রতিনিধি দ্বারায় তজ্জাতীয় পতাকা শ্রীরামপুরে প্রথম উড্ডীন হইবার পর নব মাসের মধ্যে কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজ বাণিজ্য কুঠী বাঙ্গালার সুবার নবাব সৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল ইঙ্গরেজ বাণিজ্য কুঠী সংস্থাপিত ছিল ঐ সকল ভগ্ন প্রায় হইয়া উঠে। এই রূপে বঙ্গে ইঙ্গরেজ বাণিজ্যের আশাপ্রদীপ নির্ব্বাপিত এমন কি বঙ্গে ইঙ্গরেজ নাম বিলুপ্ত প্রায় হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাল চক্রের বিচিত্র গতিতে তদ্বিপরীত ফল প্রসব করিল। যে সময়ে বঙ্গে দিনেমার দিগের সৌভাগ্যরবি জ্যোতিহীন হইয়া অস্তগমনোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল, যে বৎসর শ্রীরামপুরে দিনেমার জাতির পতাকা শেষ বারের মত উড়িতেছিল সেই সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে সহস্রাধিক ক্রোশ দূরে ব্রীটিশ সিংহ পঞ্চনদ প্রদেশ হস্তগত করিবার জন্য পঞ্জাব কেশরীর সঙ্গে যুদ্ধে পরিলিপ্ত। ঐ প্রদেশ অল্প কাল মধ্যে ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের মানচিত্র রক্তরাগে রঞ্জিত হইল। এক সময়ে বঙ্গদেশে দিনেমারের পদ প্রাপ্তির জন্য এক দিন যে ইঙ্গরেজ লালায়িত ছিল এবং উহা পাইলে আপনাকে ধন্য ধন্য বলিয়া মানিত অদ্য সেই ইঙ্গরেজ ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া রাজরাজেশ্বরের পদে অভিষিক্ত আর দিনেমার নাম পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া গিয়াছে।

অদ্য যে স্থান শ্রীরামপুরের সীমান্তর্গত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে (শকাব্দা ১৬০০) ঐ স্থানে শ্রীপুর গোপীনাথ পুর এবং মোহনপুর নামে তিনটি গ্রামের সমাবেশ ছিল। এই ক্ষুদ্র গ্রাম ত্রয় ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া শ্রীরামপুর পরিণত হয়। দিনেমার গণ এই নগর কে ফেড্রিক্স নগর নামে অভিহিত করিত।

দিনেমার গণ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যার্থে প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন। বাঙ্গালার প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র কুমার আজিমউল্লাকে ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা প্রদান করণান্তর বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ফারমান (সনন্দ পত্র) প্রাপ্ত হইয়া পাটনা বালেশ্বর এবং হুগলীর নিকট দিনেমার ডাঙ্গা নামক স্থান সমূহে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। দিনেমার দিগের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ সোয়েটম্যান সাহেব (Mr. Soetman) ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহাদিগের যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য য়ুরোপ হইতে এদেশে আসিত তাহা উক্ত স্থানেই জাহাজ হইতে নামান হইত। এবং যে সকল দ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে য়ুরোপে প্রেরিত হইত তাহা চন্দননগর হইতে উক্ত স্থানের ফরাসী শাসন কর্ত্তা (Govemor) এম, ডি, লেজরিটের (M de Legrit) দ্রব্য বলিয়া পাঠান হইত। উক্ত দ্রব্যাদির অধিকারিত্ব বিষয় সন্দেহ হওয়া প্রযুক্ত নবাবের শুল্কগ্রাহী কর্ম্মচারি

দিগের সহিত সদাসর্ব্বদা বাক বিতণ্ডা হইত এই সকল কারণ বশতঃ দিনেমার বণিক সম্প্রদায় বঙ্গদেশে তাহাদিগের নিজের একটি উপনিবেশের আবশ্যকতা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া ছিলেন। কাসিমবাজারস্থ ফরাসী প্রতিনিধি সুবিখ্যাত মোসেবার ল সাহেবের মুরসিদাবাদ নবাব দরবারে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল তন্নিবন্ধন তাঁহাদের দিনেমার বণিকগণ নবাবের সহিত দিনেমার বাণিজ্য কুঠী সংস্থাপনের সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে ছিল। শ্রীরামপুর নগরে দিনেমার দিগের কুঠী স্থাপিত করিয়া ফারমান (সনন্দ পত্র) মোসেবার ল অনেক পরিশ্রমের পর হস্তগত করিতে ব্রত কার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি চন্দননগরে দিনেমারদিগকে উক্ত শুভ সংবাদ দিবার জন্য ১৭৫৫খৃষ্টাব্দের ৩০সে জুলাই তারিখে এক খানি লিপি প্রেরণ করেন কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গদেশে জন সাধারণের জন্য ডাকের কোন রূপ বন্দোবস্ত না থাকায় উক্ত পত্র চন্দন নগরে পৌঁছিতে বার দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল।

উক্ত ফারমান এবং দিনেমারদিগের শ্রীরামপুর নগর অধিকার দিবার জন্য হুগলীর ফৌজদারের উপর আজ্ঞাপত্রে (পরোয়ানা) সহ মুসেবার ল সাহেব ৬ই সেপ্টেম্বর দিবসে চন্দন নগরে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু ঐ সময়ের যথেষ্ট ক্ষমতাশালী নিজ-উন্নত গর্ব্বিত পদ হুগলীর ফৌজদারের উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে মাসাধিক কাল অতি বাহিত হইয়াছিল। মার্সম্যান সাহেব বলেন (১) যে সোযেটম্যান সাহেবের পুরাতন কাগজ পত্রে লিখিত আছে যে তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাপ্ত ভূমি অধিকার করিবার জন্য ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর দিবসে আকনা (২) এবং শ্রীরামপুর গমন করেন। কিন্তু সে দিবস বাকবিতণ্ডায় কাটিয়া যাওয়ায় ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার গমন করিতে হয়।" নবাব প্রদত্ত ফারমান অনুসারে তাঁহারা ষাটিবিঘা জমী অধিকার করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের সুবিধার জন্য উক্ত ভূমি এক স্থানে না লইয়া তিন বিঘা শ্রীরামপুরে এবং সাতান্ন বিঘা আকনা গ্রামে লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে সোযেটম্যান সাহেব বলেন (৩) আকনা গ্রামে জাহাজ যাইবার সুবিধা ছিলনা কিন্তু উক্ত স্থান বেশ ফাঁকা ও প্রশস্ত থাকাতে কুঠী স্থাপনের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী ছিল।" শ্রীরামপুরে সমগ্র ষাট বিঘা ভূমি ক্রয় করিতে হইলে উক্ত স্থানের বহু সংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদি পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে হইত ইহাও অন্যত্র ভূমিগ্রহণের দ্বিতীয় কারণ। ঐ সমস্ত গৃহাদির মূল্য অন্ততঃ দশ বার সহস্র মুদ্রা। কিন্তু সে সময়ে তত মুদ্রা ব্যয়ে গৃহাদি ক্রয় করিতে দিনেমারেরা

(১) Vide "Calcutta Review"—Notes on the Right Bank of the Hugli by J. C. Marshman Esq C. S. I

(২) এই আকনা শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। হুগলী জেলান্তর্গত "আকনা" নহে যে আকনা হইতে আকনার ঘোষ হইয়াছে।

(৩) Vide "Calcutta Review"—Notes on the Right Bank of the Hugli" by J. C. Marshman Esq C. S. I

সমর্থ ছিলেন না। এতদ্বারা আরও প্রতীতি হইতেছে যে শ্রীরামপুর দিনেমারদিগের অধিকারভুক্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ উক্ত স্থান কোন য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে উহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। নদীর (ভাগীরথী) তীর অগভ যে স্থানে কুঠী স্থাপিত হইবে উহার সম্মুখে জাহাজ নঙ্গর করিবার বিশেষ সুবিধা থাকায় সোয়েঠম্যান সাহেব শ্রীরামপুরে অল্প খণ্ড ভূমি লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর দিবসে শ্রীরামপুরে ডেনিস পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং ঐ স্থান রক্ষা করিবার জন্য চারিজন শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

এতদ্বিষয়ে অন্য এক লেখক (৪) এইরূপ বলেন—

"১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ শ্রীপুর নামক গ্রামের মধ্যে বাট বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় বাণিজ্যাগার (কুঠী) স্থাপন করেন। তৎকালে ঐ তিন গ্রাম বিখ্যাত দশ আনি ও ছয় আনি জমীদারদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল। পরে দিনেমারেরা বার্ষিক ১৬০০ টাকা কর ধার্য্যে শ্রীপুর গোপীনাথ-পুর মোহনপুর আকনা এবং পেয়ারাপুর ঐ দশ আনি ও ছয়আনি জমীদারদিগের নিকট হইতে চিরস্থায়ীরূপে লইয়া এই স্থানে এক বাণিজ্যাগার করিলেন। সেই আগার অধুনা শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পত্তি।

শ্রীরামপুরে কুঠী সংস্থাপিত করিতে দিনেমারদিগের বিলক্ষণ ব্যয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ নবাব দরবার হইতে ফারমান লইতে, দ্বিতীয়তঃ তিন জন নবাবকে উপঢৌকন প্রদান করিতে তৃতীয়তঃ ভূম্যধিকারিদিগের নিকট ভূমি ক্রয় করিতে এক লক্ষ ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হয়। ঐ সকল ব্যয় ভার সহ্য করিয়াও দিনেমার দিগের বাণিজ্য কুঠীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। শ্রীরাম পুরে কুঠী স্থাপিত করিবার সাত সপ্তাহ পরে দিনেমার দিগের কুঠীর অধ্যক্ষ অনেক তন্তুবায় জাতীয় গোমস্তা নিযুক্ত করিলেন ১৫ ডিসেম্বরে উক্ত কুঠীর দ্বিতীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ জিগেনবালক সাহেব (ziegenbalk) শ্রীরামপুরস্থ কুঠীর ভূমি পুনর্ব্বার মাপ করিলেন এবং বৃষ্টি নিবারণার্থ কুঠীর চতুর্দ্দিকে একটী মৃত্তিকা প্রলেপিত বেড়া ও উহার উপরে খড়ের চাল দেওয়া নির্দ্ধারিত করা হইল। এই সময়ে ঠিক আবশ্যকমত জনৈক ব্যক্তি তাহাদিগের কুঠী নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য এই কথায় উহাদিগের অধিনে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে "যদ্যপি তাঁহাকে লেফ্‌টেনেন্টের পদ ও উপাধি দ্বারায় সম্মানিত করা হয়, তাহা হইলে তিনি চল্লিশ মুদ্রা বেতনে উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণসম্মত হয়েন" এই প্রস্তাবে সোয়েটম্যান ও জিয়েগেনবলক সাহেব দ্বয় সভাসীন হইয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে "উক্ত ব্যক্তি যদ্যপি ন্যূন বেতনে কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত হয়েন তাহা হইলে তাহাকে চল্লিশ মুদ্রা দেওয়া হইবে কিন্তু

(৪) Vide "the Steam Engine and the East Indian Railway" by Kalidas Maitra of Serampore

তাঁহার থাকিবার জন্য বাটী ভাড়া ও আলোকের ব্যয় ভার তাহাকে নিজে বহন করিতে হইবে"।

দিনেমারগণ শ্রীরামপুরে যে সময়ে এইরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে বঙ্গের যুবা নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান করণাপরাধে ইঙ্গরেজ বণিকদিগকে দণ্ড প্রদান করিবার মানসে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতাভিমুখে গমন কালে শ্রীরামপুরের অপর পারে ভাগীরথী তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দিনেমার কুঠীর অধ্যক্ষ সোয়েটম্যান সাহেবকে তাহাদিগের সমস্ত পদাতিক অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া তাহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে সোয়েটম্যান সাহেব বিনীত ভাবে এই উত্তর প্রেরণ করিলেন যে "তাহার কোন রূপ সৈন্যই নাই, কেবল তাঁহারা দুই তিন জন মাত্র ভৃত্য লইয়া অত্যন্ত সামান্য মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুঠীরে বাস করিতেছেন"।

বঙ্গদেশে য়ুরোপীয় জাতির প্রভুত্বের ছায়ায় থাকিয়া দিনেমারদিগের উপনিবেশ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং উন্নত হইতে লাগিল। এবং ইঙ্গরাজাধিকার ও রাজ্যশাসন প্রণালী স্থাপিত হওয়াতে ধন প্রাণ প্রভৃতি রক্ষার সকল উপায় অনুষ্ঠিত হইলে দিনেমারগণ ও ঐ সকলের ফলভোগী হইয়াছিল। "ইংরেজ পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির (English East India Company) কর্ম্মচারিদিগের মূল ধনের দ্বারায় ও দিনেমার দিগের উপনিবেশের অনেক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। ইংরেজ বণিক সমিতির বাণিজ্যের বিলক্ষণ বিস্তার হইলে পর উক্ত সমিতির অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারীগণ কোম্পানির লভ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন আপন ধন বৃদ্ধির জন্য গোপনে বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রাচ্যভারত বণিক সমিতির কর্ম্মচারীগণ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডীয় কোর্ট অব ডিরেক্টরের উপর হুণ্ডী দ্বারায় আপনাদিগের সম্পত্তি স্বদেশে প্রেরণ করিবার অধিকার ছিল; কিন্তু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা নিজে খরজ করাতে, কোর্ট অব ডিরেক্টরকে স্বীয় কোষ হইতে ঐ সকল হুণ্ডী পরিশোধ করিতে হইত। এই অসুবিধা প্রযুক্ত তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণের পূর্ব্বাধিকার তাঁহারা বন্ধ করিলেন। ফলতঃ উক্ত কর্ম্মচারিগণ ফরাসিস, ওলন্দাজ, সুইস, ও বিশেষতঃ দিনেমারদিগের এতদ্দেশীয় কুঠিতে জমা দিয়া ঐ টাকার হুণ্ডী স্বদেশে প্রেরণ করিতেন তাহাতে দিনেমারেরা ঐ টাকা লইয়া কালাগিলে (৫) ও গড়া প্রভৃতি বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্বদেশে পাঠাইতেন। ঐ উপলক্ষে দিনেমারদিগের বাণিজ্যের ক্রমশঃ বিলক্ষণ বিস্তার ও উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় শ্রীরামপুরে অনেক ইষ্টকালয় প্রস্তুত হয় এবং নগর ও বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মার্কিন

(৫) কাল এবং লাল ডোরার এক প্রকার চৌখুপ্পী মোটা কাপড় বিশেষ। পূর্ব্বে ঐ কাপড় এতদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত, বিলাতী কাপড় হইয়া উহার এক প্রকার লোপ হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধাবসানে উত্তর আমেরিকা ফ্রান্স এবং ইলণ্ড এই তিনটি তুৎ কালিক সমুদ্রে প্রতিপন্ন জাতির সহিত ইঙ্গলণ্ড শত্রুতাচরণে জড়ীভূত হওয়া প্রযুক্ত ইঙ্গরেজদিগের জাহাজ সকল উক্ত জাতিত্রয়ের রণতরি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আক্রান্ত হইতে লাগিল ; ফলতঃ ইঙ্গরেজ বাণিজ্য দ্রব্যাদির বিমা (Fnsurance) অত্যন্ত অধিক হইযা উঠিল। এই সময়ে শ্রীরামপুরের বাণিজ্যের সুবর্ণযুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই সময়ে উক্ত স্থানের বাণিজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা [illegible] হইয়া ছিল। তৎ কালে বর্ষে বর্ষে নানা জাতির দ্রব্যাদি পূর্ণ ন্যূনাধিক বিংশতি খানি বাণিজ্য পোত ডেনমার্ক হইতে বাণিজ্যার্থ উক্ত স্থানে আসিত। এই বাণিজ্য সূত্রে শ্রীরামপুরস্থ বিখ্যাত গোস্বামী বংশের মূল ধনোপার্জ্জনকারী গতায়ুঃ রামনারায়ণ ও হরিনারায়ণ গোস্বামী বিপুলার্থ উপার্জ্জন করিয়া উক্ত নগরের সর্ব্ব প্রধান ধনী বলিয়া গণ্য হয়েন। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ অবসান হইবার পূর্ব্বে নয় মাসের মধ্যে প্রায় দ্বাবিংশ খানি দশ সহস্র টনের অধিক পরিমাণে পণ্য দ্রব্য পূর্ণ বাণিজ্য তরী বন্দর হইতে বহির্গত হইয়া ছিল। এই বাণিজ্যে দিনেমার প্রাচ্য ভারত বণিক সমিতি নিঃসন্দেহ বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় যে উক্ত সমিতির কুঠীর কর্ম্মচারীগণ অপেক্ষাকৃত সমধিক পরিমাণে লাভ করিয়া ছিলেন। ঐ সমিতির কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ দুই শত মুদ্রার অধিক বেতন পাইতেন না কিন্তু তাঁহারা অশীতি মুদ্রা করিয়া ডজন মূল্যের শ্যাম্পেন পান করিতেন। এবং অল্পকাল কার্য্য করিয়া বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়া স্বদেশে (ডেনমার্ক) প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কলিকাতা নিবাসি জন পামর সাহেব (৬) দিনেমার কোম্পানির বাণিজ্যের প্রতিনিধি (Agent) ছিলেন। তিনি বলেন যে "আমি প্রায় প্রত্যহ শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের কুঠীতে সমস্ত দিবস অবস্থিতি করিয়া ক্রমান্বয়ে মাল সকল গণনা ও ওজন করাইতাম তাহাতে আমি তিন বৎসরের শেষে কদাচ এক লক্ষ টাকার ন্যূন লাভ প্রাপ্ত হইতাম না।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।

---

(৬) তিনি তৎকালে কলিকাতার বণিকরাজ (Merchant Prince of Calcutta) নামে অভিহিত হইতেন।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিক জিনিষটা কি।

মৃচ্ছকটিক জিনিষটা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এখনও অনেক বলিবার আছে। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা কেবল বাহ্যিক স্বরূপ নির্দ্দেশ মাত্র। সংস্কৃত কাব্য জগতে ইহার অধিকার কিরূপ কেবল তাহাই বলা হইয়াছে, ইহার নিজের কথা কিছুই বলা হয় নাই, তাই বলিতেছি মৃচ্ছকটিক জিনিষটা কি? এপ্রশ্নের উত্তর এখনও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

মৃচ্ছকটিক একটি কল্পিত গল্প অথবা উপকথা। কোন সময় তাহা ঠিক বলা যায় না, এবং বলিবারও উপায় নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে সময় ভারত বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল ভিত্তি বর্ণ ভেদকে কেবল কম্পিত করিয়াই ক্ষান্ত নহে, স্থানে স্থানে উন্মূলিত ও করিয়াছে। ব্রাহ্মণ যজন যাজন অধ্যায়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বণিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেণে পাড়ায় গিয়া বেণের দলে মিসে বাস করিতেছেন। শূদ্র ও রাজ সিংহাসন অধিকার করিবার দাবী রাখিতেছে এই রূপ কোন সময় উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামক এক জন ব্রাহ্মণ বংশীয় বণিক উজ্জয়িনী নগরে শ্রেষ্টি চত্বরে বেনে পাড়ায় বাস করিতেন। চারুদত্তের পিতামহ বিনয়দত্ত—পিতা সাগর [redacted]। ইহারা বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া অসীম ধন সঞ্চয় করিয়া যান এবং নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উজ্জয়িনী নগরে আপনার কুলমর্য্যাদার মহত্ত্ব চির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চারুদত্ত সেই প্রতিষ্টীত ধনশালী বংশের একমাত্র বংশধর। দেখিতে অতি সুন্দর প্রিয়দর্শন গুণানুরাগী নিজে ও অনেক সদ্গুণ সম্পন্ন বিনয়ী মিষ্টভাষী স্বধর্ম্ম নিরত ধীর এবং বুদ্ধিমান। ইহার উপর উত্তম দাতা তাহার নিকট একবার মুখ ফুটে যাচিঞা করিবার যেটুকু বিলম্ব কিন্তু মুখের কথা বেরুতে না বেরুতে চারুদত্ত অর্থির অভাব মোচন করিতেন। চারুদত্ত অল্প বয়সে পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ শূন্য হওয়ায় সেই অতুল ধনের অধিপতি হয়েন। কিন্তু বয়স ও ধনের শক্তি অতি চমৎকার। তাদৃশ গুণ সম্পন্ন ধর্ম্ম প্রিয় চারুদত্তকেও একটু বিলাস প্রিয় করিয়া তুলিল এবং বিলাস সহচর অবিবেক আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে ক্রটি করিলনা। কাজেই অর্থের অনিয়ম ব্যয় আরম্ভ হইল এই অবস্থায় সৎ অসৎ নানা বিধ অর্থলিপ্স মনুষ্য অর্থলোভে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আপনাদিগের লোভ বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই ধন রাশি একেবারে নিঃশেষিত হইল। গজভুক্তকপিত্থের [redacted] সেই বড় অট্টালিকা মাত্র অবশিষ্ট রহিল ভিতরে এত কৌশল্যা

হইল যে রাত্রে ইচ্ছা মত প্রদীপ জ্বালাইবার সঙ্গতি রহিল না। বাড়ীটির ও সময়ে মেরামত না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে ভিতের উপর নানা রূপ ঘাসবন জঙ্গল জন্মাইতে লাগিল।

চারুদত্ত দরিদ্র হইলে খুসামুদেরা সুখের পায়রার মত ক্রমে ক্রমে উড়িতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল বিবাহিত স্ত্রী ধূতা একটী শিশু সন্তান রদনিকা নামে পরিচারিকা বর্দ্ধমানক নামে বৃদ্ধ পৈতৃক ভৃত্য এবং মৈত্রেয় নামে যথার্থ মিত্র রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে বন্ধুতার পরীক্ষাস্থল সেই চরম সীমা প্রাপ্ত বন্ধুভাবাপন্ন কোন ব্রাহ্মণ কুমার বয়স্য। মৈত্রেয়ের নিজের ঘর দ্বার কিছুই নাই, চারুদত্তই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাঁহার নিজস্বের মধ্যে আছে কেবল উদর। চারুদত্তের যত দিন সম্পৎছিল তত দিন উদরের জন্য তাঁহার কিছুই চিন্তা ছিলনা, কিন্তু চারুদত্ত যখন সেই সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই ছায়ার মত সহচর সেই মৈত্রেয়েরও দিনান্তে একবার মাত্র উদর পূরণ করিতে অক্ষম হইলেন তখন মৈত্রেয় উদর লইয়া কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রত্যহই মধ্যাহ্নে মৈত্রেয় ঐ উদরের নিমিত্ত একবারে মাত্র বহির্গত হন এবং যথা কথঞ্চিৎ তাহার শান্তি করিয়া আবার চারুদত্তর নিকট উপস্থিত হয়েন। চারুদত্তের সহিত তাহার প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ। চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয় ক্ষণ কালের জন্য তিষ্টিতে পারেন না। চারুদত্ত সেই রূপ মৈত্রেয়ে অনুরক্ত। এই ঘোর দরিদ্র অবস্থায় মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া কথা কহিবার পাত্র এক মাত্র মৈত্রেয়।

এই দরিদ্র অবস্থায় চারুদত্তের অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে বসন্তসেনা নামে একটি বেশ্যা কন্যা একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে এবং আত্ম বিস্মৃত হয়। কাজেই বেশ্যা জনের স্বভাব সিদ্ধ ব্যভিচার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র চারুদত্তে অনুরাগিণী হয়। তাহাকে ঐরূপ দরিদ্র পুরুষ অনুরাগিনী দেখিয়া তাহার মাতা তাহাতে বিরক্ত হইল এবং তাহার সখীগণের দ্বারা তাহাকে অনেক বুঝাইয়া ঐ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল কিন্তু বসন্তসেনা তাহাতে কর্ণ পাত করিলেন না, যেমন নিম্নাভিমুখ জল সহস্র যত্নেও বেগ ফিরায়না, সেই রূপ মন একবার কোন বস্তুতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে আর ফেরান যায় না। বসন্তসেনার মন চারুদত্তে লীন হইয়াছিল তাহা আর ফিরিল না। এস্থলে একথা বলি বসন্তসেনাদিগের পুরুষানুক্রমেই বেশ্যাবৃত্তি। বেশ্যাবৃত্তি দ্বারাই তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই অভাব নাই। বসন্ত নিজে রূপবতী গুণবতী কাজেই মায়ের আদুরে মেয়ে। বসন্তসেনাকে চারুদত্তের উপর চিরানুরাগিণী দেখিয়া তাহার মাতা আর বড় পেড়াপিড়ী করিতে সাহসী হইল না। ভয়, পাছে মেয়ে আত্মহত্যা করে। অথবা নিজে বেশ্যাবৃত্তির জন্য পাপের ক্লেশ ভোগকরিয়া সেই প্রিয় পাত্র কন্যাকে আর পাপে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করিলনা। যে কারণেই হৌক বসন্তসেনার মাতা আর সে প্রেমের পথের কণ্টক হইল না।

এই সময় উজ্জয়িনীতে পালক নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। পালকের বিশেষ

পরিচয় আমরা কিছু পাই নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে তিনি অতি ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ছিলেন। তজ্জন্যই কোন এক নীচ জাতীয় কন্যাকে যথা নিয়মে বিবাহিত না করিয়াই পট্ট মহিষী পদে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন। সেই স্ত্রীর একটা বণ্ডামার্ক ঘোর মূর্খ ভাই ছিল। ভগিনীর সম্মানের সহিত রাজ্য মধ্যে তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হইয়া পড়িল। একে নীচ তাতে মূর্খ কাণ্ডা কাণ্ড জ্ঞান শূন্য, তার উপর অতুল সম্পত্তি এবং রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য প্রাপ্তি একে বারেই কিমুতন্ত্র চতুষ্টয়ং। তাহার অত্যাচারের আর সীমা রহিল না। প্রজাসকল তাহার ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজার শ্যালা কবে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে এই ভয়েই সকলে কম্পিত। এইরূপ রাজার শ্যালককে সংস্কৃত অভিধানে শকার বলে। মৃচ্ছকটীক কারও তাহাকে শকার বলিয়া পরিচয় দিয়া ছেন আমরাও এখন অবধি তাঁহাকে শকার বলিয়া ডাকিব। তাহার প্রকৃত নাম সংস্থানক, উহা অপেক্ষা শকার কথাটা সোজা।

শকার বসন্তসেনার উপর অনুরক্তই বল আসক্তই বল বা তার জন্য উন্মত্তই বল কল প্রবল পাশব বৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত। কিন্তু বসন্তসেনা একটা ছোট খাট লোক নয়। রাজার তুল্য সম্পত্তিশালিনী সুতরাং মনে করেই সামান্য লোকের মত বল পূর্ব্বক অত্যাচার করিবার সে স্থান নয়। এই সময় আর একটি ঘটনা হয়। কোন সিদ্ধ পুরুষ ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করেন যে আর্য্যক নামে গোপাল পুত্র অচিরে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করিবে। এই সিদ্ধাদেশ অত্যাচার পীড়িত প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় আনন্দকর হইল দেখিয়া রাজা পালক সেই গোপাল পুত্র আর্য্যককে বদ্ধ করিলেন তাহাকে [illegible] করিলেন বটে। কিন্তু রাজার চিত্ত সর্ব্বদা সশঙ্কিত। শকার নিতান্ত মূর্খ এবং মদান্ধ হইলেও তাদৃশ সময়ে বসন্তসেনার মত একটা প্রবল প্রজার উপর অন্যায় অত্যাচার করিলে তাহার সমুদয় অত্যাচার অনাচার অহঙ্কারের মূলভিত্তি রাজার রাজ্য যে বিকম্পিত হইবে এটুকু সে বুঝিতে পারিত। কাজেই নানা রূপ ছলে বলে প্রলোভন দেখাইয়া বসন্তসেনাকে আপনার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময় বসন্তোৎসব উপস্থিত। ঐ উৎসব উপলক্ষে নগরের প্রান্তে কামদেব উদ্যান নামক বাগানে একটি মেলা হয়। এই মেলায় উজ্জয়িনী যাবতীয় লোক, সকল অবস্থার লোকই যোগ দেয়। বসন্তসেনা চারুদত্ত শকার সকলই মেলা দেখিতে গিয়া-ছিল। চারুদত্ত মনের সঙ্গে মেলা দেখিতে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অন্বেষণেই হোক বা বেশ্যা জন সুলভ কৌতুহল বশতঃই হোক বসন্তসেনার বিলম্ব হইল। বসন্তসেনা [illegible] শকারও আপনার দলবলের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ অবলম্বন করিল। সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকারে আর যখন মানুষ চেনা যায় না তখন বসন্ত সেনা মেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শকার ও নিজ দল বলের সহিত তাঁহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। বসন্তকালের কৃষ্ণপক্ষের প্রদোষ সময়ে প্রায়ই একটা

ঝড় বৃষ্টি উঠে থাকে। বসন্তসেনার পথে ক্রমে ক্রমে একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উঠিল। একেবারে পৃথিবী অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাছের মানুষ দেখা যায় না। বসন্তসেনার অনুচর দিগের মধ্যে দারুনছত্র ভঙ্গ উপস্থিত হইল। কে কোন দিকে যাইতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই। এই সুযোগ পাইয়া শকার সদলবলে বসন্তসেনাকে আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টা পাইল।

বসন্তসেনা আত্ম রক্ষার নিমিত্ত আপনার সঙ্গিনীদিগকে বারম্বার ডাকিতে লাগিল। সেই ঘোর অন্ধকারে কে কোথায় ছড়িয়া পড়িয়াছে সুতরাং যত্ন বিফল হইল। সেই অন্ধকারের মধ্যে বসন্তসেনা ঘোর অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু দৈবের চরিত্র অতিবিচিত্র। লোককে বিপদে ফেলিতে যেমন পটু আবার বিপদহইতে উদ্ধার করিতেও তেমনি তৎপর। সেই নিরাশ্রয়ে অন্ধকারে আশ্রয়ের জন্য হাতড়াইতে হাতড়াইতে বসন্তসেনার হাতে যেন একটা বড় বাড়ীর দিয়াল ঠেকিল। বসন্তসেনা দেখিলেন বাড়ীর দিয়ালইবটে কিন্তু ভিতরে যাইবার উপায় কি? অন্ধকারে দ্বারই কিরূপে খুজে বাহির করা যায়। এদিকে শত্রুগণ অতি আসন্ন। এমন সময় শত্রুর পক্ষের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল চারুদত্তের বাড়ীর নিকট আমরা উপস্থিত হইয়াছি। শুনিবা মাত্র নিবিড় মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুতের মত বসন্তসেনার ঘোর হতাশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে আশা চমক দিয়া উঠিল। হটাৎ পাশেই ঝনাৎ-শব্দে দ্বার উদ্ঘাটনের [illegible] হইল। কে যেন প্রদীপ লইয়া বাহিরে আসিতেছে। বসন্তসেনা স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্ন মতি প্রভাবেই হৌক অথবা অনুকূল দৈবজনিত উপস্থিত বুদ্ধি বলেই হৌক ধাঁকরে কাপড়ের আচল দিয়া প্রদীপটি নিবাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন প্রদীপধারী কোথায়কিছু নাই চকিতের মধ্যে প্রদীপটি নির্ব্বাণ হইতে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব। সিদ্ধান্ত করিল দ্বার রুদ্ধ থাকায় বাতাস বাহিরে ঘুরে ঘুরে তাল পাকিয়ে জড় সড় হইয়াছিল দ্বার খুলিবামাত্রই একেবারে গড়িয়ে পড়ে বুঝি প্রদীপটা নিবাইয়া দিল।

বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়ী প্রবেশ করায় শকার দেখিল একেবারে হাতছাড়া হইল। চারুদত্ত দরিদ্র হইলে ও তাঁহার সম্মান অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ অটুট রহিয়াছে। তাঁহার বাড়ীর মধ্যে জোর করেপ্রবেশ করে বসন্তসেনাকে বল পূর্ব্বক বাহির করা স্বয়ং রাজার অসাধ্য। কাজে কাজেই শকার দ্বারের সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ তম্বি করে চারুদত্তকে শাসাইয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া আপনার বাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু সেই দিন অবধি চারুদত্তের উপরে তাহার জাত ক্রোধ হইল, এবং চারুদত্তকে উদ্দেশ করিয়া বা মুখে বলিল এই সোনা দানায় পরিপূর্ণ দেখিতে অভিনব নাটকাভিনয়ের সূত্রধারীর মত বসন্তসেনা নামে বেশ্যাকন্যা আমাদের অনুনয় বাক্য তুচ্ছ করিয়া কেবল বল পূর্ব্বক অত্যাচারের আশঙ্কায় তোমার গৃহে প্রবেশ করিল যদি তুমি কাল উহাকে মাথায় করে আমার বাড়ী পৌঁছে দেও ভালই নচেৎ তোমার [illegible] মত শত্রু হইলাম জানিবা।

বসন্তসেনা প্রাণের ভয়ে একেবারে চারু দত্তের বৈঠক খানার বারাণ্ডায় উপস্থিত। চারুদত্ত সেই খানে ছেলে কোলে করে বসিয়া হাওয়া খাইতে ছিলেন। সেইখানে তাঁহাদের উভয়ের প্রথম মিল এই প্রথম মিলেই চার চক্ষু এক হইয়া শুভ দৃষ্টি হইল।

কোন দিন বসন্তসেনা চারুদত্তের বাটীতে আসিয়া রাত্রি যাপন করেন। প্রাতঃকালে চারুদত্ত নিয়মিত প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু বসন্তসেনা তখন ও নিদ্রাভিভূত। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া চারুদত্ত আপনার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন দেখ আমি পুষ্প করণ্ডক নামে জীর্ণোদ্যানে চলিলাম, বসন্তসেনা গাত্রোত্থান করিলে গাড়ী করে তুমি তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবা। বসন্তসেনার উঠিতে একটু বেলা হইল। নিদ্রা ভঙ্গের পর উঠিয়া দেখেন তিনি চারুদত্তের অন্দর মহলে প্রবিষ্ট কিন্তু চারুদত্ত নিকটে নাই। চারুদত্ত কোথায় ইহা ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে চারুদত্তের পুত্র রোহসন পূর্ব্ব দিন বৈকালে প্রতিবাসী কোন বণিকের গৃহে ছেলেদিগকে সোণার গাড়ী লইয়া খেলা করিতে দেখিয়াছিল, প্রাতঃকালে উঠেই সেই সোণার গাড়ী লইয়া খেলা করিব বলে আবদার লইয়াছে। দাসী এক খানি রঙ্ চঙে মাটীর গাড়ী এনে দিল। বালক ভুলিল না। বলিল সোণার গাড়ী লইয়া খেলা করিব। বালককে সান্ত্বনা করিবার মানসে দাসী বসন্তসেনার নিকট উপস্থিত হইল। বসন্তসেনাকে দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল "রদনিকে একে? রদনিকা বলিল "ইনি তোমার মাতা" বালক বলিল দূর "তুই আমায় ভুলাইতেছিস্ কখনই এ আমার মা নয়। আমার মা হইলে এত সোণার অলঙ্কার পাইবে কোথায়?" রদনিকার চোক দিয়া টস্ টস্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িল। বসন্তসেনা কিছু লজ্জিত হইলেন। আপনার শরীর হইতে অলঙ্কার গুলি তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলিলেন বলিলেন দেখ এইবার তোমার মা হয়েছি। সন্তসেনা বলিলেন বালক কাঁদিতেছে কেন রদনিকা গাড়ীর কথা বলিল বসন্তসেনা সেই অলঙ্কার গুলি লইয়া বালকের হাতে দিয়া বলিলেন এই সোণা লও ইহা দ্বারা সোণার গাড়ী গড়িয়া লইও। এমন সময় চাকর আসিয়া বসন্তসেনাকে চারুদত্তের অভিপ্রায় জানাইল। বসন্তসেনা ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন চাকর গরুর গাড়ী প্রস্তুত করিতে গেল, বসন্তসেনা কবরী বন্ধন করিতে বসিলেন।

চাকর গাড়ী প্রস্তুত করে আনিয়া দেখিল আস্তরণ ভুলিয়া আসিয়াছে। আবার দৌড়াদৌড়ী করিয়া উহা আনিতে গেল। এদিকে বসন্তসেনার আর বিলম্ব সহেনা তিনি চাকরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আপনা আপনি খিড়কীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন এক খানি গাড়ী—কার গাড়ী, এই কি চারুদত্তের গাড়ী? সে চাকর কোথায়? এ সব কিছুরই অনুসন্ধান না লইয়া মনের বেগে বসন্তসেনা তাড়াতাড়ী গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন পতঙ্গ আপনার মৃত্যুর জন্য অগ্নির দিকে ছুটিল। গাড়োয়ান অন্য গাড়ীর চাকা মারিতে গিয়াছিল আসিয়া গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল, গাড়ী একটু ভার ভার ঠেকিল ভাবিল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় ঐরূপ

বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য ঐ গাড়ী খানি শকারের বসন্তসেনাকে লইয়া শকারের ভৃত্য শকারের কাছে লইয়া চলিল।

এ দিকে চারুদত্তের ভৃত্য পুনর্ব্বার গাড়ী সাজাইয়া আনিল ও দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ীর মধ্যে ঝন ঝন শব্দ হইল গাড়ীও ভারি বোধ হইল। নিশ্চয়ই বসন্তসেনা আসিয়াছে আর অনুসন্ধান প্রবৃত্তি হইল না। বিলম্ব হওয়ায় সজোরে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল।

কিছু দিন পূর্ব্বে সিদ্ধাদেশ ক্রমে যে গোপাল বালককে পালকরাজা কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন আজ সেই গোপাল দারক কোন বন্ধুর সাহায্যে বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতে ছিলেন। পা শৃঙ্খলে আবদ্ধ, চলিয়া যাওয়া বড় কঠিন এমন সময় পথিমধ্যে শূন্য গাড়ী দেখিয়া তাড়াতাড়ী উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ষান গাড়ী হাকাইল, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বহিল। সিদ্ধাদেশ সফল করিতে গোপাল দারক চারুদত্তের গাড়ীতে চলিলেন।

শকারের গাড়ী শকারের নিকট পৌছিল দেখিল ভিতরে বসন্তসেনা। বসন্তসেনা না রাক্ষসী শকারের ভ্রম হইল। ভ্রম হইতেই পারে যে বসন্তসেনা [illegible] সাধ্য সাধনায়ও ভুলে নাই ররং দুঃসহ কটু বাক্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সেই বসন্তসেনা [illegible] অভিলাষে আগতঃ তাই শকার দেখিবা মাত্র রাক্ষসী রাক্ষসী বলিয়া চেচিয়া উঠিল। শকারের অনুচর বিট বলে একটি বিজ্ঞ ভদ্র লোক ছিল।* সে বলিল বসন্তসেনা একি! উত্তর গাড়ীর ভ্রমে, কিন্তু শরণাগত। বিট বলিল যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। শকার বুঝিল রাক্ষসী নয় বসন্তসেনাই বটে। তখন সে আবার সাধ্য সাধনা আরম্ভ করিল। বসন্তসেনা কিছুতেই সম্মত হইলেন না, শকার ক্রোধে অধির হইল, চাকরকে বলিল মেরে ফেল, সে পলাইল, বিটকে বলিল মেরেফেল সেও পলাইল। তখন সে নিজেই কর্ম্মশেষ করে বসন্তসেনার শরীর পতিত পত্রাচ্ছাদিত করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে গোপাল বালক যথাসময় চারুদত্তের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার ইষ্ট সিদ্ধির দ্বার আরও প্রশস্ত হইল। চারুদত্ত তাহার পায়ের নিগড় কাটিয়া দিলেন এবং নিজের গাড়ী করে বাড়ী পাঠাইলেন। আপনি পদব্রজেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ভাবিলেন গাড়ী না পেয়ে বসন্তসেনা বুঝি আপনার গৃহে চলিয়া গিয়াছেন।

শকার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবেচনা করিল বসন্তসেনা'ক ত মারিলাম এক্ষণে চারুদত্তের উপর বৈরনির্য্যাতন করিতে হইবে। রাজদ্বারে চারুদত্তের নামে বসন্তসেনা হত্যা অপরাধে অভিযোগ করিল। চারুদত্তের দোষ প্রমাণ হইল। বিচারে শূল দিবার আজ্ঞা হইল। চারুদত্তকে শূলে চড়াইবার জন্য দক্ষিণ মশানে লইয়া গেল। শূল রোপিত হইল এমন সময় সেই শোকাকুল দর্শক মণ্ডলী ভেদ করিয়া বসন্তসেনা আসিয়া উপস্থিত। ওদিকে সংবাদ আসিল গোপাল বালক পালক রাজার প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া চারুদত্তের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছে। চারুদত্তের সকল বিপদ কাটিয়া গেল। তিনি বসন্ত-

সেনাকে বিবাহ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই মূল কথা আশ্রয় করিয়া শূদ্রক কবি মৃচ্ছ কটিক রচনা করিয়াছেন।

তিনি গ্রন্থের সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছেন—

"অবন্তি পুর্য্যাং দ্বিজ সার্থ বাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারু দত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকাচ যস্য
বসন্ত শোভেব বসন্ত সেনা।
"তয়ো বিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ম
নয় প্রচারং ব্যবহার দুষ্টতাম্।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ।

অবন্তি পুরীতে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বণিক ব্যবসায়ী চারুদত্ত নামক দরিদ্র যুবা বাস করিত। সাক্ষাৎ বসন্ত শোভার ন্যায় সুরূপা বসন্তসেনা নাম্নী বেশ্যা তাহার গুণে অনুরক্ত হয়। শূদ্রকবি এই গ্রন্থে তাহাদের দুজনের সমাগম এবং ধর্ম্মের প্রধান্য বিচারালয়ের অবিমৃষ্যকারিতা,খলের স্বভাব ভবিতব্যতার বিচিত্র শক্তি এই সকলের অভিনয় দেখাইয়াছেন।

আমরা অদ্য গ্রন্থের মূল কথাটি সংক্ষেপে বলিলাম মাত্র, গ্রন্থোক্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কথা যথা স্থানে বিবৃত করিব।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

শিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব)

"যাহার শিক্ষায়, দীক্ষিত জগৎ
"এ দুঃখ বলিব কারে।
"তাহার সন্তান, পূর্ণ-শিক্ষা তরে
"যায় গো সমুদ্র পারে।"

তোমার জমিতে চাস্ দাও আর না দাও, কতক গুলা গাছ পালা তাহাতে আপনা হইতে জন্মিবেই জন্মিবে সেই রূপ তোমার ছেলেকে শিক্ষা দাও আর না দাও, সে আপনা হইতে কিছু না কিছু শিখিবেই শিখিবে। কিন্তু ভূমি কর্ষণ করিলে যেমন মনোমত ও প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন ও সেই ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়, সেইরূপ রীতিমত শিক্ষাদান দ্বারা আমাদের সন্তান সন্ততিকে সমাজের উপযুক্ত ও উন্নত, এবং তাহাদের উন্নতির সহিত সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। অতএব মনুষ্যকে সমাজের উপযুক্ত করা এবং সমাজের উন্নতি সাধন করাই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। শিক্ষাকার্য্য সুনিয়মে সম্পাদিত হইলে সমাজের উন্নতি হয় এবং

শিক্ষা দোষে সমাজের অধোগতি হইয়া থাকে।

আর্য্য সমাজ এক সময়ে যে অত্যুন্নত হইয়াছিল এবং এক্ষণে যে তাহার এতাদৃক্ অবনতি হইয়াছে, আমরা পরে দেখাইব, শিক্ষা প্রণালীর তারতম্যই তাহার কারণ। কলির প্রারম্ভে আর্য্য সমাজের যে প্রকার গঠন ছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই—আজি বেদব্যাস যদি ভারতে পুনরাবির্ভূত হন, আমাদিগকে কি ভারতসন্তান বলিয়া চিনিতে পারিবেন। হায় ভারত কি ছিল কি হইয়া গিয়াছে। ক্তি, অবি

মনুষ্য মাত্রেরই কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, যিনি যে পরিমাণে সেই সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে সমাজের উপযুক্ত। সে কর্ত্তব্য গুলি কি? তাহা পরে উক্ত হইতেছে।

১ম। আত্মরক্ষা, আত্মোন্নতি-সাধন [illegible] জীবিকার্জ্জন এই তিনটি আপনার প্রতি কর্ত্তব্য।

২য়। স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদিগকে সদুপদেশ [illegible] শিক্ষাদান এবং যতদূর পারাযায় তাহাদিগকে সুখসচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করা মনুষ্যের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

৩য়। স্বদেশকে জননীর ন্যায় স্নেহ [illegible] ভক্তি করা, স্বদেশীয়গণকে ভ্রাতৃ ভাবে দর্শন [illegible] তাহাদের অপমানে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করা, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত এবং সেই দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করা এবং তাহাদের মানসিক, শারীরিক ও সাংসারিক উন্নতির জন্য যত্ন করা আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য।

এই তিনটি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে সমান যত্নের সহিত শরীর, মন, [illegible] হৃদয়ের যুগপৎ তদ্বিবৎ করা চাই, যেহেতু মনুষ্য-প্রকৃতি শরীর, মন ও হৃদয়ের সমষ্টি। শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা যায় না, হৃদয়ের উন্নতি না হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্তি [illegible] না এবং মনের উন্নতি না হইলে আপনার এবং সমাজের কাহারই শ্রী সম্পাদিত হয় না। অতএব যে শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা এতত্রয়ের সমান উন্নতি সংশাধিত হয় সেই শিক্ষা প্রণালীই শ্রেষ্ঠ [illegible] সম্পূর্ণ। বালক বৃন্দের স্মরণ-শক্তি [illegible] বুদ্ধি-বৃত্তির কর্ষণ চলিলেই আমরা মনে করি তাহাদের [illegible]র তদ্বিবৎ হইতেছে কিন্তু সেটি আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। গ্ল্যাসগো-নর্ম্যাল্ সেমিনারীর ভূত-পূর্ব্ব সম্পাদক মহাত্মা ডেভিড্ ষ্টৌ সাহেব বলেন--

The simultaneous cultivation or exercise of all the powers of our compound nature alone trains 'the child' and secures the highest attainment of each faculty , the sympathy of our nature is such, that the non-exercise or over-streching of one power or faculty, to a certain extent weakens the others—bodily health and vigour having an influence on the intellectual powers and *vice versa*, while the exercise

of the moral faculties and feelings gives a healthful and energetic tone to all. The most influential and successful mode of cultivating the child is therefore the daily and simultaneous exercise of his intellectual, physical and moral powers.

বড়ই দুঃখের বিষয় বিলাতে যে প্রণালীতে বালকগণের শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে এদেশে সে পদ্ধতি অদ্যাপি প্রযোজিত হয় নাই। বর্ত্তমান কদর্য্য শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা দুর্ব্বল বঙ্গবাসীদিগকে অধিকতর দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করা হইতেছে। এদেশে দশম বর্ষীয় সুকুমার শিশুদিগকে, ছাত্রবৃত্তির অনুরোধ, রসায়ণ, জ্যামিতি, পরিমিতি, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু, তাহাদের শারীরিক পুষ্টি বর্দ্ধনের উপায় অবলম্বিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখা হয় না।

বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের আর্য্য পিতামহগণের প্রতিষ্ঠিত সমীচীন শিক্ষা প্রণালী আমাদিগের দ্বারা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেবল শিক্ষাগুণেই এক সময়ে পূর্ব্বতন আর্য্যগণ সমস্তজগতের আদর্শ স্থল ও পূজনীয় হইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষা প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ ছিল। আর্য্য বালকগণ পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিলেই গুরুর আশ্রমে প্রেরিত হইতেন। তথায় তাঁহাদিগকে পঠদশায় দশবর্ষ কাল অতিবাহিত করিতে হইত। যেখানে চিত্তচাঞ্চল্যের কোন প্রলোভন নাই যে স্থানে অসৎ সংসর্গের আশঙ্কা নাই, যেখানে রোগ, শোক ও অকাল মৃত্যু নাই, এবং যেখানে শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই শান্তরসাস্পদ পবিত্র তপোবনে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ বৃহস্পতি তেজপুঞ্জ আর্য্যগুরুর আশ্রম। এরূপ স্থানে এবং এপ্রকার গুরুর নিকট নিরন্তর অবস্থান করিয়া তাহার পবিত্র আচার ব্যবহার ও নির্ম্মল চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, শিষ্যের কি আর বিনয়ী ও শিষ্টাচারী হইতে, দয়া দাক্ষিণ্যে দীক্ষিত হইতে এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা করিতে অবশিষ্ট থাকে? তাহার হৃদয়ের উন্নতি, তাহার চরিত্র গঠন, তাহার সুনীতি শিক্ষাত গুরুর সহবাসে ও সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অনায়াসে সাধিত হইয়া যায়। নীতি শিক্ষার জন্য আর্য্য বালককে স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিতে হইত না কেবল গ্রন্থ পাঠে কে কোথায় শিষ্টাচারী ও সুধার্ম্মিক হইয়াছেন? Example is better than freccpt একথা এক্ষণে আধুনিক ইংরাজেও বুঝিয়াছেন। তপোবনে অবস্থান কালে আর্য্যবালকগণ সর্ব্বদা যজ্ঞীয় পাবক, পরিশুদ্ধ নির্ম্মলবায়ু সেবন করিতেন, নির্ঝরের নির্ম্মল জল পান করিতেন, নিয়মিত সময়ে বিধি বিহিত আহার ও নিদ্রা করিতেন এই নিমিত্ত তাহারা সুস্থ শরীরী হইয়া অব্যাহত রূপে অধ্যয়ন ও ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিতেন। শিষ্য মাত্রকেই গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইত, রাজপুত্র হইলেও

তাহাকে প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচমার্জ্জনান্তর পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক গুরুর জন্য অরণ্য হইতে পুষ্পচয়ন ও কাষ্ঠাহরণ, এবং জলাশয় হইতে পানীয় ও আচমনীয় উদক আনয়ন করিতে হইত, এতদ্বারা তাহাদের জড়তা অপগত হইয়া শরীর দৃঢ় ও কর্ম্মপটু হইয়া আসিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা নিয়মিত রূপে ব্যায়াম, মৃগয়া ও শরসঞ্চালন শিক্ষা করিতেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের শরীর যৌবন প্রারম্ভেই যৎপরোনাস্তি বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়া উঠিত। আর্য্যবালকগণের প্রগাঢ় গুরুভক্তি, অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর তাহাদের জ্ঞানালোচনায় বিলক্ষণ আনুকূল্য করিত। তাহারা অল্প সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, বেদ, বেদাঙ্গ, প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে দীক্ষিত হইতেন। অতএব তাহারা যৌবন প্রারম্ভে সুধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান বলবান ও শৌর্য্য সম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণ রূপে সমাজের উপযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের এবম্প্রকার সমীচীন শিক্ষা প্রণালীর ফল, অযোধ্যাধিপতিধনুর্দ্ধর রামচন্দ্র যিনি, নিরপরাধী হইয়াও, কেবল পিতৃ-আজ্ঞা পালন জন্য, অশেষ ক্লেশ সংকুল অরণ্যবাসে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং যিনি প্রজারঞ্জন কর্ত্তব্য বিবেচনায় আপনার প্রাণাধিকা বনিতা সাবিত্রীসমা সীতাদেবীকেও নির্ব্বাসিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধন্য আর্য্য পিতামহগণের শিক্ষা প্রণালী—শৌর্য্যের সহিত এপ্রকার ধৈর্য্যের সম্মিলন, এপ্রকার আজ্ঞা ও কর্ত্তব্য পালন এবং এরূপ অনুশাসন (discipline) আমরা আর কোথাও দেখি নাই। তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্বের অপর দৃষ্টান্ত কৃষ্ণার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম ইঁহাদের তুল্যবীর জগতে কয়জন জন্মিয়াছেন? আবার ইঁহাদের তুল্য বহু শাস্ত্রদর্শী, বিবেকী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই বা জগতে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? পাঠক, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি, এবং শরশর্য্যাশায়ী ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদেশ পরম্পরা স্মরণ করিলেই, আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বতন সুবিখ্যাত য়ুনানী জাতির মহত্বও পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের ন্যায়, কেবল শিক্ষা প্রণালীর গুণেই সাধিত হইয়াছিল। পঞ্চবর্ষ কাল এথেনীয় বালকগণ মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। জননী তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন এবং যাহাতে তাহারা দেবতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেন। ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিলেই তাহাদিগকে মাতার নিকট হইতে লইয়াগিয়া এক জন শিক্ষাপরিদর্শকের (pedagogue) শাসনাধীনে সমর্পণ করা হইত। এই ব্যক্তি নিজে তাহাদিগকে কোন শিক্ষা দিতেন না, তিনি কেবল তাহাদের শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন মাত্র এবং যাহাতে তাহারা সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারী হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। এথিনীয় বালকগণ আর্য্য সন্তান দিগের ন্যায় ষষ্ঠ হইতে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কাব্য, ইতিহাস দর্শন শাস্ত্র, সঙ্গীত, ব্যায়াম ও শাস্ত্রবিদ্যায়

রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। য়ুনানী দিগের দৈহিক তরিবৎ প্রণালী আর্য্য প্রণালী অপেক্ষাও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এক জন ইংরাজ লিখিয়াছেন At what age training commenced in gymnastics we are not told precisely ; but it seems to have begun at once Exercises gradually rising in difficulty was appointed for the boy, and were at all times modified to suit his age and particular constitution. The exercises consisted of lessons in running, jumping, wrestling, dancing, playing at ball, and practising in dumb-bells. At the age of sixteen education in other two branches ceased and gymnastic became supreme The youths now frequented the regular gymnasia of the city (Athens) in building and furnishing which the wealthy men of the city vied with each other, as for one of the great honors of the state. Here the exercises were hardened, here emulation was kindled more keenly by the presence of continual spectators, here too for fear lest too exclusive prominence should be given to the care of the body at the expense of the mind, sat and taught the most renowned philosophers of the day.

কি পূর্ব্বতন আর্য্য ও য়ুনানিগণ, কি অধুনাতন ইংরাজ ও জরমান গণ, যে কোন সময়ে, যে কোন জাতি সভ্যতা-সরণির অত্যুচ্চ সোপানে আরোহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন আমরা দেখিতে পাই তাহাদের সকলেরই শিক্ষা প্রণালী প্রায় এক রূপ, তাহারা সকলেই শিক্ষা সম্বন্ধে শরীর, মন ও হৃদয়ের প্রতি সমান যত্নবান। ভারতে যতদিন এই প্রণালীর শিক্ষা প্রচলিত ছিল ততদিন ভারত কোন বিষয়ে কাহারও নিকট মস্তক অবনত করে নাই। পরে কেবল শাক্যসিংহের শিক্ষা দোষেই ভারতের সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন হইয়াছে। সংসারের প্রতি, শরীরের প্রতি আদৌ আস্থা রাখিওনা, যত্ন করিওনা—তাহাতে সুখ নাই—যদি সুখী হইতে চাও নির্ব্বানন্দের অভিলাষী হও তবে কেবল ধ্যান ধারণা ও বৈরাগ্য সন্ন্যাস কর। ক্রমাগত এইরূপ শিক্ষা ও অনুষ্ঠানে কোন্ জাতির অধঃপতন না হইবে। সংসারী হইতে হইলে—সংসারে থাকিতে হইলে, কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা করিলে চলিবে না—কেবল চিন্তা করিলে পেট ভরিবে না, সংসারে থাকিতে গেলে খাটিতে হইবে, অপরের সংশ্রবে আসিতে হইবে, অতএব শরীর মন ও হৃদয়ের সমান কর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা যত দিন না হইবে তত দিন আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে না, আমাদের দুঃখ ঘুচিবে না।

"ভারত সন্তান, দীন দুঃখী হয়ে
"কাঁদিবে কতই আর
"উন্নতির পথে, তারা কি জননী
হবেনা কো অগ্রসর !"

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

যমুনাকূলে।

চন্দ্রিকা ভাসে, গোকুল বিকাশে,
বিহারে বিলাসে সমীর।
কুঞ্জ-বিরাজিত, কুসুম-সুবাসিত,
হাসিত যমুনার তীর।
শ্যাম সোহাগিনী, সখীগণ সঙ্গিনী,
কুঞ্জবিহারিণী ভেল।
হেরি ফুল-মালিনী, সুধাময়ীযামিনী,
যমুনাকূলে সবে গেল।
রূপময়ীনাগরী, দোলায়িত ঘাঘরী,
হেলায়িত চরণ-বিলাসে।
বদন বিভাসিত, সুমধুর ভাষিত,
হাসিত মৃদু মৃদু হাসে।
ঘন কটি বন্ধন, সযতন পিন্ধন,
সুবাস বাসিত বাসে।
তারকা-শোভিত, রঞ্জনেরঞ্জিত,
শশিকরে ঝলমল ভাসে।
বেণী বিলম্বিত, নিতম্ব চুম্বিত,
দোলিত কুন্তল ভারে।
কটিময় শোভন, কাঞ্চি বিমোহন,
গাঁথন মাণিক হারে।
মণিময় কুণ্ডল, প্রভাময় ঝলমল,
রূপময় বদন দুপাশে।
ভালে হীরক জ্বলে, মণিশোভে কুন্তলে,
[redacted] বিজলী বিকাশে।
দোলিত দলমলে, মুকুতার হারগলে,
রঞ্জিত অধর কপোল।

রুণু রুণু নূপুর, ঘুঙ্গু ঘুঙ্গু ঘুঙ্গুর,
কঙ্কণ বলয় সুগোল।
উজ্জ্বল বরণে, [redacted] নয়নে,
সুঠাম ভুরু ধনু সাজে।
চিক্কণ গাঁথন সুন্দর বিরচন,
গলে ফুলমালা বিরাজে।
হেরি রূপ মনোহর, সাজিয়া সুন্দর,
কদম্ব মূলে এল কালা।
পীতধড়া বন্ধন, শিরেচূড়ানাচন,
শোভন গলে বন মালা।
যমুনার কূলে, বিকশিত ফুলে,
বিরচিত কুঞ্জ-কুটীর।
কানন-তলরী, প্রসূনে সুন্দরী,
মিলিল নয়ন সুধীর।
নাগরী নাগর, মিলি গেল সুন্দর,
মনোহর কুঞ্জবিতানে।
কেলিপর নাগর, শাম্ভি মুরলীধর,
বাজায় বংশী সুতানে।
গোপকুলনারী, আসি সারি সারি,
রাসবিহারীরে ঘেরে।
চন্দ্রিকাভাসে, কুসুম বিকাশে,
মধুর সমীর ধীরে ফেরে।
নৃত্যতি বল্লরী নৃত্যতি সহচরী,
নৃত্যতি মঞ্জরী কুঞ্জে।
অপাঙ্গ দরশনে, শ্যামাঙ্গ পরশনে,
দুঁহা-দুঁহ মিলন ভুঞ্জে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

এড্‌মিরাল ব্লেক।

অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ইংলণ্ডের সামরিক ও সামুদ্রিক ইতিবৃত্তে এড্‌মিরাল ব্লেকের ন্যায় যশোরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন। ব্রিটিশ রণতরির অধিনায়কগণ সাধারণতঃ বহুল পরিমাণে বুদ্ধিমত্তার ও মানসিক ওজোগুণের পরিচয় প্রদান করিলেও কেহই এড্‌মিরাল ব্লেকের সমকক্ষ নহেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ইংলণ্ডের খ্যাতি, অনেকটা ইহার অধিবাসীগণের কার্য্য-কুশলী শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার সামঞ্জস্যে বলিতে হইবে। যখন এই সকল গুণের সহিত, স্বদেশ প্রিয়তা, স্বার্থ শূন্যতা, প্রভু ও আত্মাবিহের পরস্পর যথাযথ কর্ত্তব্য জ্ঞান মিলিত হয়, তখন আর আদর্শরণ-পোতাধ্যক্ষ কল্পনা করা কঠিন হয় না। প্রাগুক্ত গুণরাশির সমাবেশ, যে ব্লেকের হৃদয়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার জীবনীই তাহার পরিচারক।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে সমরসেট্ কাউন্টির অন্তর্গত ব্রিজ্‌ওয়াটর নামক স্থানে রবার্ট ব্লেকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হম্ফ্রে ব্লেক। তিনি নগরের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। স্পেনের সহিত ব্যবসা সূত্রে নিবদ্ধ থাকিয়া, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতঃ ব্রিজ্‌ওয়াটর নামক স্থানের সন্নিকটে এক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া তিনি বহুপরিবার সমবেত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিলেন। রবার্ট পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। উপযুক্ত বয়সে পল্লীস্থ এক সামান্য পাঠশালায় প্রথম তাঁহাকে পাঠার্থ প্রেরণ করা হয়। ষোলবৎসর বয়সে যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এলবানহল নামক বিদ্যালয়ে গমন করেন ও তথায় স্বল্পকাল মধ্যেই স্বীয় মানসিক একাগ্রতা ও অনলসতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মৎস্য ধরা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী গুলী করিয়া মারা তাঁহার বড় প্রিয় আমোদ ছিল। এরূপ ও শুনা গিয়া থাকে যে সময়ে সময়ে হংস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী অপহরণ করিয়াও তিনি আমোদ উপভোগ করিতেন। কিছু দিন এলবান্‌হলে অধ্যয়ন করিয়া পরে ওয়ার্ডহ্যাম কলেজে যান ও তথা হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে ২১ বৎসর বয়সে তিনি মার্টন কলেজের ফেলো হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হন। বোধ হয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রুচি ভেদই ইহার কারণ হইবে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অসিদ্ধকাম হওয়াতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ অন্যরূপে গঠিত হইয়াছিল। দীর্ঘ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় এরূপ আশাই করা যায় যে তিনি উত্তর কালে সাহিত্য সংসারেই একজন কৃতকর্ম্মা হইবেন। কিন্তু যে জন্য ভবিষ্যতে তিনি খ্যাতি প্রসিদ্ধি

লাভ করেন, তাহা কেবল তাঁহার নৈসর্গিক গুণসমষ্টির ফল, ঘটনা-স্রোত তৎসমুদয় স্ফুরণের গৌণ কারণ মাত্র।

২৫শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল। এই কালের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন ও যে নিতান্ত অল্প হইয়া ছিল, এরূপ নহে। বিশ্ববিদ্যালযের সহিত সম্পর্ক তিরোহিত হইলে, তিনি ব্রিজওয়াটরে আসিযা বাস করিতে লাগিলেন। তথায় স্বল্পকালমধ্যেই তিনি স্বীয় অনন্যসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও সদসৎ বিচার শক্তির ভূয়িষ্ঠ প্রমাণ প্রদান করেন। তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দভাব, জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিযাছিল। তিনি স্বকীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। এই গুণে ব্রিজওযাটরস্থ সাধারণ লোকসম্প্রদায তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন ও ১৬৪০ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ইংলণ্ডীয মহাসভায তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করেন। *কিন্তু তাঁহার এই মর্য্যাদা স্থায়ী হয় নাই, সুতরাং তিনি ও স্বীয় রাজনৈতিক জ্ঞান প্রকাশ করিতে অবসর পান নাই।

১৬৪২ খৃঃ অব্দে যখন ইংলণ্ডের ভূপতি ১ম চার্লসের সহিত ইংলণ্ডীয মহাসভায ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি মহাসভার পক্ষ অবলম্বন করেন ও স্বয়ং এক অশিক্ষিত সৈনিক দলের নেতৃত্বে নিযুক্ত হন। এসময় তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর। এ বয়স পর্য্যন্ত ব্লেকের জীবনে এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই, যাহা আশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যে সমস্ত বিষয় দ্বারা ব্লেকের জীবনী পাঠোপযোগী হইযাছে, তত্তৎঘটনাবলীর সূত্রপাত উপরি উক্ত বয়সের পর হইতেই আরম্ভ হয়; পূর্ব্ব হইতে নহে।

১৬৪৩ খৃঃ অব্দে ব্লেক আপনাকে খ্যাত নামা করিবার প্রথম সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। কর্ণেল ফেনিসের অধীনে, ব্রিষ্টলের একটী ক্ষুদ্র দুর্গরক্ষণের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। "দুর্গরক্ষার আবশ্যক নাই" কর্ত্তৃপক্ষগণ এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা অবহেলন করা তাঁহার মত সামান্য সৈনিকের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ব্লেক তদবিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিযা উক্ত দুর্গরক্ষণে বিশেষ তৎপর হন। ইহাতে যে তিনি স্বীয় অসামান্য সাহসের পরিচয় প্রদান করিযা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে কর্ণেল পপ্‌হামের অধীনে ব্লেক সমরসেট সায়েরের অন্তর্গত লাইম নগরস্থ দুর্গের সহকারী কর্ণেল নিযুক্ত হন। এখানে তিনি এরূপ যোগ্যতাসহকারে দুর্গরক্ষা করেন, যে যখন নৃপতিপক্ষীয় মরিশ ও গোরিং এই দুর্গ অবরোধ করেন, তখন পপ্‌হাম তাঁহার হস্তে দুর্গরক্ষণের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রত্যুত নৃপতি পক্ষীয লোকেরা তাঁহার অসাধারণ সাহস ও যুদ্ধকৌশল দেখিয়া দুর্গাবরোধে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

পপ্‌হাম সমরসেট সায়ারে যে সকল সৈনিকদলের নেতৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহারা

সকলেই ব্লেকের প্রতি অনুরাগ ও প্রীতি প্রকাশ করিত। তাহাদের সাহায্যে তিনি সার রবার্ট পাইয়ের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, টন্টন নগর অকস্মাৎ অবরোধ করিতে সমর্থ হয়েন ও ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে মহাসভাকর্ত্তৃক ঐ নগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কালে ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশে কেবল মাত্র এই নগরই রাজার বিরুদ্ধে মহাসভার পক্ষ অবলম্বন করে। টন্টন নগরের দুর্গ আত্মরক্ষণে যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। নৃপতিপক্ষীয় সৈনিকেরা উপর্য্যুপরি এই নগর অবরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ব্লেক স্বীয় ধীরতা ও কার্য্যকুশলতাগুণে যে কোন প্রকারেই হউক, উক্ত দুর্গরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। ইতি পূর্ব্বে আর্ল অব এসেক্স মহাসভাকর্ত্তৃক একদল সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তিনি বিপক্ষদলকর্ত্তৃক কর্ণওয়ালে পরাভূত হইলে, বিপক্ষপক্ষ সমধিক সাহসভরে টন্টন দুর্গাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। এই সময় ব্লেকের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল না, কিন্তু তিনি বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া সাহসে নির্ভর করতঃ নগরাবরোধলিপ্সু নৃপতি পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিকগণকে বন্দী করেন।

ব্লেকের এইরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া নৃপতি পক্ষীয় লর্ড গোরিং দশসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে টন্টন নগরাভিমুখে আগমন করতঃ, ঐ নগর অবরোধ করিলেন ও ব্লেককে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়া উক্ত দুর্গরক্ষা ব্যবসায় হইতে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ব্লেক অবিচলিত চিত্তে নির্ভীক হৃদয়ে উত্তর দিলেন, "প্রাণ যাউক তাহাও স্বীকার, কাপুরুষের ন্যায় দুর্গ শত্রু হস্তে সমর্পণ করিব না"। এরূপ নির্ভীক বাক্যে গোরিং সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া প্রাণপণে দুর্গ উচ্ছেদমানসে কৃতসংকল্প হইলেন ও কিয়ৎপরিমাণে তদ্বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া ও শেষ যখন ব্লেকের সাহায্যার্থে ফেয়ার ফ্যাক্স্ ও স্কিপন আপন সৈন্য সহ উপস্থিত হইলেন, তখন আর স্বীয় মনোরথ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, আপনার দলবল সহ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ব্লেক এইরূপে আপনার প্রভূত সাহস ও যুদ্ধকৌশলের পরিচয় প্রদান করিলে মহাসভা পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন।

টন্টন নগর শত্রুহস্তে নিহিত হইলে নৃপতিপক্ষীয়েরা মহা বিপদে পড়িলেন ও তদুদ্ধারের চেষ্টায় পুনর্ব্বার গোরিং বার্কলি ও গ্রেনভিলকে বহুসৈন্যসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ব্লেকের অনন্যসাধারণ যুদ্ধ কৌশলের নিকট ইহাদের যুদ্ধ চাতুর্য্য ও বলাধিক্য পরাভূত হইল।

টন্টন নগর মহাসভার হস্তগত হইলে ব্লেক, ১৬৪৬ খৃঃঅব্দের এপ্রিল মাসে "ডনষ্টার' দুর্গ আক্রমণ করেন। এই দুর্গ রক্ষণের ভার নৃপতিপক্ষীয় লটারল্ পরিবারগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। দুর্গ আক্রমণে সফল মনোরথ হইয়া ব্লেক টন্টনে পুনরায় আগমন করেন ও কিয়ৎকাল যুদ্ধ ব্যাপার

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ব্লেক স্থল পথে এ পর্য্যন্ত যে সকল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনার সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে প্রাগুক্ত দুর্গের অবরোধেই তাহার শেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ব্লেক ইংলণ্ডীয় রণতরির অধিনেতৃত্বে নিযুক্ত হন। এই বয়স হইতে তিনি এড্‌মিরল ব্লেক নামে অভিহিত। কার্য্য-তৎপরতা, নির্ভীকতা, ও অবিচলিত চিত্ততা সর্ব্বকালেই সকল বীর পুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, বয়ঃক্রমের ন্যূনাধিক্যের সহিত এই সকল গুণের কোন সংস্রব নাই। এজন্য, ব্লেক যে এত অধিক বয়সে স্থলপথ ছাড়িয়া জল পথে আপন বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী, ব্লেক, ডীন্ ও পপ্‌হাম, তিনজনে ইংলণ্ডীয় রণতরির কমিসনার নিযুক্ত হন ও ব্লেক আইরিস্ সমুদ্রে রাজপুত্র রবার্ট ও মরিশের বিরুদ্ধে গমন করিতে আদিষ্ট হয়েন। এদিকে ডীন প্লাইমাউথে, পপ্‌হাম, পোর্টস্‌মাউথে ও অর্জ আস্‌কিউ ডবলিনের নিকটস্থ উপসাগরে স্ব স্ব রণতরির সাহায্যে সমুদ্রের একাধিপত্য লাভ করেন।

রাজপুত্রদ্বয় মহাসভা পক্ষীর পূর্ব্বোক্ত যোদ্ধৃগণকর্ত্তৃক সমুদ্রে পরাজিত হইয়া লিস্‌বন্ পলায়ন করেন। তথায় প্রথম চার্লসের বন্ধু পোর্টুগাল ভূপতি সমধিক সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

রুবার্ট ও মরিশ পলায়ন করিলে, ব্লেক টেগস্ নদীর মুখ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হন ও মহাসভার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া রাজপুত্র রুবার্টকে তাঁহার রণতরি সমর্পণ করিতে কহেন। পোর্টুগালের রাজা দেখিলেন মহা বিপদ। তিনি তৎকালীন ইংলণ্ডীয় মহাসভার ক্ষমতা বিলক্ষণ অবগত থাকিলেও সাহায্যপ্রার্থী রাজপুত্রদ্বয়কে সাহায্য না করা ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ, এই আশঙ্কায় তাঁহাদেরই সহায়তা করিবেন, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ১৩ খানি রণতরি ফিনিষ্টার ও সেন্টভিন্‌সেন্ট অন্তরীপদ্বয়ের মধ্যে সজ্জিত রাখিতে আদেশ দিলেন।

ব্লেক পোর্টুগিজ ভূপতিকে সাবধান হইতে দেখিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ও ১৬৫০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে পপ্‌হামের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাজিল হইতে প্রত্যাগত, বহুমূল্য দ্রব্যজাত-পূর্ণ, লিস্‌বন্ গমনোন্মুখ ২৩ খানি পোর্টুগিজ জাহাজ আক্রমণ করিলেন ও তন্মধ্যে ১২ খানি হস্তগত ও ৩ খানি ভস্মসাৎ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। ব্লেককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজপুত্র রুবার্ট টেগস্ ত্যাগ করতঃ কার্থেজিনা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্থেজিনা যাইবার অব্যবহিত পরেই ব্লেক পুনরায় তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ও স্পেনের অধিপতি ইংলণ্ডের রাজ পুত্রকে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়া ব্লেক স্পেন ভূপতিকে বলিয়া পাঠান— "হয় তিনি রাজপুত্রের জাহাজ সকল সহজে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন, নতুবা তিনি তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

রুবার্ট দেখিলেন আর নিস্তার নাই। তিনি মালাগায় পলায়ন করিলেন, ব্লেক ও পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ও ১৬৫১ খৃঃঅব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার প্রায় সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ভস্মসাৎ করেন। রুবার্ট অতি কষ্টে কোনও প্রকারে দুই তিন খানি জাহাজ সহিত ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হন। পথে রাজপুত্র মরিশের মৃত্যু হয়।

এই সময় ইংলণ্ডের জনসাধারণের শাসন তন্ত্রের সহিত ফ্রান্সের কোন সহানুভূতি ছিল না। তাহার কারণ এই যে ফ্রান্স অলক্ষিতভাবে সামুদ্রিক দস্যুতার সহায়তা করিত। তাহাতে ইংলণ্ডকে বাণিজ্য ব্যাপারে সময়ে সময়ে বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। ইংলণ্ড ও বৈরনির্য্যাতনে কৃতসংকল্প হইয়া মধ্যে মধ্যে ফ্রান্সের বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ অর্ণবপোত লুণ্ঠন করিতে বিরত থাকিত না। একবার ব্লেক ৪০টী কামানপূর্ণ একখানি ফরাসিস্ রণতরি ধৃত করেন। জাহাজের অধ্যক্ষ দুই দেশের মধ্যে যে কোন রূপ যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা আছে, তাহা পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না।

তিনি ব্লেককর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইলে অসংশয়িত চিত্তে তাঁহার জাহাজে আগমন করেন কিন্তু ব্লেক যখন তাঁহাকে নিরস্ত্র ফিরিয়া যাইতে কহেন, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল; তিনি রুষ্ট ভাব প্রকাশ করিলে ব্লেক তাহাকে বলিলেন, আপনি সচ্ছন্দে প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধের উদ্‌যোগ করুন, বিনা যুদ্ধে রণতরি প্রত্যার্পণ করিব না"। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতিপক্ষীয় সৈনিক পুরুষ দুই ঘণ্টা কাল বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিলেও শেষে পরাজিত হইলেন। ব্লেক জয়ী হইয়া প্লাইমাউথে ফিরিয়া আসিলেন (খৃঃ অব্দ ১৬৫১ ফেব্রুয়ারী) ও ইংলণ্ডীয় মহাসভা তাঁহার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে তিন ও পপহামের সহিত চারি বৎসরের জন্য ইংলণ্ডীয় রণপোতের অধ্যক্ষ নিযুক্ত রাখিলেন।

অতঃপর ইংলণ্ডীয় মহাসভা সিলি দ্বীপপুঞ্জকে স্বপক্ষে আনিবার ভার ব্লেকের হস্তেই অর্পণ করেন। কারণ উক্ত দ্বীপপুঞ্জ এখনও নৃপতিপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করিত। এই সকল স্থান যে কেবল দস্যুদিগের নিভৃত আবাস স্থান ছিল এমন নহে, ওলন্দাজেরা ও এই সময়ে এই সকল স্থান অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছিল; তাহারা ভ্যান্ ট্রম্প নামক জনৈক রণপোতাধ্যক্ষকে ১২ খানি রণতরিসমেত ইহাদিগের অধিকারের জন্য প্রেরণ করে। ব্লেক ৮০০ আট শত মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে উক্ত দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিতে আইসেন: তথায় নৃপতিপক্ষীয় গ্রেন্‌ভিল স্বল্পকালমাত্র তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরিশেষে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। এই ঘটনার পর গ্রেন্‌ভিল গার্‌ন্সে নামক দ্বীপে পলায়ন করে। এস্থান ও নৃপতি পক্ষীয় সৈনিকগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল। এইখানে ব্লেক, কর্ণেল হেনিসের সাহায্যে জয়লাভ করেন। কার্‌স্লে মহাসভার অধিকারে আসিলে, ব্লেক পুরস্কারস্বরূপ পর বৎসরের জন্য কমন্সওয়েলথের মন্ত্রণাসভার সদস্য নিযুক্ত হয়েন।

ইহার পর ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকায় ব্লেক ইংলণ্ডের

সর্ব্বপ্রধান রণপোতাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধের কারণ কি তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই। কেবল এই মাত্র বুঝা যায় যে ইংলণ্ডের সামুদ্রিক যুদ্ধ গৌরব ও বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া ওলন্দাজেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকিবে ও এই ঈর্ষাই যুদ্ধের মূলীভূত কারণ হইবে। যাহা হউক ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ১৯ মে ওলন্দাজদিগের প্রধান রণপোতাধ্যক্ষ ভ্যান ট্রম্প স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষসত্ত্বেও ব্রেককর্ত্তৃক পরাভূত হন। কিন্তু ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে— ব্রেকের মূল মন্ত্র ছিল।

"দেশ, রাজার শাসনেই থাকুক বা মহাসভার শাসনেই থাকুক, বিদেশীয় হইতে দেশ রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বৈদেশিক বাগাড়ম্বর যেন আমাদের অন্তর্নিহিত কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে আমাদিগকে বিচলিত করিতে না পারে"। এইরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞানমূলক বীজমন্ত্রই সকল সময়ে সকল যুদ্ধে তাঁহাকে জয়শ্রীদ্বারা শোভিত করিত।

ভ্যান ট্রম্প পরাভূত হইলে ব্রেক ডাউ-নের নিকট তাঁহার যুদ্ধজাহাজসহিত প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ ১২ আগষ্ট)। ট্রম্প পরাজিত হইলে ডিউইট্ এবং ডিরিটার তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহারাও ব্রেকের হাতে ট্রম্পের দশা প্রাপ্ত হয়েন। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট এই সময়ে ৮০ খানি রণতরির সহিত পুনরায় ট্রম্পকে ডাউনের সন্নিকটে প্রেরণ করেন। এই সময় ব্রেকের রণতরির সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। মহাসভার সভ্যেরাও ব্রেকের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরির সংখ্যা এসময়ে কেবল মাত্র ৪০ খানি। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় দিগের রণতরির সংখ্যা দ্বিগুণ। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ করা এক রূপ বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক ব্রেক যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল (খৃঃ অব্দ ১৬৫২, ২৯ শে নভেম্বর)। শত্রুপক্ষের আনন্দের সীমা রহিল না। অতঃপর মঙ্ক ও ডিন্ ব্রেকের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন ও কথঞ্চিত তাঁহার লুপ্তপ্রায় গৌরবের সূচনা মাত্র করিয়া দিলেন। শত্রু পক্ষীয়েরা সামান্য বলিয়ান্ নহে, তাহাদের রণতরির সংখ্যা ও অধিক; সুতরাং উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় সন্দেহের উপর রহিল, কিছুই স্থির হইল না। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট ১২০ খানি রণতরি ট্রম্পের সাহায্যে প্রেরণ করিল। ইংরাজ পক্ষীয় মঙ্ক্ (Monk) ও ডিন্ উত্তর ফোরল্যাণ্ডের নিকট তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দের ৩রা জুন তারিখ পর্য্যন্ত জয় পরাজয়ের অবস্থা উভয় পক্ষেরই সমান ছিল। কিন্তু ৪ঠা তারিখে ব্রেকের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। ওলন্দাজ রণপোতাধ্যক্ষ ট্রম্প পরাভূত হইলেন ও অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যখন ইংলণ্ডের বহির্দ্দেশে সমুদ্রে এই রূপ যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে তখন নিজ ইংলণ্ডের মধ্যে কিরূপ হইতেছে দেখা যাউক। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের "রক্ষাকর্ত্তা" রূপে আপনাকে ঘোষিত করেন। দেশে সে সময় অসন্তো-

যের বহুল নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ব্লেকের উদার হৃদয়ে সে অসন্তোষ স্থান পায় নাই। তিনি বলিতেন "আমরা সকলেই ইংরাজ, আমাদের শত্রুরা বিদেশী, আমাদের গৃহ বিবাদ যেন শত্রুর সুবিধাজনক না হয়, আমরা সামান্য লোক, রাজ্য সম্বন্ধীয় কূটতত্ব বুঝিবার ক্ষমতা, আমাদের নাই; তবে বিদেশী শত্রুকে ঘরে আসিতে না দিলেই হইল। যে জাতির একজনের হৃদয়ে ও এই রূপ ভাবের স্ফূরন হয় সে জাতির অবনতি কোথায়? ১৬৫৩ খৃঃঅব্দের ৩১ শে জুলাই ওলন্দাজ রণপোতাধ্যক্ষ ভ্যান ট্রম্প ইংরাজ এডমিরাল মঙ্কের সহিত শেষ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ইহার পর ওলন্দাজ দিগের সহিত ইংরাজ দিগের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি ইংরাজ দিগের পক্ষে বিশেষ গৌরবের হইয়াছিল।

১৬৯৪ খৃঃঅব্দে যখন ক্রমওয়েলের অধীনে মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। তখন ব্লেক ব্রিজ ওরাটর নগরের দ্বিতীয়বার প্রতিনিধি স্বরূপ নির্ব্বাচিত হয়েন ও ঐবৎসর নভেম্বর মাসে মহাসভা তাঁহাকে বহুসংখ্যক রণতরির অধিনায়ক করিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করেন। অসভ্য বারবারি ও টিউনিস ভূপতিদ্বয়ের অধীনে কতক গুলি দস্যু ভূমধ্যসাগরে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী দিগের জাহাজসমূহ লুণ্ঠন করিত। তাহাতে তত্রত্য ব্যবসায়ীগণকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। এই কারণে এবার ব্লেককে ঐ দুই রাজার শাসনের ভার অর্পিত হয়। ইহারা রীতিমত শাসিত হইলে মাল্টা দ্বীপের অধিপতি ও টাসক্যানির গ্র্যাণ্ডডিউক ইংলণ্ডে বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ ইংলণ্ডকে একের জন্যে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।

এই সময় ক্রমওয়েল পেন্ ও ভেনাবুল্সের অধীনে সেণ্ট ডমিঙ্গো আক্রমণের জন্য গোপনে এক দল সৈন্য প্রেরন করেন। তাহারা জ্যামেকা অধিকার করিলে স্পেন অধিপতি ইংরাজ দিগের স্পেনে যে সকল সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদয় বাজেয়াপ্ত করেন। স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদের এই সূত্রপাত। ওয়েষ্টইণ্ডিজে পেন যেমন ইংরাজ সেনার গৌরব বৃদ্ধি করিতে ছিলেন ব্লেক ও এই সময় ইউরোপে স্পেনের সামুদ্রিক গৌরবখর্ব্ব করিতে তদ্রূপ কৃতসংকল্প হইলেন। ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে ব্লেক মণ্ট্যাগুর সহিত মিলিত হইয়া কেডিজ নগর অবরোধ করেন। কিন্তু এ সময় তিনি এরূপ পীড়িত হন যে এই পীড়াই শেষ তাঁহার মৃত্যুর কারন হইয়া উঠে। কেডিজ নগর অবরোধের পর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে ২৫ খানি রণতরির সহিত টেনেরিফ্ দ্বীপের অন্তর্গত স্যাণ্টাক্রুজ আক্রমণ করেন। তথায় স্প্যানিশ্ দিগকে যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করিয়া ছিলেন। স্যাণ্টাক্রুজের যুদ্ধই ব্লেকের জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু জাহাজ যখন প্লাইমাউথের নিকট পহুঁছে, তখনই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭৬৭ খ্রীঃঅব্দ ২১ আগষ্ট) স্বদেশ প্রিয়তা স্বদেশের উন্নতিতে আত্মত্যাগ ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য-জ্ঞান ব্লেকের ন্যায় অতি অল্প সংখ্যক লোকই জগতের ইতিহাসে দেখাইতে পারিয়াছেন।

শ্রীবামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

শৈলজা।

দশম পরিচ্ছেদ।

অভিমান।

"যাবে না" "যাবে না বল" বলিয়া একটি দুই বৎসরের শিশু তাহার জননীর কোলে শুইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। তাহার জননী বলিতেছেন "না মারিব না" "তুমি আমার যে লক্ষী ছেলে ঘুমাও"। শিশু চুপ করিল চক্ষু মুদিল আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। "তোমায আমি বকেচি বাবা" বলিয়া জননী শিশুর মুখ চুম্বন করিলেন ও ধীরে ধীরে শিশুর গাল চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন।

শিশুটি সুরবালার। সুরবালা এখন এক ছেলের মা। শশুর বাড়ীতে সেই অবধি আসিয়া আর বাড়ী যায় নাই! প্রায় আড়াই বৎসর এখানে রহিয়াছে। মার মুখ দেখে নাই, ঠাকুমার মুখ দেখে নাই, দেশের ছোট ছোট ছেলে মেযে গুলাকে দেখে নাই। শৈলজার মিষ্ট কথা শুনে নাই। যোগেশ কত বড় হইযাছে দেখিতে কেমন হইয়াছে ভবেন কেমন পড়িতেছে এ সকল কিছুই জানে না। চিঠিতে কিছু এসকল জানা যায় না। ক্রমে তাহার মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল।

শিশু আবার বলিল "ঘুম পালাও" জননী বুঝিতে পারিলেন গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতে বলিতেছে। গান না গাহিযা ঘুম পাড়াইলে ঘুম পাড়ান মঞ্জুর হইত না।

সুরবালা আবার গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। "ঘুমের রাণী বাছুর চখে ঘুম দিযে যাও"। গানের এক চরণ না বলিতে বলিতে একটি বৃদ্ধ গৃহের আড়াল হইতে গণেশ চন্দ্রকে ডাকিলেন। শিশুর নাম গণেশচন্দ্র। গণেশচন্দ্র মাতৃকোল হইতে দাদা দাদা বলিযা একেবারে উঠিয়া বসিল বৃদ্ধ হরিশ্চন্দ্রের মাতুল। বৃদ্ধ ক্রমে গৃহে প্রবেশ করিল। সুরবালা মাথার কাপড় টানিল। শিশু টলিতে টলিতে হাসিতে হাসিতে দাদার নিকট যাইল। বৃদ্ধ এক খানি চিঠি গণেশের হাতে দিয়া বলিলেন তোমার মামার বাড়ীর চিঠি যাও লইয়া যাও। গণেশ চিঠি খানি পাইয়াই ছিড়িবার চেষ্টা করিল। সুরবালা উঠিয়া না আসিতে আসিতেই চিঠী খানি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল। এক টুকরা গালে পুরিল। সুরবালা কাড়িয়া লইল। গাল হইতে সে টুকরাটি বাহির করিল তাহার অনেক লেখা মুছিয়া গিয়াছে। শিশুকে কোলে লইযা আবার সেই স্থানে উপবেশন করিল। শিশু বলিল "মামা বারী" "সুরবালা বলিল" হাঁ মামার বাড়ীর চিঠি।

চিঠি খানি নীরবালার কনিষ্ঠ ভ্রাতার

লেখা। সে সবে লিখিতে শিখিয়াছে। নীরবালা অতি কষ্টে চিঠি খানি পড়িল। চিঠি খানি পড়িয়া কিছু বিষণ্ণ হইল। দেশে যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল। এখন কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। নীরবালা কি একথা শুনিয়াছে। নীরবালা কি আমার মত এক খানি চিঠি পায় নাই।

সুরবালা নীরবালাকে এক খানি চিঠি লিখিবে স্থির করিল। সুরবালা নিজে লিখিতে জানে না। সে লিখিতে শিখে নাই। "ঝি ঝি" করিয়া বারেক ডাকিল। ঝিব উত্তর পাইল না। সে বাসায় খাইতে গিয়াছে, এখন ও আসে নাই বেলা তিনটা এখন ও ঝি আসে নাই দেখিয়া বড়ই সুরবালা চটিয়া গেল। পাড়ার ছেলেরা এখন ও স্কুল হইতে বাড়ী আসে নাই। সুরবালা বড়ই বিপদে পড়িল। মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিল এবার সে লিখিতে শিখিবে।

চারিটা বাজিয়াছে। ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে সব আসিয়াছে। সুরবালা দিগের বাড়ীর পাশে এক ঘর স্বর্ণবণিক বাস করিত। তাদের ছেলে স্কুল হইতে আসিয়াছে। সে সুরবালাদের বাড়ী যাইত। সুরবালা সোনারবেণের ছেলে বলিয়া তাহাকে আগে ঘৃণা করিত, তাহাব ছায়া মাড়াইত না। এখন আর সুরবালাব সে সব বড় কিছু নাই। এখন আব তাহাব ছায়া মাড়াইলে জাত যায় না। সে প্রত্যহই সুরবালা দিগের বাড়ীতে আসিয়া থাকে। সুরবালার চিঠি পত্র লিখিবাব প্রয়োজন হইলে লিখিয়া থাকে। বয়েস দশ বৎসর ছাত্র বৃত্তি পরিক্ষা দিবে, আজি ও সে আসিয়াছে। সুরবালা বলিল

হরি। নীরবালাকে একখানা চিঠী লেখত?

হরি। কি চিঠি লিখিব জেঠাই মা।

সুর। আমি বলিতেছি তুমি লেখত?

হরি যথা স্থান হইতে লিখিবার উপকরণ লইয়া আসিয়া লিখিতে বসিল। সুরবালা বলিতে লাগিল।

প্রিয় ভগ্নী নীরবালা,

বোধ হয় তুমি দেশ হইতে এক খানি চিঠী পাইয়া থাকিবে। তুমি যদি না পাইয়া থাক বলিতে পারি না আমি কিন্তু একখানি পাইয়াছি। পত্র খানি তোমার ভাইএর লেখা। সে এখন বেশ লিখিতে পারে। শৈলজার বিবাহ। আমাদিগের বিবাহের পূর্ব্বে সেখানে যাইতে হইবে। আর একটা কথা। দেশে অনেক দিন যাই নাই। সেখানকাব ছেলে পিলে গুলাকে একবার দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করে তোমার কি করে না?

তোমাবি কন্যা শৈলজা। তাহাব বিবাহ। তোমাব এখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না।

বুড়া (শৈলজাব পিতা) কি খেপিয়াছে? এত ছেলে থাকিতে ভবেশের সহিত বিবাহ দিতে যাইতেছে?

আমাব মনটা বড় আজ কেমন কেমন করিতেছে। উনুন্ জালিব না মনে করি যাছি। আমি বড় ভাল নাই আর সকলে ভালআছে তোমরা কেমন আছ লিখিবে।

সুরবালা।

বেলা পড়িয়া যাইলে কি আসিল। কি কে দেখিয়া সুরবালা রাগে জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল "হ্যাঁলা ঝি তুই গিইছিলি এগারটার সময় আর এলি পাঁচটার সময়। এই রকম করিয়া কি লোকের বাড়ী চাকরি করিতে হয়।"

ঝি উত্তর করিল "আমি বাপু অত বকা বকি ভাল বাসিনি। আমার মাহিনা কড়ি চুকাইয়া দাও আমি চলিয়া যাইতেছি। কাজের আবার ভাবনা কি? আমরা কেরাণী বাবু নই।"

সুরবালা কেরাণী বাবুর কথা শুনিয়া আরো রাগে অধীর হইল। মনে করিল তাহার স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া উক্ত কথাটি বলিল। সুরবালা আর থাকিতে পারিল না বলিল "এখনি দূর--হ" "এখনি দূর—হ"—যার খাস্ তার নিন্দা—মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ।"

ঝি—"মাগি মাগি করো না বলচি। এখনি পাঁচ কথা কেন শুন্‌বে? খেতে সকলেই দেয়—চাক্‌রাণীগিরি করিব আবার পাঁচ কথা শুনিব কেন বলত? কিসের জন্যে—আমার টাকা কড়ি চুকিয়ে দাও আমি এখনি চলিয়া যাইতেছি।

সুর।—"তোর মাহিনা ধারি না—এখনি চলিয়া যা।"

ঝি।—"কেরাণীর মাগ হয়ে এত—মাগো মা—না জানি উকিল কুচুলের মাগ হলে কি হতে"—"ভাল মানুষের মেয়ে হয়ে বল্‌চো [illegible]রিনা।"

সুর।—"তোর মাহিনা দিব না যা চলিয়া যা। মাগির যত বড় মুখ [illegible] বড় কথা।"

ঝি।—"উঃ! মগের মুলুক আর কি? কাল গলায় গামচা দেবো আর আদায় কর্ব্বো। যদি আদায় না করি ত আমি বাপের বেটি নই। ওঃ--অমন কত বাবু দেখ্‌লেম---কত পায় তলায় গেল।" বলিতে বলিতে ঝি চলিয়া গেল।

সুরবালা হরিকে বলিল বাবা! "তোমাদের ঝিকে দিয়ে এই চিঠিখানা নীরবালাদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও তো।" হরি চিঠি লইয়া চলিয়া গেল।

পাঁচটা বাজিয়াছে। চৈত্রমাস। এখনো বেশ বেলা আছে। কেরাণীরা সকলে অন্নায়ু হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। হরিশ্চন্দ্রের ও সে দিন কাজ একটুক সকাল সকাল হইয়া গিয়াছিল। তিনিও গবর্ণমেণ্ট আপিসের কেরাণীদিগের ন্যায় সওদাগরী আপিসের কেরাণী হইয়াও দুইটা বেল, ছটি কাঁচা আম, চারিটি কাঁচা তেলাকুচার ন্যায় পটল ও এক পোঁটলা বেনে মসলা লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন। বাড়ী জনরব শূন্য। কাহার সাড়া শব্দ পাইলেন না। ঝিকে দেখিতে পাইলেন না। প্রিয় শিশু গণেশের হাসি কান্না সাড়া শব্দ কিছুই পাইল না। সুরবালাকেও দেখিতে পাইল না। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরিশেষে উপরে যাইলেন, উপরে যাইয়া একেবারে শয়ন গৃহে যাইলেন, দেখিলেন সুরবালা শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। পার্শ্বে গণেশচন্দ্র শয়ন করিয়া স্তনপান করিতেছে। হরিশ্চন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র গণেশচন্দ্র "বাবা" বলিয়া উঠিয়া বসিল। সুরবালা [illegible] চড় মারিয়া বলিল "চুপ করিয়া শুইয়া থাক্

আদর দেখে আর বাঁচিনা।" হরিশ্চন্দ্র বলিল "আহা! ওকে মারিতেছ কেন? [illegible] ছেলেমানুষ ও তোমার কি করিল?"

সুর। "তোমায় সালিসি করিতে ডাকি নাই।"

হরি। "সত্য কথা বলিলে বুঝি সালিসি করা হয়?—কি হয়েছে?"—

সুর। "কিছু হয়নি" বলিয়া সুরবালা চুপ করিয়া রহিল, ভাবে বোধ হইল সে আর বড় কথা কহিবে না।

হরিশ্চন্দ্র আর কি করিবেন, কাপড় চোপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া আহারের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি বেশ জানিতেন সুরবালা আর আজ উঠিবেনা। সক করিয়া বেল কিনিয়া লইয়া আসিয়াছিল তাহা অমনি পড়িয়া রহিল। পরিশেষে স্বয়ং রন্ধন গৃহে যাইয়া উনুনে আগুণ দিয়া স্বয়ং রন্ধন করিতে বসিলেন। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল ঝি কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন কিন্তু তাহা ভয়ে হইল না। আপন মনে রন্ধন করিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন আজ এরূপ হইবার কারণ কি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবেন কে বা বাড়ীতে আছে পরিশেষে মাতুল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতুল ঝির সমস্ত কথা বলিলেন ও এরূপ ঝি বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

সুরবালা অনেক ক্ষণ শয়ন করিয়া ছিল একবার [illegible] হইল রন্ধন গৃহে যাইয়া হরিশ্চন্দ্র কি করিতেছেন দেখিয়া আসিবেন। বিছানা হইতে উঠিলেন গণেশচন্দ্রকে কোলে লইলেন [illegible] ধীরে ধীরে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া রন্ধন গৃহাভিমুখে চলিলেন।

রন্ধন গৃহে গিয়া চারিটি পটল দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেল। সুরবালা বলিল "ও তেলাকুচা গুলিকে হাঁড়িতে তুলিও না।"

হরিশ্চন্দ্র।—নূতন জিনিষ তাই আজ আট পয়সায় ঐ কটা কিনিয়া লইয়া আসিলাম।"

সু।—কিনিয়া লইয়া আসিলে যদি তবে ও কটা কিনিয়া লইয়া আসিলে কেন, উহা কাহার পাতে দিব। আমি যাহা তোমায় নিষেধ করি তাহাই তুমি করিয়া থাক।" হরিশ্চন্দ্র পটল গুলি তুলিয়া রাখিলেন সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঝির সহিত কি হইয়াছিল।"

সুরবালা বলিল "জানি না" এই কথা বলিয়া হন্ হন্ করিয়া আবার শয়ন কক্ষে যাইল আবার গণেশচন্দ্রকে লইয়া শয়ন করিল।

হরিশ্চন্দ্রের অনেক সাধ্য সাধনায় ও সুরবালা আহার করিল না, যেমন শুইয়াছিল তেমনই শুইয়া রহিল।

রাত্রি এগারটা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন। গণেশচন্দ্র অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। সুরবালা কাঁদিতেছে। হরিশ্চন্দ্র সুরবালার আপন কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিয়া দিলেন [illegible] বলিলেন "ঝি কি বলিয়াছে [illegible] না।" সুরবালা বলিল 'জানি না—আমি কাল চলিয়া যাইব, গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া দিবে কি না বল?'

হরিশ্চন্দ্র।—"পিতা মহাশয় এখানে নাই তিনি আসিলে ভাল [illegible] না?

স্বর।—"তা আমি জানি না" কাল সকালে আমি যাইবই যাইব তুমি গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া দিবে কি না বল?"

হরিশ্চন্দ্র অনেক চিন্তারপর বলিল "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

ক্রমে সুরবালা চিঠি হইতে ঝির সহিত কলহ পর্য্যন্ত সমস্তই বলিল। ঝির আস্পর্দ্ধা দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র ও বিস্মিত হইল। শেষে বলিল "এই কথা ইহার জন্য এত অভিমান এত কান্না সাদা কথায বলিলেইত হইত বাড়ী যাইব, দেখ দেখি হাত পোড়াইয়া ফেলিলাম। বাসুন গুলাও মাজিতে হইল—

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সুরবালা হাতটি লইয়া দেখিল বাস্তবিক পুড়িযা গিয়াছে [illegible] একটা ফোস্কা হইয়াছে। অতিশয় লজ্জিত হইল মুখ তুলিযা আর কথা কহিতে পারিল না মুখখানি লজ্জায় হরিশ্চন্দ্রের বুকে লুকাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

খগেন্দ্র নাথ মিত্রের অন্তঃপুর।

একটি যুবতী রমণী দ্বিতলার মাঝের ঘরে বিছানা করিতেছে। একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা আসিয়া বলিল "বউদিদি আমার ঘরের বিছানা তোমাকে করিতে হইবে না কি যদি না করে ত আমি আপনি করিয়া লইব। রমণীটি সে কথা শুনিল না বিছানাটি করিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তাহার ঠিক পাশের ঘরে চলিয়া গেল বালিকাটিও তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

পাশের ঘরে দুইটি যুবতী পরস্পর কি কথা কহিতেছে আর হাসিতেছে। [illegible] মুখি কিঞ্চিৎ দূরে ভূমিতলে বিশ্রাম করিতেছে। যুবতি রমণী গৃহে প্রবেশ মাত্রই আরো হাসির ধুম পড়িয়া গেল। বয়কনিষ্টটি জেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দিদি আমিত বলিযাছি দুর্গার ঘরে বিছানা করিযা তোমার ঘরে বিছানা করিতে আসিবে। জেষ্ঠা উত্তর করিল তুমি কেমন করে জানিলে? কনিষ্ঠা উত্তর করিল "হাত গুনিয়া'। কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই দুর্গা বলিল দেখ মেজ দিদি আমি বউদিদিকে বিছানা করিতে কত বারন করিলাম তা উনি শুনিলেন না"। মেজ দিদি উত্তর করিল "তা তুমি বলিলে না কেন তোমাকে বিছানা করিতে আর আমরা ডাকিতাম না। আবার হাসির ঢেউ উঠিল। যুবতী রমণী কোন কথা না কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঝাঁটা কোথায় ভাই। দুর্গার মেজ দিদি বলিল তোমার জন্যই অভিমান করিয়া ত অমন করিয়া শুইয়া রহিযাছে। যুবতী একটু হাসিয়া ঘর ঝাঁট দিবার উপক্রম করিল। ননদিনীরা তাহা করিতে দিল না। বড় ননদিনী বলিল ওকি ভাই ছি আমরা বসিয়া গল্প করিব আর তুমি আমাদিগের বিছানা করিবে? কেন আমরা কি বিছানা করিতে জানি না? মেজ ননদিনী বলিল তুমি ভাই আমাদিগের ঘর হইতে চলিয়া যাও তোমাকে আমরা বিছানা কিম্বা কোন কিছু করিতে ডাকিব না। ছোট ননদিনী বলিল [illegible] ভাই চিঠি খানা পেয়ে অবধি বউ দিদি সকল ঘরে কাজ করিয়া দিতেছেন। মেজ

ননদিনী বলিল "আরে তা আর বুঝিতে পারিতেছ না সব কাজ সকাল সকাল হইয়া গাইলে বউ দিদিকে কেহ আর কিছুর জন্য ডাকিবে না"। এই বলিয়া পরস্পর এক-বার মুখ চাওয়া চাহি করিল। আবার সকলে হাসিল।

পূর্ব্বোক্ত যুবতীটি নীরবালা। নীরবালা এখন বড় হইয়াছে। সে বাস্তবিক চিঠি-খানি পাইয়া অবধি কিছু ব্যাস্ত হইয়াছে। পরে নিচে নামিয়া গেল। ঝিদের দুই একটা কাজ করিয়া দিল। তাহাতে তাহার শাশুড়ি ঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল "বৌমা। অত করিয়া ঝি গুলোদের আস্কারা দিও না, উহাদের কাজ উহারা করিবে তুমি এইবেলা জল খাইবে এস। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার এখনি নরেন আসিবে।"

নীরবালা কাপড় কাচিয়া জল খাইতে চলিল। তাড়া তাড়ি জল খাইয়া উপরে আপন শয়ন গৃহে যাইল। আর একবার চিঠি খানি পড়িতে বসিল। চিঠি খানি সমাপ্ত হইতে না হইতেই নরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া নীরবালা চিঠি-খানি লুকাইলেন। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "চিঠি খানি কোথা হইতে আসি-য়াছে?"

নীর।—একটু মৃদু হাসিয়া "ও কিছু নয়।"

ন।—"কিছু নয় তা জানি"—"কোথা হইতে আসিয়াছে?"

নীর।—আবার হাসিতে হাসিতে বলিল "তোমার সহিত অত বকিতে পারি না। এখন কাপড় চোপড় ছাড়"। এই বলিয়া নীরবালা একখানি আসন পাতিল ও জল আনিতে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ পা হাত ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিল। নীরবালা পার্শ্বে বসিয়া একখানি পাখা লইয়া ব্যজন করিতে বসিল। নরেন্দ্রনাথ আবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। নীরবালা বলিল "সুরবালা চিঠি লিখিয়াছে।"

নরেন্দ্র।—"কি লিখিয়াছে?"

নীর।—"বলিব না।"

নরে।—"আমি বুঝিয়াছি।"

নীর।—"তাহা বলিয়া আমি বলিতেছি না।"

নরে।—"বলিবে না?"

নীর।—না।

নরে।—"বলিবে না?"

নীর।—না।

নরে।—"বলিবে না?"

নীরবালা এবার আর কিছু বলিল না কেবল হাসিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ জল-যোগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলেন। নীরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল "রাগ করিলে"? এই বলিয়া চিঠিখানি হাতে দিলেন।

নরে।—"তোমার উপর কখন কি রাগ করিয়াছি"? এই বলিয়া চিঠিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন? পড়িতে পড়িতে হাসিতে লাগিলেন। সে হাসির স্বর বাড়ী শুদ্ধ লোক শুনিতে পাইল। নীরবালা বড় অপ্রতিভ হইল লজ্জায় মাথা হেঁট

করিয়া বলিল। "ছি। অমন করে হাসিতে [illegible]। পাশে ঠাকুরঝিরা রয়েছেন, কি মনে করিবেন বল দেখি?"

নরে।—'আবার মেয়ে হোলো কবে" ? আমি ত এ সব কিছুই জানিনে"? বলি 'বে' তে দু এক'খানা লুচি পাবত" ?

নীর।—'ওই জন্যে ত তোমায় চিঠি দেখাই নাই।'

নরে।—'তার পর—বাড়ী যাবে ?' এই বলিযা 'জিতেন' 'জিতেন' করিয়া তাঁহার কণিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে লাগিলেন। জিতেন এম্, এ, তাহার এখনও, বিবাহ হয় নাই। সে বাড়ীর এক রূপ কর্ত্তা বলিলেই হয়। নীরবালা বলিল 'না আমি বাড়ী যাইব না তোমাকে আর ঠাকুরপোকে ডাকিতে হইবে না"। জিতেন নীরবালার কথা শেষ হইতে না হইতেই আসিযা উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "তোমার বউদিদির মেয়েব বিবাহ" এই বলিযা চিঠিখানি ফেলিয়া দিলেন। চিঠিখানি জিতেন পড়িলেন। তাহাতে নীরবালা আরো অপ্রতিভ হইল। মনে মনে করিলেন চিঠিখানি দেখিতে দিয়া কি অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। পুরী এমন করিয়া ও চিঠি লেখে। জিতেন চলিয়া যাইল।

নীরবালা অভিমানে বলিল "আমি কি তোমার বাড়ী যাইবার কথা বলিয়াছি?" নরেন্দ্র—"না তুমি বলিবে কেন? তুমিত কখন কোন কথা বল না। তবে চিঠি খানি দেখিতে দিয়াছিলে?"

নীর।—"আচ্ছা আর কখন চিঠি দেখিতে দিব না। আর কোন কথাও বলিব না। ছিঃ! বল দেখি 'মা' কি মনে করিবেন?"

নরে।—"মাকে ও বলিতে যাইতেছি।" মা ইহাতে বরং সন্তুষ্টই হইবেন।

নীর।—"না তুমি কিছু বলিও না—তোমার পাযে পড়ি" এই বলিয়া নীরবালা সকাতরে দুটি পা জড়াইয়া ধরিল।

জীতেন পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন কত টাকা বৌ-দিদিকে দিতে হইবে ও কি দিলে ভাল হয়?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। নরেন্দ্র নাথ মেয়ের বে' 'মেয়ের বে' করিতে করিতে বাহিরে পিতার নিকট যাইলেন।

দুর্গা বড় দুষ্টা। সে কেমন করিয়া শুনিয়াছে নীরবালার মেয়ের বিবাহ। সে নীরবালার ঘরে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল "বৌদিদি তোমার নাকি মেয়ের বে?"

নীর।—"তোমায় কে বলিল?"

দুর্গা।—'যে বলুক না বল মা বে কি না?"

নীরবালা দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। দুর্গা ঘর হইতে "ও মেজ দিদি ও বড় দিদি বৌদিদির মেয়ের বে গো" বলিতে বলিতে তাহাদিগের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

শৈলজার মা রান্না ঘরে রান্না করিতেছেন। একটি ঝি রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়া-

ইযা বলিতেছে "তা মা আমি না বলিয়া তুমি বলিলে ভাল হয় না ?"—মা ঠাকুরাণীর বড় ইচ্ছা শৈলজা তাঁর বৌ হয়।" শৈলজার মা উত্তর করিলেন "আমার বলিবার হইলে আর আমি গিযা বলিতাম না বাছা।—তুমি যাও না ! ঐ ঘরে আছেন।" এই বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া যে ঘরে শৈলজার পিতা আছেন সেই ঘর দেখাইযা দিলেন। ঝি বরাবর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিযা শৈলজার পিতার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইল। শৈলজার পিতার ঝির দিকে দৃষ্টি পড়িলে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথা হইতে আসিযাছ বাছা ?" ঝি উত্তর করিল "ও বাড়ী থেকে।"

শৈ পি।—"ও বাড়ী থেকে।"

ঝি।—"ভবেনদের বাড়ী গো মুশাই।"

শৈ পি।—"কেন বাছা ?"

ঝি।—"মা ঠাকুরণ জিজ্ঞাসা করে পাঠালে মুশাইরা কি শৈলজার বে দেবে ?

শৈ পি।—"কেন ?—সে কথা কেন ?"

ঝি।—"না এমন কিছু নয়, তাহলে মা ঠাকুরণের বড় ইচ্ছা শৈলকে তাঁর বৌ করেন।"

শৈ পি।—"এখন তা বলতে পারেন। দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় একথা বলিতে তাঁর সাহস হইত না। তোমাকে আর বাছা অধিক কি বলিব তুমি হইতেছ তাদের বাড়ীর ঝি। তা তোমার মা ঠাকুরণকে বলো যে আর কেন তাঁদের মনঃপীড়া দাও। যা করিবার তা [illegible] করিযাছ এখনও আশা মিটে নাই ?" ঝি জিজ্ঞাসা করিল "কি করিয়াছে বাবু ?" শৈলজার পিতা আর সে কথার উত্তর দিলেন না।

ঝি বাড়ী গিয়া তাহার মাতা ঠাকুরাণীকে সমস্ত কথা বলিলেন। ভবেনের মাতা সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিযা উঠিয়া বলিলেন "কি হরিশ বোসের [illegible] বেলা [illegible] জোটা ভার তার আবার বড়াই। বুড়োর বলতে একটু লজ্জাও হলো না। কত লোকে মেয়ে দেবার জন্যে আমার পায়ে ধচ্চে তা আমি দিচ্চি না। কত তপিস্যে কল্লে পর তবে সে আমার বৌ হবে। দেমাকে বুড়োর মাটিতে পা পড়ে না, কবে ঘি খেয়েছিলেন এখনও হাতে গন্ধ।" ঝি অবাক হইযা সব শুনিতে লাগিল, শেষে জিজ্ঞাসা করিল "ও কথা বল্লে কেন মা ঠাকুরণ?" মা ঠাকুরণ রাগে জ্বলিতেছিলেন। সে কথা কাণে প্রবেশও করিল না। শেষ বলিল "আচ্ছা আমি যদি যথার্থ কায়েতের মেয়ে হই তাহলে তাকে সাত গঙ্গার [illegible] খাওয়াব তবে ছাড়ব। বুড়ো এটা জানে না যে আমি ইচ্ছা কল্লে তাকে দেশ ছাড়া কর্ত্তে পারি। ঝি যাত একবার [illegible] মহাশয়কে ডেকে নিয়ে আয়ত !"

গুরু মহাশয় তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাক্স হইতে পঞ্চাশ টাকা তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া বলিল যাও লালুকে দিয়া এস। আর তাকে [illegible] এস একবার হরিশ বোসকে বেশ হাতে শিক্ষা পায়। যে রূপ শিক্ষা দিবে সেই রূপ তাকে আমি পুরস্কার দিব। [illegible] মহাশয় তাহার অর্দ্ধেক আত্মসাৎ করিয়া লালুবাবুর বাসায় যাইলেন। লালুবাবুর হাতে টাকা গুলি দিয়া চুপি চুপি কি বলিলেন। লালুবাবু

টাকা কটি তৎক্ষণাৎ পকেটে ফেলিয়া বলিলেন "তাও কি কখন হয় এখনও যে রাত দিন হইতেছে"। গুরুমহাশয় চলিয়া আসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লাল মোহন বাবু।

লালমোহন বাবু কে? আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত লালু চৌকিদার। সে এখন সবইনস্পেকটর। সুপারিণ্টেণ্ড তাহাকে বড় ভাল বাসে। তাহার মত পাকা লোক পুলিষে নাই সুপারিণ্টেণ্ডের এই রূপ ধারণা। লালমোহনবাবু ও সুপারিণ্টেণ্ডেকে পিতা মাতা হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ও পাকা আইনবাজ বলিয়া জানেন। লালুবাবু একটি দোকানে বসিয়া গুড় গুড়িব সট্‌কায় তামাকু টানিতেছিলেন। এমন সময় একটি বৃদ্ধ আসিয়া লালুবাবুকে সেলাম করিল।" বৃদ্ধ দেখিলে বোধ [redacted] এক জন পাকা বদ-মায়েস্ তাহাকে দেখিয়া লালুবাবু বলিলেন "কায়েম? কায়েম অমনি নিকটে যাইল। লালুবাবু কাণে কাণে কি কথা বলিয়া দিল।

কায়েম।—'আজ্ঞে' 'কবে'?

লালু।—"দুর ব্যাটা তোর কর্ম্ম নয়। তুই বেটা সব ভুলে গেছিস।"

কায়েম।—"আজ্ঞে হুজুর ভুল হইয়া গিয়াছিল—তা [redacted] মালুম দেবে?"

লালু।—"মালুম দেবে বৈ কি? হা-হা-হা এখন বুঝেছিস?"

কায়েম।—"আজ্ঞা হাঁ সেলাম [redacted] এখন চলুম" [redacted] বলিয়া কায়েম চলিয়া গেল। লালুবাবুও কি ভাবিতে ভাবিতে পুলিষের দিকে চলিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

'বে' বাড়ী।

"বাবা গো মেরে ফেল্লে গো—ওগো মেরে ফেল্লে গো" বলিয়া একটি ভয়ানক গোলউঠিল। ক্রমে বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত সে গোল যাইল। শৈলজার পিতার সবে কন্যা সম্প্রদান করা হইয়াছে এমন সময় ঐ গোল শুনিতে পাইলেন। কিছুই আহার করেন নাই—সমস্ত দিনই উপবাসী ছিলেন। তাড়া তাড়ি বাহিরে কিসের গোল দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন, একটা লোকের মাথা দিয়া অজস্র ধারায় রক্ত গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িতেছে। আর তাহার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। শৈলজার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" আহত ব্যক্তি উত্তর করিল "মেরে ফেলেছে আমায় মহাশয়?—আর বোধ হয় বাঁচিব না মহাশয়"বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। শৈলজার পিতা "ভয় কি—কে তোমায় মারিল?" 'ছাদের উপর হইতে গেলাস ভাঁড় আমার মাথায় আমার কোন শত্রু ফেলিয়া দিয়া আমার এই হাল করিয়াছে। সুমুখে আসিয়া মারিলে একবার বুঝিয়া লইতাম"। এই কথা বলিতে না বলিতে দুই [redacted] চৌকিদার আসিয়া হাজির হইল। আহত ব্যক্তির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে তাহারা থানায় লইয়া গেল। মুহূর্ত্তেক মধ্যে জন কয়েক চৌকিদার [redacted] লালু বাবু আসিয়া হরিশ বাবুকে খুঁজিতে লাগিলেন। হরিশ বাবু সবে বাড়ীতে জলযোগ করিতে বাড়ীর ভিতর গিয়াছেন। এখনও আহার করিতে বসেন নাই। বাহিরে পুলিষের হাঙ্গামা শুনিয়া তাড়া তাড়ি বাহিরে আসিলেন। লালু বাবু হরিশ বাবুকে [redacted] করিবার অভিলাষ' অপরাধে অপরাধি বলিয়া তাহাকে পুলিষে যাইতে হইবে বলিলেন। হরিশ বাবু বলিলেন "এ সব আমি কিছুই জানি না তা পুলিশে যদি যাইতে [redacted] যাইতেছি। কিছু আহার করিয়া আসি।"

লালু।—"আজ্ঞা আপনাকে যখন পাইয়াছি এখন আর ছাড়িতেছি না। যদি না যান জোর করিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য

হইব।" হরিশ্চন্দ্র আর অধিক কিছু বলিলেন না। অগত্যা যাইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক যাইলেন। বাড়ীর বাহির হইবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের হাতে হাতকড়ি পড়িল। সকলে অবাক হইয়া রহিল। হরিশ্চন্দ্রের বৈবাহিক মহাশয় অর্থাৎ যোগেশের পিতাও সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের এ অবস্থা দেখিয়া চক্ষু দিয়া দু এক ফোঁটা জল পড়িল। লালু বাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন—অনেক প্রলোভন দেখাইলেন কিন্তু লালু বাবু কিছুই শুনিলেন না। শেষে জামিন হইতে চাহিলেন। লালু বাবু বলিলেন "attempt to murder" ইহার কি জামিন লওয়া চলে? আপনারা জানিয়া শুনিয়া আমাকে ওরূপ কেন অনুরোধ করিতেছেন"?—রামতনু যোগেশের পিতা আর কি করিবেন অগত্যা একজন উকিলের নিকট পরামর্শ হইতে বাধ্য হইলেন।

রামতনু বাবু রাস্তায় [illegible]তে যাইতে শুনিলেন মুখুয্যে মহাশয়দের বাড়ীতে এক জন কলিকাতার ব্যারিষ্টার বাবু রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের মকদ্দমার [redacted] আনাইয়াছেন। রামতনু বাবু অগত্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সকাতরে একশ টাকার একখানি নোট দিয়া তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমাকে বাঁচান।"

ব্যা।—"কেন? কি হইয়াছে?"

রামতনু।—"পুলিশ অত্যাচার—পুলিশ অত্যাচার" আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্যারিষ্টার মহাশয় কেসটি মনযোগ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিলেন "ইহাতে আর ভয় কি? চলুন যাইতেছি। জামিনে কেন ছাড়িবে না।" এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া যাইলেন।

এদিকে লালু বাবু দোষ সাব্যস্ত করাইবার [redacted] বহুবিধ চেষ্টা করিলেন কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না—শেষ মার পিঠ করিলেন তাহাতেও কিছু করিতে পারিলেন না। পরিশেষে একজন চৌকিদারকে একটা বড় গর্ত্ত খুঁড়িতে বলিলেন। গর্ত্ত যথা সময়ে খনন করা হইলে হরিশ্চন্দ্রকে আনয়ন করা হইল। লালুবাবু চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন "কব্‌লে ফেলনা বাবা আর ভোগাও কেন? আমরা কি কিছু বুঝিতে পারি না। কাযেম ব্যাটাকে খাল কর্ত্তে পারেই সব প্রজা জব্দ। মোড়োলটাকে খাল করা চাই"।

হরিশ।—"আমি কন্যা সম্প্রদান করিতে ছিলাম আপনি বিশ্বাস করুণ আর নাই করুণ আমি কিছুই জানি না।"

লালু।—"কে আছিস্ র্যা শালাকে গর্ত্তোয় ফেলে মাটি চাপা দে—শালাকে [illegible]গার দে—শালা বদ্‌মায়েসের যাও কিছু [illegible]নে না—আগে আর শিখিয়ে রাখা যায় [illegible]আমরা শালা বোকা।"

[illegible]থা কহুই [redacted] চৌকিদার হরিশ্চন্দ্রকে গর্ত্তে ফেলিয়া মাটি চাপা দিতে লাগিল। কোমর পর্য্যন্ত মাটি চাপা দিল ও বলিতে লাগিল "এখনও বলচি বল্।" হরিশ্চন্দ্র কিছুই বলিলেন না। সারাদিন খান নাই তাহার উপর যথেষ্ট মার খাইয়াছেন। পৃথিবী তাঁহার ভার বোধ হইতে লাগিল—আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছেন না। লালু এক এক বার চক্ষু ঘুরাইতেছে আর বলিতেছে "আরো মাটি চাপা দে—শালা পাকা বদমায়েস।" তাহারাও তাঁহার নাসিকা পর্য্যন্ত পুতিয়া ফেলিল। হরিশ্চন্দ্র কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছেন। জীবনের আশা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। পৃথিবীর অত্যাচার হইতে কবে নিস্কৃতি পাইবেন এখন তাহাই কেবল ভাবিতেছেন। ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই চেতন রহিত হইল।

ক্রমশঃ—

রবিবাবু ও বাল্য-বিবাহ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যাঁহাদের যুক্তিরূপ অস্ত্র গুলা ভোঁতা, তাঁহারা তর্ক-সংগ্রামে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বৃথা অপবাদ দিতে বড়ই মজবুত। তাঁরা যে ডালে বসেন, সেই ডালটাই যেমন্ত্রী কাটেন, সেই মত এক স্বরে রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া, সে বেসুরো বেতালা বেযাড়া তান ধরিয়া বসেন। মধ্যে মধ্যে ধান ভানিতে শিবের গীতও আরম্ভ করা হয়। প্রধানতঃ যুক্তি ফুরাইলেই এইসব ঘটে।

উন্নতির উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় জাতি হইতে নিতান্ত বন্য বর্ব্বর জাতি পর্য্যন্তের মধ্যে এমন লোক দেখা যায় না, যে লোকটা প্রকাশ্য সভায় বা প্রকাশ্য সাময়িক পত্রে স্বজাতির বৃথা অপবাদ প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি জাতির নিতান্ত শত্রু সেও কেবল প্রকৃত দোষ গুলি প্রকাশ করিতে থাকে। জাতিগত বৃথা অপবাদ ঘোষণা করিতে তাহার ও সাহস হয় না। যে কেবল নিন্দা করে, সে অবশ্যই বিশ্বনিন্দুক। বিশ্বনিন্দুকের কথা মনুষ্য শুনে না।

রবিবাবু হিন্দু বিবাহের কথা তুলিয়া, আমাদিগের জাতিগত একটা ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন। বাঙ্গালি জাতির ভয়ানক শত্রু যদি কোন জাতি থাকে, তাহা হইলে সেজাতির কোন লোকও এরূপ বৃথা অপবাদ দিতে সাহস করে না। রবি বাবু বলিতেছেন যে, "আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে দাম্পত্য-নীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার যে যথেষ্ট প্রচলিত, তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিতে হইবে না।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, একথাটা কি ঠিক্? কোন এক জাতির মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোকের চরিত্র কোন একটা অপরাধে দূষিত হইলে সে দোষটা জাতিগত বলিয়া ধরা হয় না, অধিকাংশ লোকের চরিত্র সেই মত হইলেই তাহা জাতিসাধারণ বলিয়া গণ্য হয়। রবি বাবু এখানে "বিবাহিত পুরুষদের শব্দ অর্থে সমধিকসংখ্যক হিন্দুবিবাহিত পুরুষ ধরিতেছেন সুতরাং ইহা জাতিগত হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি বাস্তবিকই কি সমধিকসংখ্যক হিন্দু বিবাহিত পুরুষ রবিবাবুর উক্তিমত ব্যভিচারপরায়ণ, অন্য স্ত্রী বা বারস্ত্রীতে আসক্ত? "যথেচ্ছাচার যে যথেষ্ট প্রচলিত" শব্দের অর্থ বুঝিতে গেলে সমধিক পুরুষকেই উক্ত অপরাধে অপরাধী বলা হয়। আমরা পাঠকগণকে

জিজ্ঞাসা করি রবিবাবু আমাদিগের জাতিগত যে এই অপবাদ দিতেছেন, তাহা কি সত্য না ঘোরতর মিথ্যা? সত্যসত্যই কি হিন্দু বিবাহিত পুরুষেরা কুলবধূদিগের সতীত্ব-নাশ এবং বারস্ত্রীতে আসক্ত বলিয়া জগতে খ্যাত? যাহার মনোভাব যেমন সে অপরকে সেইরূপ দেখে এই যে একটা চলতি কথা আছে, আমরা সেটা এখানে প্রয়োগ করিতে না চাহিলেও এক শ্রেণীর লোক অবশ্যই সে কথাটা এখানে প্রয়োগের জন্য জিদ করিবে।

স্বীকার করি যে আমাদের দেশে নরাধম পাষণ্ড ছিল, এখনও আছে এবং ও থাকিবে যাহারা কুলবধূদিগকে ওরূপ করিয়াছিল, করিতেছে এবং করিবে। কিন্তু হিন্দু জাতির মধ্যে তাহাদের সংখ্যা এত কম ভগ্নাংশ যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ইহাও বলি যে জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেরূপ নরাধম পাষণ্ড চিরদিনই বিরাজ করিতেছে, করিবে এবং যে দেশের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা সমধিক প্রবল, সেই দেশে সেই "দাম্পত্য নীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার" আমাদিগের দেশ অপেক্ষা ভগ্নাংশে অধিক। যে ব্যক্তি জগতের বিভিন্ন জাতির চরিত্রগত ইতিহাস পাঠ করিয়াছে, সেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে।

বারবধূ চিরদিনই সকল জাতির মধ্যে আছে এবং থাকিবে। যাঁহারা সামাজিক বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন কারণে সেই বারবধূদিগের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন। সুসভ্য নীতি পরায়ণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ও তাহা স্বীকার করেন বলিয়া প্রত্যেক ক্যাণ্টনমেণ্ট বা ছাউনিতে বারবধূদিগের বাস করিবার সুবিধাও করিয়া দেন। এখন কথা এইযে কেবল আমাদিগের দেশের বিবাহিত পুরুষেরাই কি বারস্ত্রীতে আসক্ত, অন্য কোন দেশের বিবাহিত পুরুষেরা কি আসক্ত নহে? লম্পট কি কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই জগদীশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন? অন্য কোন জাতির মধ্যে কি নাই? অন্য দেশে থাকুক বা না থাকুক, আমাদিগের দেশের বিবাহিত পুরুষেরা যে যথেষ্ট বারস্ত্রীতে আসক্ত, তাহার প্রমাণ কি? রবিবাবু তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি বলেন "বৃদ্ধ লোকেরা অবগত আছেন, পূর্ব্বকাল পূর্ব্বে অন্যান্য নানা আয়োজনের মধ্য বেশ্যা রাখাও বড় মানুষীর এক অঙ্গ ছিল"। এখন জিজ্ঞাস্য যে বঙ্গদেশের সকলে কি বড়মানুষী দেখাইবার জন্য বেশ্যা রাখিত, না কলিকাতার জনকতক ধনী কেবল বেশ্যা পুষিত? রবিবাবু সেই বৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন যে সমস্ত বঙ্গ দেশের নয়, কেবল কলিকাতার অতি সংখ্যা-বদ্ধ ধনী বেশ্যা পুষিত মাত্র। এখন সেই জনকতক ধনীর আদর্শে কি দেশশুদ্ধ লোককে বেশ্যাসক্ত বলা যুক্তি-সঙ্গত? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনই তাহা বলিবেন না। আর একটা কথা রবিবাবু নিজেই বলিতেছেন যে "বেশ্যা রাখাও বড় মানুষীর এক অঙ্গ ছিল।" ইহার অর্থ এই বুঝায় যে বেশ্যা না রাখিলে বড় মানুষীর অঙ্গ হানি হইত বলিয়াই বেশ্যা রাখিত। ইহাতে এমন বুঝায় না যে দাম্পত্য নীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করিবার জন্য বেশ্যা রাখা হইত। এখানে রবিবাবু যে উদ্দেশ্যে একথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া

যাইতেছে। আর একটা কথা—"এক অঙ্গ ছিল"। এই 'ছিল' কথাটা অতীত কালের পরিচায়ক। অতীতকে বর্ত্তমানে টানিয়া আনিলে সে আসিবে কেন? রবিবাবু সিলীর দোহাই দিয়াছেন, সেই সিলীর অতি পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময় পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত জন ছিলেন, তা বলিয়া কি সিলীও সেই মত, তিনি ইহা স্বীকার করেন? যাহা "ছিল" তাহা ছিল এখন নাই, কাজেই সেটা এখন প্রয়োগ করা যায় না। রবি বাবু বলেন "এখনো দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ী করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে ও বড় ধুমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে কিছু মাত্র কষ্টবোধ করেন না। এখন জিজ্ঞাস্য রবি বাবু খ্যাতনামা শব্দের অর্থটা কি করেন? রোঘো ডাকাইত খ্যাত নামা, ওঁতিয়া ভীল খ্যাত নামা, তিনকড়ি পাল খ্যাতনামা, কৃষ্ণদাস পাল খ্যাতনামা, তিনিও খ্যাত নামা, আবার একজন লক্ষপতির নিরেট মূর্খ পুত্রও খ্যাতনামা; যে সকল খ্যাত নামা লোক এক্ষণে ধূম ধাম করিয়া বেশ্যা পুষিতেছে, তাহারা কি কেবল ধনবান পিতার পুত্র বলিয়াই খ্যাতনামা নহে? ধন যৌবন, এবং স্বাধীনতা কেবল এই তিনটির বলেই কি তাঁহারা বেশ্যা পুষিতেছেন না? [illegible] বাবু "খ্যাত নামা" কি কেবল বাঙ্গালাতেই আছে, জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে কি নাই? আর এই অতি সংখ্যাবদ্ধ জনকতক ধনী সন্তানের এই দূষিত চরিত্র ধরিয়া কি জাতির বিবাহিত পুরুষ মাত্রকেই বারবনিতাতে আসক্ত বলা যুক্তি-সঙ্গত?

রবিবাবুর দৃষ্টি কেবল মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু হিন্দু বিবাহিত সমস্ত পুরুষই কি কেবল এই কলিকাতার মধ্যে সম্ভোগস্থত্রে বেশ্যাসক্ত হইয়া আছে? কলিকাতার বাহিরে কি আর কোথায় বিবাহিত হিন্দু পুরুষ নাই? রবিবাবু বলিবেন যে, বাহিরে ও আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাহারাও কি বেশ্যাসক্ত? আমরাত জানি যে প্রধান প্রধান নগরে প্রধান প্রধান বন্দরে এবং বিদেশীয় দিগের সমবেত স্থানেই বেশ্যা থাকে, তদ্ভিন্ন বঙ্গের মধ্যে কোথাও বেশ্যা দেখা যায় না। অথবা বাঙ্গালার অধিবাসিগণের মধ্যে বেশ্যাশূন্যপল্লীগ্রামবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা বেশ্যাসক্ত হয় কিরূপে? তাহারাত কবি নহে যে, কল্পনায় বেশ্যার মূর্ত্তি গড়িয়া "দাম্পত্য নীতি-সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার" করিবে?

রবি বাবুর বিষম আপশোষ যে হিন্দু বিবাহিতা রমণী ব্যভিচারিণী হইলে, স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে এমত বিধি আছে। কিন্তু স্বামী ব্যভিচারী হইলে স্ত্রী সেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাহাতে অন্য পুরুষকে বিশ্বাস করিতে পারে হিন্দু শাস্ত্রে এমত বিধি নাই। বড়ই দুঃখের কথা। কিন্তু রবিবাবুর এ আপশোষ মিটাইবার ও কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ সমস্ত হিন্দুর সংসারে এমন একটি ও সতী স্ত্রী নাই, যিনি স্বামীর পাশবিক বৃত্তি-প্রবলতাজনিত কোন ব্যভিচারের কারণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পরে পর পুরুষের সহিত মিলিতে কামনা করেন। হিন্দুদিগের

বিবাহের পর যখন পত্নীর আর কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই, পতির সহিত পত্নী যখন এক হইযা যায, পত্নীর যখন পতিভিন্ন অন্ত গতি নাই, পতিই যখন তাহার সর্ব্বস্ব ধন তখন পতি ব্যভিচাবী হইলেও পত্নী প্রাণান্তেও তাহাকে ত্যাগ করিবার কল্পনা কবিতে পারে না। যে হিন্দু রমণী প্র্যাণ অপেক্ষা সতীত্বকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, সে হিন্দুরমণী পতি ব্যভিচারী দেখিযা কিরূপে পরপুরুষের সহিত মিলিয়া সেই সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিবে?

সৈযদ মহাম্মদ সেদিন যেমন লক্ষ্ণৌযে বক্তৃতা কালে বাবস্থার সগর্ব্বে বলিযা ছিলেন, "আমি যদি ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হইতাম" রবিবাবুও যদি সেই মত বলেন যে "আমি যদি হিন্দুদের রাজা হইতাম, তাহা হইলে ব্যবস্থা করিতাম যে কোন বিবাহিত হিন্দু পুরুষ ব্যভিচার করিবে, তাহার স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিযা অন্য বিবাহ করিতে পারিবে"। এবং বাস্তবিকই যদি তিনি সেরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে একটী মাত্রও সতী হিন্দু রমণী তাহার সেই ব্যবস্থার আশ্রয় লইবেন না। পতির প্রতি হিন্দুরমণীদের যে শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ আছে, জগতের কোন জাতির রমণীর মধ্যে সেরূপ নাই। নাই বলিযাই রবিবাবুর ন্যায় নবীন চিন্তাশীল লোকেরা যে কখন বিলাতি আজগুবী ব্যবস্থা আমদানী করিয়া হিন্দু রমণী গণকে যে [illegible] করিতে চাহেন, হিন্দু রমণীরা সেই [illegible] ব্যবস্থা সেই সকল যত্নের মস্তকে পদাঘাত করিতে চাহে।

রবি বাবু বলেন যে পরকীয়া স্ত্রীতে আসক্ত বা বারস্ত্রীতে আসক্ত পুরুষ দিগকে হিন্দু সমাজ লাঞ্ছনা করে না, একথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা হইতে পারে, কলিকাতার কোন ধনী পরিবারের নরাধম পাষণ্ড যুবক আপন ভ্রাতৃবধূ বা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সতীত্ব নাশ করিয়া অথবা ধূমধামে বেশ্যা পালন করিযা বেশ সংসারে বাস করিতেছে, কিছু মাত্র লজ্জা সরম নাই, কিন্তু তাহা বলিযা সকল ধনী পরিবারেই সেরূপ ঘটে না। এবং কেবল কলিকাতার আদর্শ ধরিযা সমস্ত হিন্দুসমাজকে সেই মত জ্ঞান করাও ন্যাযসঙ্গত হয় না। ব্যভিচারীর দণ্ড এবং বারস্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তির লাঞ্ছনা, দেশের সর্ব্বত্রই আছে। রবিবাবু [illegible] নিজে কোনস্থানে এমন লাঞ্ছনা বা দণ্ড নাই দেখিযা ভাবিযাছেন যে দেশের কোথাও নাই কিন্তু সেটা মহা ভুল।

তার পর বয়সের কথা। সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলিযা গেল, কলির কযেক হাজার বৎসরও পার হইযা গিযাছে। এই স্মরণাতীত কাল হইতে অগণিত হিন্দু জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান প্রণালীমত বয়সে বিবাহ করিয়াছে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ হইয়া মরিয়াছে, আর আজ রবিবাবু বলিয়াছেন যে হিন্দুদের বিবাহের বযসটা বড়ই কম।—হায়! যদি সৃষ্টি-প্রক্রিযার প্রথমে রবিবাবু জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মতানুসারে যুবতী-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইতে পারিত এবং মনুও তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া না জানি কতই উপকারী ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য।

এখনকার দিনে বিজ্ঞান না মানিলে, শিক্ষিত উপাধি পাওয়া যায় না। রবিবাবু

সেই বিজ্ঞানের দোহাই দিতেছেন, কাজেই যদি আমরা আপনাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করিতে যাই, তাহাহইলে বিজ্ঞানকে মানিতেই হইবে। তবে একটা নিস্তার এই যে, রবিবাবু নিজে বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কার করিতেছেন না, বিদেশীয় বিজাতীয় বিজ্ঞানবিদেরা কি বলিয়াছেন, তাহাই টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে একজন স্বজাতীয়ও আছেন। তিনি অন্য-কেবল ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকার এম, ডি, সি, আই, ই। ডাক্তার সরকার একজন চিকিৎসক, তাঁহার মতে যৌবন বিবাহই ভাল। রবিবাবুও সেই মতের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, অকৃত্রিম বিবাহের সহিত যে যে কথা বলে বা যে মত প্রকাশ করে, সেই সেই কথা বা মতানুসারে কাজও করে। আর যে, কৃত্রিম ভাবে কোন কথা বলে বা মত ব্যক্ত করে, তাহার নিজের সেই কথা বা মতের উপর বিশ্বাস না থাকায় সে, সেই মত বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, অপরে কখনই তাহার সেই মত গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহে। মহামান্য ডাক্তার সরকার যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহার মত অবশ্যই গ্রাহ্য এবং মান্য। কিন্তু যখন আমরা প্রত্যক্ষরূপে জানি যে, মহামান্য ডাক্তার সরকার নিজে মুখে বা কাগজ কলমে উক্ত মত প্রকাশ করিয়া, নিতান্ত [illegible] সহিত স্বীয় নিতান্ত বালক পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন, তখন কিরূপে তাঁহার সেই মত গ্রাহ্য করিব? যে মতের উপর তাঁহার নিজের বিশ্বাস নাই তিনি সাধারণকে সেই মত বিশ্বাস করিবার জন্য কেমনে জিদ করিতে পারেন? রবিবাবু নিজে বাল্য বিবাহ করিলেও আমরা সে কথা এখানে তুলিব না। তিনি যে বিজ্ঞান সম জুজুর ভয় দেখাইয়াছেন, সেই বিজ্ঞানের কথাই বলিতেছি। বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার সরকার যখন নিজে বৈজ্ঞানিক মতের বক্ষে প্রকাশ্যে পদাঘাত করিয়াছেন, তখন সে বিজ্ঞান জুজুকে দেখিয়া অপরে ভয় করিতে পারে কি? রবিবাবু ডাক্তার কার্পেন্টারের নাম করিয়া, তাঁহার মত তুলিয়া, যৌবন বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কাজীর হাতে হিন্দুর পাঁজী দিলে, হিন্দুর পরবের কথা সে কি বলিয়া দিতে পারিবে?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে আবার ব্যক্তিগত মন্তব্যকে চুল ধরিয়া টানিয়া আসরে নামাইবার দরকার কি? রবিবাবুর দল বলিতেছেন যে, বাল্য বিবাহ সূত্রে সন্তান নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়, এবং তাহাদের সন্তানেরা আরও ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বল হয়। এটা বিজ্ঞানের মত। যদি বিজ্ঞানের এই মতটা মানা যায়, তাহলে আমরা যে আজও আছি, এটা স্বীকার করিতে পারি না। বাল্য বিবাহ-জাত ক্ষীণজীবী-পুত্র আরও ক্ষীণজীবী হইলে, অবশ্যই এত ক্ষীণজীবী হইয়া আসিবে যে সমস্ত শরীর ক্ষয় পাইয়া মস্তকের কেশ মাত্র থাকিবে। শেষ জাতি লোপ পাইয়া যাইবে। কিন্তু যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে তবে আজিও বাঙ্গালার হিন্দু জাতি রহিয়াছে কিরূপে? কেনই বা সত্য যুগের কয়েক হাজার বর্ষের মধ্যে বাল্য বিবাহ সূত্রে হিন্দু জাতির লোপ হয় নাই? বিজ্ঞান

এ কথার উত্তর দিবে কি?

রবিবাবু বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা, একমাত্র বাল্য বিবাহ হইতেই হইয়াছে। রবিবাবু জন কতক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন যে দুই বা তিন পুরুষ পূর্ব্বে সমগ্র বাঙ্গালার দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইত। অথচ তাঁহারা বাল্য বিবাহ জাত সন্তান। যদি বাল্য বিবাহই বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে দুই এক পুরুষ পূর্ব্বে হয় নাই কেন? তখন রবিবাবুর ন্যায় বিজ্ঞানবিদ জন্মে নাই বলিয়াই কি এটা কারণ সমেত আবিষ্কৃত হয় নাই? কারণটী আপনার কার্য্য সকল সময়েই করে, তাহা কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। বাল্য বিবাহই যদি দুর্ব্বলতার কারণ হইত, তাহা হইলে যে দিন হইতে বাল্য বি[illegible] সূত্র, সেই দিন হইতেই দুর্ব্বলতা দেখা দিত। যখন আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ দীর্ঘজীবী এবং সবল ছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ জানা যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, সেই বাল্য-বিবাহ কেবল আমাদের জন্য দুর্ব্বলতা সংগ্রহ করিয়া দিতেছে?

রবিবাবু বলিতেছেন যে, বিলাতী ডাক্তারগণ বয়স সম্বন্ধে যে মত দিয়াছেন সুশ্রুত সংহিতারও সেই মত। কিন্তু আমরা বলি, এ কথাটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। রবিবাবুর সাধ্য থাকে, তিনি সুশ্রুত সংহিতা হইতে এমত একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গত যে বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে, সুশ্রুতায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছে কন্যা যৌবন বিবাহের অনুকূলে মত দিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট বলিতেছি যে রবিবাবুর সাধ্য নাই যে, তিনি সেরূপ মত উদ্ধৃত করিতে পারেন। বোধ হয় তিনি কোন গোবৈদ্যের নিকট শুনিয়া থাকিবেন যে, সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত প্রকার মত আছে। আমরা কলিকাতার প্রধান প্রধান খ্যাতনামা কবিরাজের সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া জানিয়াছি যে রবিবাবুর উক্ত উক্তিটী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ভারদ্বাজ।

পদ্মাবতী। *

বঙ্কিম বাবুর কাব্যে প্রায়ই দুই একটি (Duplicate) চিত্র বর্ত্তমান থাকে। 'চন্দ্রশেখরে' যেরূপ শৈবলিনীর পার্শ্বে দলনী, চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে মীরকাসেম, ফষ্টরের পার্শ্বে তকি, 'কপালকুণ্ডলা'রও ঠিক সেইরূপ কপালের পার্শ্বে মতিবিবি বা পদ্মাবতী বিরাজ করিতেছে। চিত্রগুলি এক প্রকারেরও নহে অথবা সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ

---

* ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে 'নবযুগে' প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী পাঠ করিবার সময়ে 'কপালকুণ্ডলা' খানি পড়িয়া রহিলে ভাল হয়। নতুবা দু এক স্থল মা'ছাড়া বাপ্ছাড়া বোধ হইতে পারে।—প্র-লে

প্রকারেরও নহে। একটি চিত্র দ্বারা যেন অন্যটির চিত্র সম্যক্ প্রতিভাসিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যুগল চিত্র একত্রিত হইয়াই যেন কোনও একটি ভাবের বা কল্পনার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পাঠকের মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে এইরূপে যুগল চিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ যুগল চিত্রের অঙ্কনে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক। যেরূপ নাটকাদির দৃশ্যপট অঙ্কিত করিতে হইলে, চিত্রকরের অভিনিবেশ সহকারে মনে করিয়া লইতে হয়, কোন্ রূপ চিত্র এখন আঁকিলে দূর হইতে দর্শকবৃন্দ চিত্রটিকে চিত্রকরের অভীষ্টরূপে দেখিতে পাইবে, সেইরূপ এইরূপ যুগল চিত্র অঙ্কনেও কবির দেখিতে হইবে, চিত্রান্তরের কোন ভাবটি বা বর্ণটি চিত্রান্তর দ্বারা প্রকাশিত করিলে যুগল চিত্র দেখিয়া দর্শকের মন চিত্রকরের সমুদয় ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিবে। যুগল চিত্র বলিলাম বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে, কোন চিত্র ব্যাখ্যা করিতে একটি মাত্র চিত্রই ব্যবহৃত হয়। কোন মহান্ চিত্র ব্যাখ্যা করিতে দুই তিন বা ততোধিক চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। গ্রন্থ বিশেষের চিত্র গ্রন্থান্তরের দ্বারাও প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। কপালের চিত্র, কপাল, শ্যামাসুন্দরী ও মতিবিবি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর চিত্রে রেখাপাত মাত্র হইয়াছে। পদ্মাবতীর চিত্র পূর্ণ বিকশিত। তাই পদ্মাবতীর চিত্র আমরা এখানে আলোচ্য বোধ করিলাম।

কপাল কুণ্ডলা যোগিনী—পদ্মাবতী প্রায় সাম্রাজ্ঞী। কপাল কুণ্ডলা প্রকৃতি-পালিতা, সংসার-জ্ঞানভিজ্ঞা—পদ্মাবতী রাজধানীতে পরিবর্দ্ধিতা মানবমনোভাবে সম্যক্ অভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলা স্নেহময়ী—পদ্মাবতী পাষাণ-হৃদয়া। কপাল নির্ব্বিকার—পদ্মাবতী ইন্দ্রিয়াধীনা। কপালকুণ্ডলা অল্পভাষী—পদ্মাবতী মুখরা। কপাল আত্মবিস্মৃতিময়ী—পদ্মাবতী স্বার্থপরায়ণা, গর্ব্বিতা,—রূপ, ধন, বুদ্ধি সকল বিষয়েই তাহার অহঙ্কার ছিল। এই সকল বিরুদ্ধ গুণ বাহিরে কিরূপ বিরুদ্ধ ভাবে ফুটিয়া পড়িয়াছে তাহাও দেখা যাউক।

কপালের রূপ বর্ণনা ও বেশ বর্ণনাস্থলে কবি লিখিয়াছেন—'অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি! কেশভার—অবেণী সম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে ছিল না—তথাপি মেঘ বিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতে ছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্র কিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশ রাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য, বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণী দেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তি মধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা বর্ণনিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদী বর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি

চিকুর উদ্ভবেরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগর-কূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।'

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা স্থলে গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে বলিতেছেন—'সেই উজ্জ্বল শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমী-চন্দ্রাকৃত-ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগল মনে করুন, সেই পক্ক চূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন, তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরী প্রধানা বলিয়া অনুভূত হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে; কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লব রেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎই অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মর্ম্ম পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহরসে গলিয়া যায়। আবার কখন বা তাহাতে সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসাবিস্ফারিত মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখ কান্তি মধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা, প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় মহান্ আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত ইনি রমণীকুল রাজ্ঞী।'

এরূপ বর্ণনা একপ্রকার চরিত্র বর্ণনা। কপালকুণ্ডলা [redacted] পদ্মাবতীর আকৃতি দেখিয়াই যেন তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধান্ত করা যায়। ইহার অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এই চিত্র দুইটিতে দুই প্রকার অদৃষ্টবাদ বর্ণিত আছে। একপ্রকার প্রকাশিত এক প্রকার প্রচ্ছন্ন। একটি মত বিশেষের স্বীকৃত, অন্যটি প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতী এই যুগল চিত্র অদৃষ্টবাদের যুগল মূর্ত্তি। আমরা শেষোক্ত অদৃষ্টবাদই আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় ধরিয়া লইলাম। আমরা এক্ষণে যাহা অদৃষ্টবাদ ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি, সমগ্র জগতে তাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা মহাকবির এই অদৃষ্টবাদটি সুস্পষ্ট করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়া, মনোবিজ্ঞানের অতি কঠোর কথা কাব্যময় করিয়া ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময় রসে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা তাহা এস্থলে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য প্রকৃতি সমস্তই বাহিরের অবস্থা দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। সে, টুকু মনুষ্যত্ব সেই টুকুই মাত্র সাধারণের তুল্য সম্পত্তি—মানব চরিত্রের বীজ স্বরূপ। মনুষ্য বলিলে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহা দ্বারা [redacted] যে কিছু আমরা মানব চরিত্রে দেখিতে পাই, তাহা অবস্থা ভেদে জন্মিয়া থাকে। এক মনুষ্য বলিলেই সমস্ত লোকগুলিকে আমরা পিণ্ডীকৃত করিয়া একটি মাত্র পদার্থ বোধ করিতে পারি। কিন্তু নাম ধরিয়া বলিলে তাহা পারা যাইবে না। মনুষ্য মাত্রই বিভিন্ন। ইংরাজিতে যাহাকে Accident

কহে আমরা তাহারে অদৃষ্ট বলিলাম। যাহাকে তাহার Differentia কহে আমরা তাহাকে 'বীর্য' বলিলাম। এই বীজের সহিত অদৃষ্টবাদ যুক্ত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া তুলিয়াছে। জগতে যত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে সকলেরই বীজ এক, কিন্তু অদৃষ্ট বিভিন্ন।

এই অদৃষ্ট লোকের চতুঃপার্শ্বস্থ অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাগুলির ক্ষমতা ভাল করিয়া বুঝিয়া, এই মূলতত্ত্ব ঠিক রাখিয়া আমাদিগের মহাকবি কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল অবস্থার ফল কিছু প্রকাশ করা যায় না, যাহা যাহা সম্যক্ পরিস্ফুট তাহাই মাত্র প্রদর্শিত হইতে পারে। এইজন্য কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর জনক-জননী-গত শিক্ষার কথা আমরা বড় একটা পাইলাম না। মূলে আমরা দুজনকেই একটি মৌলিক প্রবৃত্তির সহিত গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। সেই মৌলিক প্রবৃত্তিটি স্বাধীনতা। একের রাজধানীতে স্বাধীন অবস্থায়, স্বাধীন মন লইয়া সহবাসের, অন্যের কাননপ্রদেশে স্বাধীনাবস্থায় স্বাধীন মন লইয়া সহবাসের ফল 'কপালকুণ্ডলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর জীবনে এই স্বাধীনতা যেন বীজস্বরূপ—অন্য যাহা কিছু তাহাদিগের জীবনে ঘটিয়া ছিল, সমস্তই অবস্থাভেদ।

কপালকুণ্ডলা কিরূপে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া, কিরূপে পরিণাম প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তাহা এক স্থানে বলা হইয়াছে। এখন লুৎ-ফন্নিসা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। গ্রন্থকার লুৎফন্নিসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— 'এদিকে লুৎফন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতিসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে, প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দম বেগবতী ইন্দ্রিয় দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত তাহাই করিতেন। যখন সৎ কর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন। যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন। যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল ইত্যাদি।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক মায়ের দুই সন্তান। একটি সু, একটি কু। কপালের ভাগ্যে প্রায় সেই "সুটিই ঘটিয়াছিল, পদ্মাবতীর পক্ষে "কুটিই" ঘটিল। স্ত্রীলোকের পতিই এক মাত্র প্রকৃত অভিভাবক। এই অভিভাবক শূন্য হইয়া আগ্রার একজন প্রধান ওমরাহের দুহিতা আদর-পালিতা পদ্মাবতী, মুসলমান সম্রাটের রাজধানীতে তাঁহারই নিকটে থাকিয়া এরূপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। লোকের উপরে সন্দেশের আধিপত্য, প্রকৃত—পদ্মাবতীর ভাগ্যে

চিকুর উভয়েরই যে [redacted] বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগর-কূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।'

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা স্থলে গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে বলিতেছেন—'সেই উজ্জ্বল শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমী-চন্দ্রাকৃত-ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগল মনে করুন; সেই পক্ক চূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন, তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরী প্রধানা বলিয়া অনুভূত হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে; কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লব রেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মর্ম্ম পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহরসে গলিয়া যায়। আবার কখন বা তাহাতে সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসাবিস্ফারিত মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘ মধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখ কান্তি মধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় মর্ম্মান্ আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরাল গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত ইনি রমণীকুল রাজ্ঞী।'

এরূপ বর্ণনা একপ্রকার চরিত্র বর্ণনা। কপালকুণ্ডলা [redacted] পদ্মাবতীর আকৃতি দেখিয়াই যেন তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধান্ত করা যায়। ইহার অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এই চিত্র দুইটিতে দুই প্রকার অদৃষ্টবাদ বর্ণিত আছে। একপ্রকার প্রকাশিত এক প্রকার প্রচ্ছন্ন। একটি মত বিশেষের স্বীকৃত, অন্যটি প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। কপালকুণ্ডলা [redacted] পদ্মাবতী এই যুগল চিত্র অদৃষ্টবাদের যুগল মূর্ত্তি। আমরা শেষোক্ত অদৃষ্টবাদই আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় ধরিয়া লইলাম। আমরা এক্ষণে যাহা অদৃষ্টবাদ ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি, সমগ্র জগতে তাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা মহাকবির এই অদৃষ্টবাদটি সুস্পষ্ট করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়া, মনোবিজ্ঞানের অতি কঠোর কথা কাব্যময় করিয়া ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময় রসে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা তাহা এস্থলে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য প্রকৃতি সমস্তই বাহিরের অবস্থা দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। যে টুকু মনুষ্যত্ব সেই টুকুই মাত্র সাধারণের তুল্য সম্পত্তি—মানব চরিত্রের বীজ স্বরূপ। মনুষ্য বলিলে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহা ছাড়া অন্য যে কিছু আমরা মানব চরিত্রে দেখিতে পাই, তাহা অবস্থা ভেদে জন্মিয়া থাকে। এক মনুষ্য বলিলেই সমস্ত লোকগুলিকে আমরা পিণ্ডীকৃত করিয়া একটি মাত্র পদার্থ বোধ করিতে পারি। কিন্তু নাম ধরিয়া বলিলে তাহা পারা যাইবে না। মনুষ্য মাত্রই বিভিন্ন। ইংরাজিতে যাহাকে Accident

কহে আমরা তাহারে অদৃষ্ট বলিলাম। যাহাকে তাহার Differentia কহে আমরা তাহাকে 'বীজ' বলিলাম। এই বীজের সহিত অদৃষ্টবাদ যুক্ত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া তুলিয়াছে। জগতে যত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে সকলেরই বীজ এক, কিন্তু অদৃষ্ট বিভিন্ন।

এই অদৃষ্ট লোকের চতুঃপার্শ্বস্থ অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাগুলির ক্ষমতা ভাল করিয়া বুঝিয়া, এই মূলতত্ত্ব ঠিক রাখিয়া আমাদিগের মহাকবি কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল অবস্থার ফল কিছু প্রকাশ করা যায় না, যাহা যাহা সম্যক্ পরিস্ফুট তাহাই মাত্র প্রদর্শিত হইতে পারে। এইজন্য কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর জনকজননী-গত শিক্ষার কথা আমরা বড় একটা পাইলাম না। মূলে আমরা দুজনকেই একটি মৌলিক প্রবৃত্তির সহিত গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। সেই মৌলিক প্রবৃত্তিটি স্বাধীনতা। একের রাজধানীতে স্বাধীন অবস্থায়, স্বাধীন মন লইয়া সহবাসের, অন্যের কাননপ্রদেশে স্বাধীনাবস্থায় স্বাধীন মন লইয়া সহবাসের ফল 'কপালকুণ্ডলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর জীবনে এই স্বাধীনতা যেন বীজস্বরূপ—অন্য যাহা কিছু তাহাদিগের জীবনে ঘটিয়া ছিল, সমস্তই অবস্থাজেন্য।

কপালকুণ্ডলা কিরূপে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া, কিরূপে পরিণাম প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তাহা এক স্থানে বলা হইয়াছে। এবং লুৎফুন্নিসা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। গ্রন্থকার লুৎফুন্নিসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'এদিকে লুৎফুন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতিসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফুন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে, প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দম বেগমতী ইন্দ্রিয় দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত তাহাই করিতেন। যখন সৎ কর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন। যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন। যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফুন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল ইত্যাদি।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক মায়ের দুই সন্তান। একটি সু, একটি কু। কপালের ভাগ্যে প্রায় সেই "সুটিই ঘটিয়াছিল, পদ্মাবতীর পক্ষে "কুটিই" ঘটিল। স্ত্রীলোকের পতিই এক মাত্র প্রকৃত অভিভাবক। এই অভিভাবক শূন্য হইয়া আগ্রার একজন প্রধান ওমরাহের দুহিতা আদর-পালিতা পদ্মাবতী, মুসলমান সম্রাটের রাজধানীতে তাঁহারই নিকটে থাকিয়া এরূপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। লোকের উপরে সতন্ত্রের আধিপত্য, প্রকৃত—পদ্মাবতীর ভাগ্যে

এই সংসর্গ 'কু'ই ছিল। এরূপ অবস্থায় ও সুযোগাভাবে অনেককে বাধ্য হইয়া সৎ থাকিতে হয়, পদ্মাবতীর পক্ষে তাহাও ঘটিল না। প্রথমে স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্যে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, শেষে যখন তাহার পিতা কলঙ্কের কথা শুনিয়া গৃহ হইতে বহি-[illegible] করিয়া দিলেন, তখনত তাহার চিন্তা-মাত্র রহিল না। কলঙ্কত হইলই তবে আর কেন পরমুখাপেক্ষী থাকি, এই ভাবিয়াই যেন পাপীয়সী পাপ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। অবস্থা ক্ষেত্রে তাহায অদৃষ্ট-বীজ এই রূপেই অঙ্কুরিত হইল।

কপালকুণ্ডলাও স্বাধীন প্রকৃতির। সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ বিজনে পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহাত হইবেই। কিন্তু কপালের ভাগ্যে সংসর্গটী "সু" [illegible] ঘাছিল। যে টুকু "কু" ছিল, তাহার [illegible] তাই ছিল না, কারণ সেই "কু" টুকুর বিরুদ্ধ বল অত্যন্ত প্রবল ছিল। কপালকুণ্ডলা চারি-দিকেই ভৈরবীভক্তি দেখিতে পাইতেন। অধিকারী ও কাপালিক উভয়ই একান্ত দেবীভক্ত ও অদৃষ্টবাদী; কপালও তাহাই হইল। স্ত্রী পুরুষের [illegible] কপাল ভাল বুঝিত না। সেই লোকালয়-পরিশূন্য নিবিড় কানন প্রদেশে শৈশব হইতে পরিবর্দ্ধিতা কপালকুণ্ডলা শিক্ষাবলে বা দেখিয়া শুনিয়া তাহা শিখিতে পারিল না। তবে মনুষ্যের বীজগত যেটুকু শিক্ষা আছে, তাহা অবশ্য কপালেরও ছিল। কিন্তু তাহাও অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। অন্যবিধ চিন্তানিবিষ্ট কপালের মনে যৌবন স্বভাব-সুলভ কোন চাঞ্চল্য থাকিলেও তাহা কপাল স্বয়ং ততটা অনুভব করিতে পারিত না। আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হৃদয় মধ্যে অতি [illegible] পাপবীজও যখন লুক্কায়িত থাকিতে পারে—এতো অতি সহজ কথা।

এইরূপে আমরা গ্রন্থকারের [illegible] কপাল ও পদ্মার অদৃষ্ট উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাইলাম। অদৃষ্টও দর্শনীয় হইল। কপাল ও পদ্মা স্বাভাবিক চিত্র। এইরূপ যুগল চরিত্রের সমাবেশেই অদৃষ্টবাদটী এত সুন্দর ভাবে ফুটিয়া পড়িযাছে।

আমরা এখন পদ্মাবতীর চরিত্রের কাব্যংশ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

লুৎফ-উন্নিসার জীবন-কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ নব-কুমারের দর্শন লাভ ও পরিচয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত; দ্বিতীয় ভাগ মেহের-উন্নিসার নিকট জাহাঙ্গীরের প্রতি তাহার অনুরাগের কথা অব-গতিতে পরিসমাপ্ত, তৃতীয় ভাগ মধ্যে লুৎফ-উন্নিসার অবশিষ্ট কাহিনী বা পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটী ভাগ দিবা, সন্ধ্যা ও রজনীর ন্যায় সম্বন্ধ বদ্ধ ও অবস্থা-নুযায়ী এইরূপেই অবশ্যম্ভাবী। লুৎফ-উন্নিসার পাপাভিলাষ দিবাভাগের প্রচণ্ড তাপে স্বয়ং উত্তপ্ত হইয়া যেন সন্ধ্যাসময়ে স্বতঃই নিষ্প্রভ [illegible] পড়িল; রজনীতে জীবন জগৎ ছাড়িযা পলায়ন করিল।

জীবনের প্রথম ভাগে লুৎফ-উন্নিসা যৌবনের দুর্দ্দমনীয় পাপস্রোতে জড়ের ন্যায় ভাসমান হইলেন। যেরূপ অবস্থা এরূপটি ঘটিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যদেচ্ছা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিছু শমিত হইলে, লুৎফ-উন্নিসার আবি-

পত্যেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সেলিমের মহিষী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। যে যেরূপ অবস্থায় যেরূপ মন লইয়া যেরূপেই থাকুক না কেন, তাহার মনে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আশা থাকিবেই। সেই আশাটীর প্রকৃতিও আবার অবস্থানুযায়ীই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভোগ-পবায়ণা লুৎফ-উন্নিসার ভোগ-লালসা একদিকে নির্ব্বিবাদে পরিতৃপ্ত হইতে ছিল, কাজেই অন্যদিকে এখন তাহা ধাবিতা হইল। লুৎফ-উন্নিসা এখন সেলিমের প্রধানা মহিষী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ আশা তাঁহাব পক্ষে সম্যক্ অনুচিতও হয নাই। তাঁহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, রসজ্ঞতা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সেলিমও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এরূপ আশা না হইবে কেন? কিন্তু লুৎফ-উন্নিসাকে শীঘ্রই এ আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ দেখিয়াই তাহাকে ঠিক করিতে হইল যে মেহের-উন্নিসাই সম্ভবতঃ সেলিমের মহিষী হইবেন।[১] এক আশা যায়, অন্য আশা আসে—জগতের রীতিই এইরূপ। লুৎফ-উন্নিসা এ আশা ত্যাগ করিয়া অন্য এক দুঃসাহসিক সংকল্প করিলেন। যুবরাজ সেলিমের পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে তাহার সঙ্কল্প হইল। এ সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য গুলি গ্রন্থকার এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়-শেল। যাহাতে মেহের উন্নিসার সহিত সেলিম মিলিত হইতে না পারেন, এই ইচ্ছা লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেই। খসরু সম্রাট হইলে, সেলিমের এ আশা পূর্ণ হইবে না।

২। রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, পুরস্কার স্বরূপ কোন প্রধান রাজ পুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হইবার সম্ভব। আধিপত্যপ্রিয় লুৎফ উন্নিসা ইহা অভীপ্সিত মনে করিলেন। অন্য কারণও আছে। রাজপুরীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার ভোগাড়ম্বরের কিছু বিঘ্ন হইতে ছিল, বাহিরে তাহা হইবার সম্ভাবনা নহে।

৩। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, এতদ্বারা তাহারও প্রতি[illegible] হইবে। এই তিনটী উদ্দেশ্যর মধ্যেই লুৎফ-উন্নিসার সেই আধিপত্য-প্রিয়তা, প্রতিজিঘাংসা ও ভোগেচ্ছা বলবতী দেখিতে পাই। লোকের উদ্দেশ্য ত স্বভাবানুযায়ীই হইবে; তবে লুৎফ-উন্নিসার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইবে কেন?

সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যখন লুৎফ-উন্নিসা উড়িষ্যা গমন করিয়াই তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখনই তাহার সহিত নবকুমারের দেখা হয়। এই দর্শন ও পরিচয় পর্য্যন্তই তাহার জীবনের এক ভাগ বিস্তৃত। তাঁহার জীবনের এই ভাগে শেলি-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বেজহট (Bagehot) মানব প্রকৃতিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাদিগের মনে সদসতে, কুমতি সুমতিতে, জ্ঞানে ও অভিলাষে বিস-

স্বাদ হইয়া থাকে, তাহারা ইহার এক ভাগে অন্তর্নিবিষ্ট। আর যাহাদিগের মনে ভাব সমূহের কোন বিরোধ নাই, এক টানা জলের ন্যায় সে গতির কোন বাধা বিঘ্ন নাই, তাহাদিগকে তিনি অপর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে শেষের শ্রেণীস্থ-লোককে হয় দেবতা না হয় অসুর হইতে হইবে।

কপাল ও পদ্মা এই শেষোক্ত শ্রেণীর। উক্ত দুই প্রকার লোকের আদর্শ স্বরূপ। উভয়েই স্বাধীনা—স্বেচ্ছাচারিণী—কিন্তু এক জনের ইচ্ছা নির্ম্মল সলিল রাশির ন্যায় বক্ষ-দেশে বিমল চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত করিয়া বিজন কাননাভ্যন্তরে আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল অপরের অভিলাষ অদৃষ্ট দোষে পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হইয়া, প্রখর সূর্য্যালোকে কলঙ্করাশি সুপ্রকাশিত করিয়া বহুজন সমাকুল নগর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। একটী দেবী, অন্যটী দানবী।

কিন্তু পদ্মাবতীর এই দানবী-প্রকৃতি চিরদিন এক রহিতে পারে নাই। কিছু দিনের জন্য আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পদ্মাবতীর গতি আবার বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, এক পদ্মাতেই আমরা উভয় প্রকৃতি দেখিতে পাইয়াছি। পদ্মার জীবনের প্রথমভাগ ও শেষ ভাগে সেই একটানা ভাব দেখিতে পাইলাম। মধ্যভাগে কিছু দিনের জন্য তাহা দুই দিকেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সেই সদসতে বিরোধ ভাব পদ্মার জীবনের যে ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাকেই পদ্মার Crisis বা সঙ্কট কাল বলিতে হইবে। আমরা এক্ষণে সেই সঙ্কটকাল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

স্বামীর নিকট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পদ্মাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। একখানি বাষ্পীয় শকট যেন হৃদয় প্রদেশ দলিত করিয়া চলিয়া গেল। অতীতের স্মৃতি, স্বপ্নের ন্যায় হঠাৎ মনোমধ্যে জাগরুক হইল। এই ত সেই নবকুমার! যিনি বিধাতার অন্য রূপ ইচ্ছা না হইলে, আজ পদ্মাবতীর হৃদয়ের ধন হইতেন। পদ্মাবতীও ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃতা হইলেন। এই আশার অজ্ঞাতসারে পদ্মাবতীর পাষাণ-হৃদয়ে একটী সুবীজ রোপিত হইল।

বলা বাহুল্য যে পদ্মার হৃদয়ে এ ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। রূপাভিমানী পদ্মা নবকুমারকে মোহিত করিবার জন্য বেশভূষা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই প্রফুল্লের কথা মনে পড়িল। যদি পদ্মার মতি সম্যক্ পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তাহাকে আবার এখানে সেইরূপ নিরাভরণা দেখিতে পাইতাম। আর এক দিন দেখিতেও পাইয়াছি। কিন্তু গর্ব্বিতা পদ্মাবতী প্রফুল্ল নহে—রূপ ও ধনের প্রভাব দেখাইতে অভিলাষ, লোক মন মোহিত করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পদ্মাবতী ছাড়িতে পারিল না। এইরূপে সজ্জিতা হইয়া পদ্মাবতী স্বামীর সহিত সপত্নী সম্ভাষণে চলিলেন। প্রকৃতি সজ্জিতা নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখিয়া পদ্মাবতীর 'অধর পার্শ্বে ও নয়ন প্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল'। বুঝি পদ্মা মনে মনে

তখন নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'আমার সম্মুখে কি এই রূপের গর্ব্ব করিয়াছিলে ?' রূপাভিমানিনীর এ সন্তোষ স্বাভাবিক। কিন্তু যখন জ্বালিত প্রদীপালোকে কপালের রূপ রাশি বিস্তারিত হইয়া পড়িল তখন পদ্মার সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল। পদ্মার মুখ গম্ভীর হইল ,—'পদ্মা অনিমিষ-লোচনে কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে লাগিল। কেহ কোন কথা কহে না ;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।'

অভিমানেরও একটা সীমা আছে। পদ্মাবতী কপালকে স্বকীয় গাত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া তাহার রূপের প্রসংশা করিতে লাগিলেন। এ অলঙ্কার দানে বা এ সব ব্যাপারে যে কেবল মাত্র কপালের রূপের জন্য হইয়াছিল আমরা এরূপ বোধ করি না। নবকুমারের পত্নী না হইলে কপাল আজ এরূপ আদৃতা হইত কি না সন্দেহ। নবকুমারের প্রতি পদ্মার আসক্তির সঞ্চার ইহাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। "আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন" এই কথাটিতে তাহা কিছু ফুটিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখনও আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। যখন বিস্ময়ে পেষমন মতি বিবিকে জিজ্ঞাসা করিল "বিবি এ ব্যক্তি কে ?" এবং গর্ব্বিতা পদ্মাবতী উত্তর করিল 'মেরা খসম', তখন সব বুঝিলাম। 'মেরা খসম'—কি সুন্দর ভাবেই কথাটি বসান হইয়াছে। সেলিম পরিণয় প্রার্থী পদ্মাবতী যেন গর্ব্বসহকারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া পেষমনকে উত্তর করিল 'মেরা খসম'। সাধারণ ভাবে পদ্মার এ গর্ব্ব সমুদিত হয় নাই। পদ্মা এখন নবকুমারের প্রতি সত্যই আসক্তা।

পদ্মাবতীর পূর্ব্ব মনোভাব পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সেলিমের মহিষী হইতে যাহার অভিলাষ, সে আজি নবকুমারের প্রণয়প্রার্থী হইল। দুটী বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। একদিকে আধিপত্যেচ্ছা ও কুমতি, একদিকে প্রণয় ও সুমতি সজ্জিত হইয়া পদ্মার হৃদয় প্রদেশে সংগ্রাম করিতে লাগিল। এই বিরুদ্ধ ভাব লইয়া পদ্মাবতী মেহের উন্নিসার কাছে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলেন। সকল বিষয়েরই নূতন যেমন আদর পায়, পুরাতন সেরূপ নহে। আজ পদ্মার নিকট সুমতি ও প্রণয় নূতন পদার্থ। পদ্মা কিছু তাঁদিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তোমরা সুমতির বাহাদুরি বজায় রাখিতে ইচ্ছা হইলে তাহার বলাধিক্য বর্ণনা করিতে পার, আমরা কিন্তু নূতন বলিয়াই পদ্মার মনে এরূপ ভাবপ্রাবল্য হেতু ব্যাখ্যা করিব। প্রণয়ের ও সুমতির ও যে কিছু ক্ষমতা না ছিল এমত নহে, তবে তদপেক্ষা তাহাদিগের নূতনত্বেই যেন পদ্মার আকর্ষণ বেশী স্বাভাবিক বোধ হয়।

বঙ্কিম বাবু একস্থলে প্রণয়-লক্ষণের মধ্যে বিনা প্রসঙ্গে প্রণয়ের কথা উত্থাপন একটি লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। আমরা বর্দ্ধমানের পথে পদ্মাকে আজ সেই লক্ষণাক্রান্ত দেখিব।

' যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতি বিবি বা লুৎফউন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত

যাইতে পারিলেন না। অন্য চটীতে বহি-লেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষ্‌মনের সহিত একত্র বসিযা কথোপকথন হইতেছিল, এমত কালে মতি সহসা পেষ্‌মনকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,

'পেষ্‌মন৷ আমাব স্বামীকে কেমন দেখিলে ?'

পেষ্‌মন, কিছু বিস্মিত হইযা কহিল, 'কেমন আর দেখিব? '

মতি কহিলেন 'সুন্দর পুরুষ বটে কি না?'

লক্ষণের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইল। পেষ্‌মনেব সহিত এরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময অন্য এক সম্বাদ উপ-স্থিত হইল। খস্রুকে সিংহাসনারোহণের চেষ্টা বিফল হইযাছে, আগ্রা হইতে এরূপ সংবাদ আসিল। নবকুমার-চিন্তা এখন কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত হইল। এই সময কাব কিছু কথোপকথনও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

অনুপায় দেখিয়া পেষ্‌মন বলিল 'তবে কি হইবে? '

মতি কহিলেন ' এক ভরসা আছে। মেহের উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁ-গীবেব প্রতি অনুরাগিনী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, [redacted] জাহাঁগীর শত সেরআফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহেব উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভি-লাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই? ।'

পে। মেহের উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিযা কহিলেন, ' লুৎফ-উন্নিসার অ-সাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী, কালি বর্দ্ধমানে গিযা তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি কবিব।

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদসাহের অনুরাগিনী না হন, তাহাহইলে কি করিবে ?

মা। পিতা কহিয়া থাকেন, 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীযতে।'

"উভযে ক্ষণেক নীরব হইযা বহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতিব ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষ্‌মন্ জিজ্ঞাসা করিল 'হাসি-তেছ কেন ?'

মতি কহিলেন 'কোন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে।'

পে। কি নূতন ভাব ?

মতি তাহা পেষ্‌মন্‌কে বলিলেন না।

যে পরিমাণে পদ্মার একদিক্‌কার আশা কমিতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহার অন্য দিক্‌কার সঙ্কল্প সুস্থির হইতে লাগিল। শান্তি পদ্মার ভাগ্যে ছিল না।

পদ্মাবতীর জীবনের মধ্যভাগের কথা বলিতে গিয়া একটী কথা মনে পড়িল। পদ্মার সহিত মেহের-উন্নিসার সাক্ষাতে [redacted] কথোপকথনে আমাদিগের কবিবর তাঁহার আর এক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার তৃতীয় [redacted] তৃতীয় পরি-চ্ছেদ নাটকাংশে উপমারহিত।

মতিবিবি [redacted] মেহের-উন্নিসা প্রতি-যোগিনীদ্বয় এক মনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই চতুরা, উভয়েই বাক্‌পটু উভযেই নিজের মনের কথা না বলিয়া অন্যের মনের সংবাদ জানিতে

চেষ্টিত। মেহের-উন্নিসা বসিয়া কি লিখিতেছেন। পদ্মা তাঁহার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্র লিখন দেখিতেছিলেন [redacted] তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, কি ছলে সেলিমের কথা উত্থিত করিবেন। চতুরা পদ্মাকে অনেকক্ষণ [redacted] কথা ভাবিতে হয় নাই। তিনি চিত্র লিখন উপলক্ষে মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্য্যের কথা উত্থাপন করিয়া, সেলিমের প্রতি সেই সৌন্দর্য্যের প্রভাব বর্ণনা করিবেন ও তদ্দারা মেহেরউন্নিসার মনোগত ভাব কতক কথা [redacted] কতক কথোপকথন দ্বারা বুঝিয়া লইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তাই মেহের-উন্নিসা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন [illegible] দেখিতেছ' পদ্মাবতী উত্তর করিলেন 'তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়'।

মেহে। 'তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?'

চতুরা মতিবিবি সুযোগ পাইয়া বলিলেন 'অন্যের তোমার [redacted] চিত্রনৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত'। মেহের-উন্নিসা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে'। লুৎফউন্নিসা তখন হেমচন্দ্র [redacted] মনোরমার কথোপকথন শুনিয়া গিরিজায়ার [redacted] লক্ষণ গণনা করিতে ছিলেন কি না জানিনা, আমরা ত গণিতে আরম্ভ করিলাম। এ গাম্ভীর্য্য ও [redacted] কথা দেখিয়া [redacted] শুনিয়া বুঝিলাম যে মেহের-উন্নিসার মনে মনে এইরূপ একটি দুঃখের স্রোত বহিতেছে যে তাঁহার এ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ব্যবহার হইল না। বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে এ লক্ষণটি বড় ভাল নহে। লুৎফ-উন্নিসা সুযোগ পাইলেন। মেহের-উন্নিসার এই দুঃখোচ্ছ্বাস ধরিয়া তাঁহার মনের কথা বাহির করিতে পারিবেন ভাবিয়া যেন ঈষৎ হর্ষের সহিত ঝাঁকিয়া বসিয়া কথাটির সূত্র ধরিলেন। কিন্তু এবারে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মেহের-উন্নিসা এ প্রশ্নের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। লুৎফ-উন্নিসার অস্ত্র ব্যর্থ হইল। মেহের সগর্ব্বে আত্মরক্ষা করিলেন। কথোপকথন চলিতে লাগিল। এবারে মেহের-উন্নিসাই আক্রমনকারী—লুৎফ-উন্নিসা যখন বলিলেন যে 'আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে' মেহের নিজের ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া কহিলেন 'কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের না তাঁহার মহিষীর?' আমরা আবার গণিলাম নং ২—বিনা প্রসঙ্গে সেলিমের কথা উঠাইবার চেষ্টা। লক্ষণ আরও মন্দ। লুৎফ-উন্নিসা এ অস্ত্রাঘাত পার পাতিয়া লইলেন। আত্মরক্ষা আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ সেলিমের [redacted] উত্থাপিত করা [redacted] তাঁহার ও উদ্দেশ্য। মতি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন 'এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে।' [redacted] আবার আক্রমণ করিলেন। বলিলেন 'কিছু জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাস বেগম করিবেন তাহার কতদূর?"

আমরা আবার গনিলাম নং ৩। মেহের ক্রমে উঠিতেছেন। সেলিমের খাস বেগমের কথা তাঁহার অন্তরের সদালোচ্য বিষয়। সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠাইলেন। লুৎফ-উন্নিসা এবারে আত্ম রক্ষার্থ একটু আক্রমণও করিলেন। দিল্লীশ্বরের মহিষীর দুঃখের ভাগটুকু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। বুঝি মনে করিলেন, ইহাদ্বারা মেহেরের সে পদ কতদূর বাঞ্ছনীয় পরীক্ষা করিবেন। লুৎফ-উন্নিসার আবার জয় হইল। মেহের বলিলেন 'যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন।' আমরা গনিলাম নং ৪। এ বাসনা মেহের-উন্নিসার কাছে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। লুৎফ-উন্নিসা ভাবিলেন, মেহের উন্নিসার হৃদয়ে উচ্ছাস উঠিয়াছে। তাই কিছু স্পষ্টতর হইয়া বলিলেন 'সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখন করি না। [illegible] হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।' এবার কথাটি কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। আত্মসংযম করিয়া বলিলেন

'ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্ত এ কথা বলিলে, কি আমার [illegible] জানিবার জন্ত বলিলে। (আমরা আবার গণিলাম নং ৫— [illegible] কথা কেন?) কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে সেরআফ্গানের বণিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে সেরআফ্গানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

"লজ্জাহীনা সতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না। বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, 'তুমি যে পতিগত প্রাণা তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্তই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্যান্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্ত। সাবধানে থাকিও।"

চতুরা পত্নার এক উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল। প্রকারান্তরে তিনি মেহের প্রতি সেলিমের অনুরাগ জানাইলেন। এ বড় বিষম কথা। তোমাকে একজন ভাল বাসে, এ কথা তোমার নিকট বলিয়া অনায়াসেই তৎপ্রতি তোমার অনুরাগ আছে কি না অতি সহজে জানিতে পারা যায়। লুৎফউন্নিসা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখন প্রায় সিদ্ধকাম হইতে চলিলেন। এ কথার মুখ্য ফল কিছু হইল না। বুদ্ধিমতী মেহেরউন্নিসা যেন মোটা কথায় আত্মরক্ষা করিলেন, এ আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বলিলেন 'এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা'। লুৎফ-উন্নিসা আবার মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন 'বৈধব্যের আশঙ্কা?' এই কথা কহিয়া তিনি মেহেরউন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না।" চতুরা মেহেরউন্নিসা সদর্পে কহিলেন 'বৈধব্যের আশঙ্কা! সের আফ্গান আত্মরক্ষায় [illegible] নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্য মধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ [illegible] করিয়া নিস্তার

পাইবেন না। আমরা আবার গণিলাম নং ৫। "আকবর বাদশাহের জীবিতাবস্থা ও তদবস্থায় মেহেরউন্নিসার মানাবাসনা পূরণের অসম্ভাবিতা মেহেরউন্নিসার মনে সর্ব্বদা জাগরূক হইত।"
আকবরের মৃত্যু না হইলে মেহেরউন্নিসার এজন্য অস্থির হওয়া বৃথা, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। কথাটি অন্যভাবে খুলিয়া আসিল। লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন কি না, জানি না। তিনি বলিলেন 'সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সম্বাদ এই যে, আকবর শাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?' মেহেরউন্নিসা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? "তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"

বাঁধ ভাঙিল। নির্ঝরিণী পর্ব্বত গহ্বর হইতে ঝর ঝর রবে ছুটিয়া পড়িল। সংযমিত হৃদয়ের আবেগ মুক্তরশ্মি হইল। কেন যে হইল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই একরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি।

মতির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। গ্রন্থকার লিখিলেন "যিনি পরে আত্মবুদ্ধি প্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ মেহেরউন্নিসা প্রণয়শালিনী, "মতি বিবিঁর হৃদে কেবলমাত্র স্বার্থ পরায়ণা।"

কি বলিয়া যে এই অধ্যায়টির প্রশংসা করিব, জানি না।

গ্রন্থকার আবার লিখিলেন

'এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্ত ভাব বুঝিলেন।'

মতি যে কেন ইহা তখন বুঝিল না অথচ আনন্দিত হইল, আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মতি যদি তাহা বুঝিত, আমরাও তাহা একরূপ বুঝিতাম। বুঝিতাম যে, এরূপ অনেক সময় ও অবস্থার সমাবেশ হয় যে, একদিকে প্রলোভনের দারুণ আকর্ষণ অন্যদিকে প্রলোভনত্যাগেচ্ছা মানব-হৃদয়ে বিষম বিরোধ জন্মাইয়া দেয়। মনে ভাবি যে, প্রলোভন ত্যাগ করিলে ভাল হয়, ত্যাগ করা উচিত, অথচ এরূপ ক্ষমতা নাই যে সে প্রলোভন সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগ করিতে পারি। এরূপ অবস্থায় যদি কোন ঘটনা বশতঃ প্রলোভনটি স্বতঃ দূরীভূত হয়, আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ হয় না। কোন একটি মদ্যপ বিশেষ প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর কখন মদ খাইবে না, কিন্তু তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে হাতে পাইলে সে মদ ত্যাগ করিতে পারে। সে গৃহে আসিয়া দেখিল, টেবিলের উপর একটি মদের বোতল রহিয়াছে। সেই শুচি মত্তার

পাত্র সমীপে উপবিষ্ট রুগ্ন লোভী ব্রাহ্মণের ন্যায় ভাবিতে ভাবিতে সে সেই মদ্যপাত্র সমীপে গেল। গিযা দেখিল যে সে মদ্যপাত্রে জল রহিয়াছে, মদ্য নাই; এরূপাবস্থায় তাহার মনে যেরূপ ভাব হইবে, পদ্মাবতীর তাহাই হইল। বিনা আয়াসে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিয়া তাহার এ আনন্দ হইল। কিন্তু এরূপ আনন্দ ত অজ্ঞাতসারে হইতে পারে না। এ আনন্দের কারণ বুঝিতেই ত আনন্দ তাই বলিতেছিলাম, যে, শেষের কথাগুলি না থাকিলে ইহা একরূপ বুঝিতাম।

এইরূপে পদ্মাবতী বিনাক্লেশে সঙ্কট কাল অতিবাহিত করিলেন। নবকুমারের প্রতি আসক্তি এখন নির্ব্বিবাদে একটানা স্রোতে হৃদয মধ্যে প্রবাহিত হইল। পদ্মাবতী জীবনের তৃতীয় কালে উপনীত হইলেন।

এই কালের বর্ণিতব্য বিষয় দুইটি। পদ্মাবতীর অনুতাপ ও আসক্তি। আমরা যথাক্রমে এখন তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

পদ্মাবতীর সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিল। গ্রন্থকার পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার অতি সুন্দর পরিচয় প্রদান করিলেন।

"লুৎফ-উন্নিসা আজ আত্মমন্দিরে। বেশ ভূষা পরিত্যক্ত হইয়াছে—নয়নে পূর্ব্বে যেরূপ একটি বিদ্যুৎ কটাক্ষ প্রকাশ পাইত তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্ম পেষমনকে কহিতেছেন "এই পোষাকটি তুমি লও।" এতদুপলক্ষে পেষমনের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইল, তাহার সমস্তগুলি বলিবার এখানে স্থান নাই। লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা ত্যাগ সংবাদ শুনিয়া যখন পেষমন্ কহিল 'এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিল?' লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন,

'কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তিজন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এতদূর করিলাম তাহার কোন্টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলইত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও বা হইল? আজ এইখানে বসিয়া সকল ... মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, একদিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্ত-জন্য কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এসকলে যদি সুখ থাকিত তবে এত দিন এক দিনের তরে সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিনীর ন্যায—প্রথমে নির্ম্মল ক্ষীণধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না, আপনাআপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়, শুধু তাহাই নয়; কখন আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয় মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচর মরুভূমি নদী-হৃদয়ে

বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইযা যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদী-শরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায় কে বলিবে ?

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন ?

লু। কেন হয় না তাহা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি।

পে। কি বুঝিয়াছ ?

লু। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেব-মূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণরত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্ত শিরা বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই ?

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকেও ভালবাসিয়াছি ?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নইত কি ?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন ?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রার ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তাহারই বা প্রয়োজন কি ? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে ? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন তাঁহাকে কেন ভালবাস না ? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহার বড় পৃথিবীতে কে আছে।

লু। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন ?

পে। কেন ?

লু। ললাট লিখন।

গ্রন্থকার বলিলেন লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। "পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।"

কি তীব্র মর্ম্মভেদী অনুতাপ। আগুনের ন্যায় যেন ইহা পদ্মাবতী হৃদয় প্রদেশ দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইতেছিল। পদ্মাবতীর শিক্ষাফল এই অনুতাপসূচক বাক্যাবলীতে প্রকাশিত রহিয়াছে। এ অনুতাপ সামান্যা রমণীর নহে—এ অনুতাপ জ্ঞানবতী সুশিক্ষিতা অথচ পাপনিরতা কামিনীর। পদ্মার এ অনুতাপ না জানি পৃথিবীর কত শত লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ। কিন্তু শুধু শিক্ষায় কি হয় ?

আমরা পদ্মার এ অনুতাপ সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিব। একটি এই অনুতাপ, এরূপ সহসা কেন উৎপন্ন হইল ? আর একটি এ অনুতাপের প্রকৃতি—ইহার অন্তর্নিহিত সত্য ও নির্ম্মল জ্ঞান।

অভিলষিত পাপ কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এ অনুতাপের সূচনা হইল। আরও এক কথা আছে। নিরত নির্ব্বিবাদে পাপাচরণ করিতে পাইয়া পাপের স্পৃহা সহজেই পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া চলিতেছিল। যদি সে এরূপ স্বেচ্ছাচারিণী না হইতে পারিত,

তাহার এ পাপস্পৃহা পরিত্যাগে আরও কিছু সময় আবশ্যক হইত। ইহাও জগতের রীতি। এই জন্যই জগতে যাহারা যখন ধার্ম্মিক হইল, তখন তাহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চে উঠিল। এই কারণেই ইংরাজিতে প্রবাদ আছে যে Best men are moulded out of faults.

অনুতাপের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পাপে পাপ বলিয়া পদ্মাবতী তাহা ত্যাগ করে নাই। পাপে সুখ নাই বলিয়া, শান্তি নাই বলিয়া সে তৎস্পৃহা ত্যাগ করিল। সুখান্বেষণই মানুষের মৌলিক প্রকৃতি।

'ধর্ম্ম সুখের জন্য' এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য ও প্রকাশযোগ্য। ইহা গোপন করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইতেছে না। ধর্ম্মে আর কি আছে? ধর্ম্মাচরণই সুখ ও বা সুখের জন্যই বটে।

পদ্মাবতী আরও একটি তত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুখের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইলে কিছুতেই সুখ হয় না। যে প্রকৃত সুখ চাহিবে, কিছু কালের জন্য তাহাকে সেকথা ভুলিয়া নিষ্কাম ভাবে যথা কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই যথাকার্য্য সম্পাদনই ধর্ম্ম। এবং এইরূপ নিষ্কাম ভাবে তাহা আচরণ করিলেই সুখ হইবে। কহিয়া বলিয়া সুখ ধরা যায় না। মনের খবর জানিতে পারিলে, নিশ্চয়ই এ সুখ পাওয়া যাইবে। মনের খবর আবার সকলেই ইহাতে জানিতে পায়। তাই এ কথা ভুলিয়া অপ্রার্থী হইয়া সুখের নিকট দিয়া গমন কর সুখ আপনি ধরা দিবে। সুখগুলি অনন্ত পাখীর ন্যায় কর্ম্ম বৃক্ষে বসিয়া রহিয়াছে। একবার একটি সুখ ধরিলেই যে তোমার দুঃখ ঘুচিবে তাহা নহে। তোমার জীবন প্রতিমুহূর্ত্ত, এই অনন্ত সুখের নিকট অপ্রার্থী হইয়া গমন করিতে হইবে। একটি একটি করিয়া সুখগুলি তোমাকে ধরা দিবে। যেটি ধরিলে, তাহারই আনন্দ উপভোগ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই আনন্দে বিভোর হইয়া আবার ঐ প্রকার অন্য সুখকে ধরিয়া আনন্দিত হইবার কামনা করিও না—তাহা হইলে যে সুখ হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত হইল। সম্মুখে অনন্ত সুখ পড়িয়া রহিল তদভাব জনিত কষ্ট তোমাকে পাইতেই হইবে। তাই, আমাদিগের প্রতিমূহুর্ত্তে এই সুখগুলির নিকট দিয়া অপ্রার্থী হইয়া গমন করিতে হইবে। সুখ আপনি ধরা দিবে। এইজন্য অগ্রে প্রস্তুত হওয়া চাই। কিরূপ করিলে সুখ ধরা দেয়, শিক্ষা করা চাই। ক্রমাবচ্ছিন্নে সব সুখই যে ধরা দিবে তাহা নহে, অর্থাৎ যথারীতি সুখ বলিবার উপায় যে সকলে জানে তাহা নহে। দুই একটি সুখ প্রথমতঃ ফাঁক যাইবে। কিন্তু শেষে অভ্যাস হইলে নির্ম্মল, নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত সুখ আয়ত্ত হইবে। সুখ না চাহিয়া, সে যে কর্ম্মবৃক্ষোপরি আরোহিত আছে, তাহাতে আরোহণ কর, সুখপালিত পক্ষীর ন্যায় তোমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এই কর্ম্মবৃক্ষ জানা বড় দুষ্কর। যেরূপ সুখগুলি মস্তকে করিয়া অনন্ত কর্ম্মবৃক্ষ সারি দিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ অনন্ত দুঃখ মস্তকে করিয়াও অনন্ত কর্ম্মবৃক্ষ তৎপার্শ্বে সন্নিবিষ্ট আছে। যদি তুমি এ বৃক্ষে আরোহণ করিবে নহিলে অন্য বৃক্ষে আরোহণ করিবে।

কেহবা ছুইবৃক্ষে ছুই পা ও বাধিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি সুখ পাখী অতি ক্ষীণজীবি। দেখিতে মনোহর বটে, হস্তে পড়িলেও অনির্ব্বচনীয় সুখ হয় বটে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পাখীটি আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ সুখ পাখি এ কাতারেও আছে, ও কাতারেও আছে। এ পাখিগুলিকে আমরা নীচ জাতীয় ইন্দ্রিয় সুখ বলিয়া জানি। এ পাখির মধ্যে যে গুলি সুখ পাখিগুলির মধ্যে উপবিষ্ট আছে, তাহা তোমাকে ধরিতে হইবেই। প্রার্থী হইয়া চলিলেও ইহা পলাইয়া যায় না। অপ্রার্থী হইয়া গেলেও ইহা হাতে পড়িবেই। ইহারা ক্ষুধার প্রয়োজনীয়তার সন্তান। অন্য শ্রেণীতে এই জাতীয় যে পাখিগুলি আছে, জাতিতে একই বটে। কিন্তু দুঃখ রাজির মধ্যে থাকাতে, তাহা অনন্ত দুঃখ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। লিখিতে লিখিতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি—এখন ফিরিতে হয়।

পদ্মার জীবনের প্রথমভাগে আসক্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় না। লুৎফ-উন্নিসা স্ব মুখেই বলিয়াছেন তিনি আগ্রায় অন্য কাহাকে ভাল বাসেন নাই। সেলিমের [illegible] কিন্তু কাহাকেও কখন [illegible] মুগ্ধ করে নাই। [illegible] পাষাণ-হৃদয় বলিয়াছেন। আসক্তিটা লোকের মৌলিক প্রকৃতি। পদ্মাতে তবে তাহা বিকশিত হয় নাই কেন? আমরা ইহার কারণ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহি। আসক্তিতে একটা বন্ধন স্বীকার করা চাই। ভালবাসা এক প্রকার অধীনতা। স্বাধীনতা প্রিয় পদ্মা তাহা স্বীকার করিতে চাহিত না। সামান্য বারস্ত্রীর ন্যায় অর্থ, সম্পদ, সম্মান ও ইন্দ্রিয় সুখই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইহার প্রত্যেকটিই ভালবাসার শত্রু স্বরূপ। সুতরাং মানুষে তাহার আসক্তি না জন্মিয়া যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তি ও বিষয় ভোগ বাসনায় তাঁহার আসক্তি ছিল। এইরূপ সুখে আসক্তি থাকা প্রযুক্ত, কোন একটি মনুষ্যে তাঁহার আসক্তি স্থির থাকিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয় জনিত যে মনুষ্য প্রতি একটা আসক্তি, তাহাও পদ্মাতে স্থির থাকিতে পারিত না; কারণ পদ্মা ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ ও সম্মান প্রভৃতির একটি উচ্চ আশা ছিল। এ সমুদয় জড়াইয়া, সেলিমের প্রতি তাঁহার আসক্তির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু মেহেরউন্নিসার প্রতি অনুরক্ত সেলিমের প্রতি, গর্ব্বিতা পদ্মার অনুরক্তি হইল না। প্রত্যুত ইহাতে সে সেলিমের প্রতি বিরক্তই হইল। পদ্মা নিজের সুখকে বড়ই ভাল বাসিত। এই স্বার্থপরায়ণতার জন্য তাহার আসক্তি কোন খানে জমাট বাঁধে নাই। এইরূপ আসক্তি শূন্য হৃদয়ই পৃথিবীর সকল প্রকার পাপের আধার। প্রকৃত ভালবাসা নিষ্কাম প্রবৃত্তি। সুখের বাসনা ইহাতে তিষ্ঠিতে পারে না, অভিমান ও স্বার্থ ইহাতে থাকিতে পারে না, ইহা এক প্রকার নিষ্কাম ধর্ম্মও বটে। সৎ প্রবৃত্তির এমন অধীনতা আর কিছুতেই দেখা যায় না, এত আত্মবিস্মৃতি, এত পরের চিন্তা আর কিছুতেই দেখা যায় না। ইহাতে সুখও অনন্ত। সুখ চাহিয়া কেহ ভালবাসে না, কিন্তু ভালবাসিলেই সুখ

হয়। পদ্মা সুখের লাগিয়া হাহাকার করিত, সুখ পাইবার জন্য কত বিধ উপায় অবলম্বন করিত, কত কল্পনা করিত, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের ভালবাসা জন্মে নাই, সে পর্য্যন্ত সে সুখ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

জীবনের মধ্যভাগে পদ্মার হৃদয়ে এ ভালবাসা অঙ্কুরিত হইল। সুখান্বেষণ করিয়া পদ্মা যখন দেখিতে পাইল যে, সুখটা খুঁজিলে পাওয়া বড় দুষ্কর, সে একপ্রকার সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিল। একটু একটু সেলিমের মহিষী পদ তখনও লোভনীয় হইল বটে, কিন্তু বিবিধ কারণে তাহা, দৈব ঘটনায়ই অন্তর্হিত হইতে ছিল। পদ্মার হৃদয়ে যখন এইরূপ সুখ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতে ছিল, তখন এক দিন পথ মধ্যে তাহার সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার রূপবান পুরুষ ও বটেন—বিশেষ পুরুষ জাতির সহিত রসালাপ করিতে ও পুরুষ হৃদয় জয় করিতে পদ্মাবতীর আশৈশবই উৎসাহ ছিল। পদ্মা তাই নবকুমারকে ধরিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। যখন সেই পরিচয় হইল, পদ্মার হৃদয়ের এক নূতন গতি হইল। বহুদিনের পরে সেই পতির সহিত সন্দর্শন—আবার পতি সপত্নী সহিত যুক্ত। অনেক দিন হইতেই অনাসক্তির দুঃখ বুঝিয়া পদ্মার অন্তঃকরণে আসক্তির একটা স্পৃহা জন্মিতে ছিল। কিন্তু পাত্র মিলিতেছিল না। যথেচ্ছা ইহা হওয়া অসম্ভব। যেখানে যথেচ্ছা ইহা হয়, সেখানে আমরা রূপের প্রভাব প্রভৃতি কতকগুলি কারণ দেখিতে পাই। আমরা যথেচ্ছা এইরূপ আসক্তির সঞ্চারে প্রায়ই প্রকৃত আসক্তি দেখিতে পাই না। এই জন্য একটা বন্ধন চাই। একটা প্রতিজ্ঞা চাই। বিবাহ এইরূপ একটি বন্ধন। ইহাতে ভালবাসা জন্মাইয়া থাকে। এবং বিবাহের পর যে ভালবাসা জন্মে, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। যাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অনুরাগ সঞ্চার হয় তাঁহাদিগেরও প্রকৃত অনুরাগ বিবাহের পরই হইয়া থাকে। পূর্ব্বের অনুরাগ মোহ, ভালবাসা নহে। পুনঃ পুনঃসম্ভোগ যখন সে মোহ অপসারিত হয়, তখন যে আসক্তি টুকু থাকে,- তাহাই প্রকৃত। হিন্দুরা ইহা খুব বুঝিতেন। তাই হিন্দুর বিবাহ প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র রকমের। যেরূপ মোহের কথা বলা হইল, তাহা প্রকৃত প্রণয়ের সহিত যুক্ত থাকিলে যে প্রণয়াদি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না কিন্তু সে টুকুর জন্য অনেক সময়ে আমাদিগকে বড় বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাই হিন্দুর অনুরাগ বিবাহের পরে। আগে প্রতিজ্ঞা, শেষে ভালবাসা। সত্ত্ব ভিন্ন কার্য্য হয় না। বিনা অভ্যাসে ভালবাসাকে স্থির ও স্থায়ী রাখিতে পারে? এ সকল কথা কিছু পদ্মা জ্ঞাতভাবে ভাবেন নাই; কিন্তু অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই এই সকল কথা মুহূর্ত্তমধ্যে জড় হইয়া একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্ম্মাণ করিল। সেই পদার্থের অংশ পদ্মা নবকুমারকে তাঁহার আসক্তির প্রকৃত পাত্র মনে করিলেন ও তৎপ্রতি আসক্ত হইলেন। ইহার সত্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতীর ন্যায় আমাদিগেরও

উত্তর 'ললাট লিখন।'

এই আসক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কতক-গুলি কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

"ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন [redacted] জানিতে পারে না—দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণ-কারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, [redacted] হস্ত পরিমাণ হইল। আর, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও [redacted] না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযো-গের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে—চাহি কি ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

"লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। [redacted] একদিন অকস্মাৎ প্রণয়-ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয় সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল [redacted] পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক [redacted] বলিয়া বোধ হইতে লাগিল বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্ত্তি প্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিকার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাব সিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্ত্তি অহরহ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার [redacted] স্পৃহা প্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসন লালসাও তাহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথ-[redacted] সম্ভূত অগ্নিরাশি বেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজা, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন। সেই প্রিয়জন নবকুমার।

"এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ রক্ষার কোন যত্ন পাইলেন না, এই জন্যই জন্মের মত বাদসাহের নিকট বিদায় লইলেন।

[redacted]থাটা এক্ষণ পরিষ্কার হইয়া পড়িল।

এই নবকুমারের প্রতি আসক্তি প্রাব-ল্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার পদ্মার সেই এক-টানা ভাব উপস্থিত হইল। এখন নব-কুমারকে পাইবার ইচ্ছাই তাহার [redacted] ইচ্ছা। ইহার সহিত অন্য কিছুর বিরোধ [redacted] না। নবকুমারের সহিত পুনঃ সাক্ষাতে এ দুর্জ্জয় স্রোতের ভাব আমরা নিরীক্ষণ করিলাম।

একদিন এক সজ্জিত কক্ষায় লুৎফ-উন্নিসা বসিয়া রহিয়াছেন। পৃথগাসনে নবকুমার উপবিষ্ট আছেন।—কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত করিয়া নবকুমার কহি-লেন 'তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।' লুৎফ-উন্নিসা

কহিলেন 'যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।' নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কি বলিবে?' লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, লুৎফ-উন্নিসা তাহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'কি বল না?' লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, 'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয় রঙ্গ, রহস্য, পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে সকল দিব কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসীর স্থান হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী।' নবকুমার কহিলেন 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না, লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন লুৎফ-উন্নিসা আবার তাহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন 'ভাল সে যাউক বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল [redacted] ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া দেখা দিও, কেবল চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব।'

অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যে পদ্মাবতী একদিন দিল্লীর সিংহাসন প্রার্থিনী হইয়া ছিল, সেই আজি নবকুমারের দাসী হইতে চলিল। যে এতদিন ইন্দ্রিয় সুখকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনে করিত, সে আজি কেবল নবকুমারকে দেখিবার জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে [redacted] হইল। প্রণয়ের এইরূপ আধিপত্য বটে। পদ্মাবতীর প্রণয়ের [redacted] স্রোতে অন্য সব ভাসিয়া গেল।

ইহাই পরে পদ্মাবতী যাহা করিল, এই মনোবৃত্তি লইয়াই। তাহার উল্লেখে প্রয়োজন নাই।

পদ্মাবতী আদিতে যেরূপ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিতে ছিল, এখনও সেইরূপ ভাসিতে লাগিল। তবে, পার্থক্য এত খানি যে, পূর্ব্বের প্রবৃত্তি পঙ্কিল ছিল, শেষের প্রবৃত্তি প্রায় নির্ম্মল। প্রকৃত প্রণয়ের অভাব ও সদ্ভাবেই এই পার্থক্য জন্মাইল। পদ্মাবতী কিন্তু আগা গোড়া একভাবে ঐক্য রহিল। পদ্মাবতীর [redacted] বাকুর [redacted] কীর্ত্তিচিহ্ন নহে।

শ্রীগিরীজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

নকুড় বাবুর উকীল জীবনের

প্রথম অধ্যায়।

বেলা ৫টা, অপরাহ্ন। একখানি ভাল জুড়ী গাড়ী বৈকণ্ঠপুরের জজআদালত হইতে বাহির হইল। আরোহী চাপকান-চোগা-শামলা-বিভূষিত তিন্‌টি বাবু; একটি প্রাচীন, ও অপর দুইটি নব্য যুবক। বলা বাহুল্য, তিনজনেই উকিল। ইঁহাদের সকলের অবস্থা আমরা জ্ঞাত নহি। উক্ত যুবকদ্বয়ের একটির বিষয় যাহা কিছু অবগত আছি তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইল।

ইঁহার নাম নকুড়েশ্বর মিত্র। নকুড় বাবুর বাল্য-জীবনে এমন কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই যাহা শুনিতে কাহারো আগ্রহ হইতে পারে। সে জন্য কেবল এইমাত্র বলিয়া রাখিলাম যে ইনি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া পিতৃব্যের অন্নে প্রতিপালিত হন ও তাঁহারই কৃপায় কলিকাতায় লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় পর বিবাহ হয়; ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই পুত্রমুখ দর্শন করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার পিতৃব্যের কাল হয়; ও সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপরেই পড়ে। খুল্লতাত নিঃসন্তান ছিলেন; পরিবারের মধ্যে নকুড় বাবুর মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও পিতৃব্যপত্নী। নকুড়েশ্বর নিরুপায় হইয়া দিবারাত্র চাকুরির চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন; ও অবশেষে এই বৈকণ্ঠপুর জেলা স্কুলে ৩০৲ টাকা বেতনে একটি মাষ্টারি জোগাড় করেন। শিক্ষকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এখনকার কলেজে তিন বৎসর আইন পাঠ করিয়া বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

বি, এল, পাশ করিয়া নকুড় বাবু মনস্থ করিলেন বৈকণ্ঠপুরেই ওকালতি করিবেন। ইহার কারণ—এখানকার অনেক উকীল তাঁহার পরিচিত, এবং অনেকে তাঁহাকে আশাও দিয়াছিলেন যে এখানে কিছু হইতে পারে। মাষ্টারি পরিত্যাগ করিয়া নকুড় বাবু উকীল হইয়া বসিলেন। তিন চারি বৎসরে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, আদালতে নাম লেখাইতে ও পোষাকাদি প্রস্তুত করিতে তাহার অধিকাংশই ব্যয় হইল। তাঁহার পরিবারের মধ্যে একণে দুইটি কন্যা বাড়িয়াছে। এতদিন তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়েই থাকিতেন; একটি ভাল বাটী ভাড়া করিয়া এখন তাঁহাকে বৈকণ্ঠপুরে আনা হইল। নকুড় বাবু শামলা মাথায় দিয়া আদালতে দেখা দিলেন।

১ম চিত্র।

(শয়নগৃহ—বেলা ৯টা, নকুড় বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর প্রবেশ।)

স্ত্রী। হ্যাঁগা তুমি ৯টা বাজতে না

বাজতে কাছারি গিয়ে কি কব। মক্কেলত সাড়ে বাইশ। এত সকাল সকাল না গিয়ে ছেলেটাকে যদি একটু পড়াও তাহলে কাজ হয়।

ন। তুমি কি বুঝ্‌বে। আমাকে এখন হেঁটে বিশ্বম্ভর বাবুর বাটী পর্য্যন্ত এতটা রাস্তা যেতে হবে; বেলা হলে যদি যাই মক্কেলরাও সেই সময় রাস্তায় যাওয়া আসা করে, তাহলেই দেখ্‌তে পাবে যে আমি হেঁটে যাচ্চি।

স্ত্রী। তা তুমি কাছারিতেই এই সময় যাওনা কেন? গাড়ির জন্য পরের খোসামোদ করবার দরকার কি। আর গাড়ী চড়বার জন্য বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ী যতদুর হেঁটে যাও ইদিকে কাছারি গেলে তার চেয়ে কমই হাঁট্‌তে হবে।

ন। ভেক না হলে কি ভিক্ষে হয়।

স্ত্রী। তুমি কি মনে কর যে মক্কেলরা ঐ ডাইকের বাড়ীর গাড়ী ও ওয়েলারের জুড়ি তোমার ভাবে?

ন। তা ভাব্‌বে কেন? তারা মনেকরে যে বিশ্বম্ভর বাবু আমাকে খাতির করে বাড়ী থেকে রোজ তুলে নিয়ে যান।

স্ত্রী। হা আমার কপাল! এই ভেকটুকু না কর্‌লেই নয়? আচ্ছা ঐ গাড়ীতে আর একজন কে থাকে?

ন। ভায়ারও চিঁড়ের ফলার। উনি আবার আমার চেয়ে এককাটি সরেশ। আমি ৯টার সময় যাই উনি ৮টা থেকেই বিশু বাবুর দ্বারে হত্যাদেন। বাবুর সরকারের ব্যামো হলে বাজারটা আসটাও কখন কখন কোরে থাকেন।

২য় চিত্র।

(বৈঠকখানা—নকুড় বাবু আসীন।)

ন। (স্বগতঃ) তাইত কি করি কিছুই ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্চিনি। প্রায় তিন মাস হোলো এতে কুড়িটি বই টাকা পাই নি। যখন মাষ্টারি কর্‌তুম তখন সকলে কত আশা দিলে; এখনত কেউ খোঁজ ও করে না। বড় উকিল বাবুদের কাছে গেলে এ কথা সে কথা বাজে কথাতেই কাজের কথা উড়িয়ে দেন। সে কথা পাড়তেই দেন না। কেউ কেউ আবার চোটে ওঠেন। ইদিকে যা পুঁজি ছিল তাত প্রায় শেষ হয়ে এল। এর চেয়ে মাষ্টারি যে ছিল ভাল। তাতে মাইনে অল্প হলে হয় কি। প্রাইভেট টুইসন ও ছিল। এখন ত তা করবার যো নাই। উকীল হইচি, মান্য বেড়েচে। এর ওপর আবার পরিবার গয়না গয়না করে খেপেচেন। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সদর আলার স্ত্রীর গায়ে কি গয়না দেখে এসেচেন সেই গয়না না হলেই নয়। রোজ হুকুম হয় সদর আলার বাড়ী গিয়ে নমুনর জন্য ঐ গয়না চেয়ে আন। সদর আলার কাছে কি করে গিয়ে একথা বলি? আমি কেমন উকিল তাঁর জান্‌তে ও বাকি নেই। এপর্য্যন্ত তাঁর কাছারিতে ত একবার দাঁড়ান হয় নি। তিনি হয়ত মনে করবেন এ গয়না নিয়ে পালায় বা। (ক্ষণেক চিন্তাকরিয়া) আচ্ছা এক কাজ করা যাক্। সব উকীলদের বাড়ী এক একবার যাই। দেখি তারা কিরকম করে মক্কেল হাত করে।

৩য় চিত্র।

১নং উকীলের বাড়ী—তিনি, তাঁহাব মক্কেল ও নকুড় বাবু আসীন।

মক্কেল। মশায়,মকৰ্দ্দমাটা কেমন বোঝেন? জেত্‌বার কিছু আশা আছে কি? যদি না থাকে তবে কেন এতটা টাকা মিথ্যা খরচ করি? হার্‌লে আবার ওদের খরচা সুদ্ধ ধরে দিতে হবে।

১ নং উ। (স্বগতঃ) আশা তোমার মাথামুণ্ড। (প্রকাশ্যে) জেতবার খুব আশা আছে। মকদ্দমা আদালতে ভাল উকিলের হাতে পড়লে কি রকম দাঁড়ায় তা কে বলতে পারে। আঁস্তাকুড় আজ কালকার কবিদের হাতে পড়লে সরোবর হয়ে দাঁড়ায়, জানেন ত। একবার বেয়ে চেয়ে দেখুন না কেন? আর যদি টাকা লোকসানের কথা বলেন, সে বিষয় আপনি ভেবে দেখুন হারলেও সেই এক প্রকার লোকসান হচ্ছে না? আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন; ইহ কালের কাজ যদি না হয়, ব্রাহ্মণকে দান করলে পরকালের ত হবে। (বলা বাহুল্য উকীল বাবু ব্রাহ্মণ)

ন। (সাশ্চর্য্যে) সে কি মশাই। সে দিন আপনি বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ী মুরগী খেতে খেতে বল্লেন যে আপনি জাতিভেদ মানেন না। এখন আবার ব্রাহ্মণ বলে দাঁও মারচেন?

(উকিল বাবু চটে লাল—নকুড় বাবুর এ বাটিতে সেই অবধি আসা বন্ধ।)

৪র্থ চিত্র।

২নং উকীলের বাটী—তিনি, তাঁহার মক্কেল ও নকুড়বাবু আসীন।

ম। আচ্ছা আমি যে ওকে চোর বলি আমার সাক্ষী ত কেউ নেই।

২ নং উ। ঐখানে আপনার আত্মীয় কেউ আছে?

ম। আজ্ঞা হাঁ আছে। কিন্তু সেত এ বিষয়ের কিছু জানে না।

২ নং উ। তা নাই জান্‌লে। তাকে আমার কাছে একবার আন্‌বেন। পিনাল কোডের ৬০০ ধারা মতে সে সাক্ষ্য দিতে পারে।

ন। সে কি মশায়, পিনাল কোডে যে ৬০০ ধারা নাই।

২নং উ। বটে? তবে ৩০০ ধারা হবে।

ন। ৩০০ ধারা যে খুন। আর সাক্ষ্য দেবার কথা ত সব এভিডেন্সেই আছে।

২নং উ। (বিরক্ত হইয়া) হতে পারে ও দুটো বই উলটে উলটে এমনি হ'যে গেছে, যে কোন সেক্সনটা কার, ঠিক করে উঠা যায় না।

ম। বেলা হোলো, মশায় এখন তবে আসি।

(প্রস্থান।)

২নং উ। আচ্ছা আসুন। নকুড় ভায়া তুমি এখনও ব্যাবসা বুঝলে না। ওদের কাছে কি কিছু জানি না বল্‌তে আছে। যদি হাজার মূর্খ হও তবুও ওদের কাছে সবজান্তা হয়ে দাঁড়াবে।

ন। (অপ্রস্তুত হইয়া) আজ্ঞে হাঁ।

ওটা আমার ভুল হয়ে ছিল, কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, ও ব সাক্ষী যে কিছু জানে না আপনি তাকে কি রকম করে সাক্ষী দেওয়াইবেন ?

২নং উ। তবেই তুমি ওকালাতি করেচ। এটা আর বুঝলে না? সাক্ষী যদিও কিছু না দেখে থাকে আমার কাছে দুই একদিন যাওয়া আসা করলে দিব্য চক্ষু পাবে, তথন সব দেখে ফেলবে।

(নকুড় বাবু অবাক্—তখনও 'কাবলাইল' 'এমারসন', 'মিল' প্রভৃতি তাঁহার উদরে গরম।)

৫ম চিত্র

মুনসেফের কাছারি।

মুন্‌সেফ বাবু, আমলাগণ, নকুড় বাবু ও আর আর উকীল ও মক্কেলগণ উপস্থিত।

ন। (বক্তৃতা করিতে করিতে ও ডান হাত টেবিল চাপড়াইতে চাপড়াইতে বাম হাত পশ্চাতে স্বীয় মক্কেলের প্রতি প্রসারণ করিয়া) কই আমার ফি ?

ম। আজ্ঞে আপনার বলা হয়ে যাক্ পরে দিব।

ন। না এথনি দাও তোমাদের বিশ্বাস নাই। কাজ হয়ে গেলেই তুমি পালাবে। এই রকম করে আমি অনেক বার ঠকিচি।

ম। (কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিয়া) মশাই আমার কাছে এখন কিছু নেই।

ন। মিথ্যা কথা। দেখি ব্যাটা তোর ট্যাঁক দেখি (তথায় কিছু নাই দেখিয়া) তা তুই যেখানে থেকে পারিস এনে দে, তা না হলে এথনি তোর বিপক্ষে বলতে আরম্ভ করব।

ম। (বেগতিক বুঝিয়া কাছা হইতে আট আনা বাহির করিয়া) এই নিন।

ন। (রাগত ভাবে) কি আট আনা? পয়সা আমি নেবো? দে ব্যাটা টাকা দে নইলে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

ম। (উক্ত স্থান হইতে বাকি আট আনা বাহির করিয়া) এই এক টাকা হোলো।

ন। ও থানে রাখিস কেন ?

ম। আজ্ঞে আপনাদের ভয়ে।

ন। (হাস্য করত) পয়সা কেন ? টাকা এনে দে।

ম। মশাই আমি গরিব মানুষ আবার আধ পয়সা বাঁটা যাবে।

ন। তবে পয়সা এনিছিলি কেন ?

ম। মনে করে ছিলাম আট আনায় রক্ষা হবে।

ন। ব্যাটা আট আনায় বি, এ, বি, এল, উকীল রাখতে চাস ? আচ্ছা, তোকে দয়া করা গেল; কিন্তু পয়সা আমি ছোঁব না। আমার পকেটে আস্তে আস্তে ফেলে দে।

ম। (তথা করণ ও স্বগতঃ) উঃ বড্ড দয়া, গরিবের গলায় ছুরি দিয়ে তার পর দয়া! আজ কাল বি, এ, বি, এল, কি আট আনার এম, এ, বি, এল, অনেক মেলে।

৬ষ্ঠ চিত্র।

(শয়ন গৃহ—নকুড় বাবুর স্ত্রী আসীন পত্র হস্তে হাসিতে হাসিতে নকুড় বাবুর প্রবেশ।)

স্ত্রী। চিঠি পড়ে এত হাসি কেন ?

ন। সবাইয়েরই কপাল দেখছি আমার

মতন।

স্ত্রী। ও কার চিঠি?

ন। আমার এক উকীল বন্ধুর।

স্ত্রী। তিনি কোথায় আছেন?

ন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন গোবিন্দপুরে গিয়ে ঠেকেচেন।

স্ত্রী। কি লিখ্চেন?

ন। লিখ্চেন যে অন্য অন্য জায়গায় দিনান্তে অন্ন জুট্তোনা, এখানে গড়ে রোজ একবেলা পোসাচ্ছে।

স্ত্রী। গড়ে একবেলা কি রকম?

ন। অর্থাৎ কোন দিন দু বেলা, কোন দিন মোটেই নয়। (উভয়ে হাস্য) সে কথা যাক্, কি বল্তে এলুম, ভুলে গেলুম—হ্যাঁ আমার সে পেন্টুলুনটা সারা হয়েচে। হাঁটুর ওপরে যা ছেঁড়া আছে তা মেরামতের দরকার নেই, চাপকানে ঢাকা থাকবে।

স্ত্রী। তোমার চাপকানের ত কিছু নেই বল্লেই হয়—হাত নেই, পিঠ নেই। ঐ রকম আজ কাল চলন হোয়েচে না কি? কৈ আমার বাপের বাড়ীতে ত অমন চাপকান কারুর দেখিনি।

ন। ও সব তোমরা বুঝবে কি? একে বলে উকীলি বুদ্ধি। হাত পিঠ ত চোগায় ঢাকা থাকবে, সে সব ত কেউ দেখ্তে পাবে না। তবে কেন মিছি মিছি অতটা কাপড় নষ্ট করা?

স্ত্রী। তবে তোমার যে মোজা সারতে দিয়েছ, তার ওপরে যে ছেঁড়াগুলো আছে তাই সারলেই হবে? যে খানটা জুতোর ভেতর থাকে সেখানটা সারবার দরকার নেই?

ন। হ্যাঁ তা হইলেই হবে। জুতোর ভেতর যদি একবারে কিছুই না থাকে তা হলেও ক্ষতি নাই।

স্ত্রী। বলিহারি উকীল বুদ্ধি। আচ্ছা চাদর নিবারিণী সভাও উকীল বুদ্ধির সৃষ্টি নাকি?

ন। সৃষ্টি কিনা ঠিক আমি বলতে পারিনি; কিন্তু এ জানি যে অনেক উকীল ঐ সভার মেম্বর। এখনকারও দু'চার জন আমার মতন উকীল ঐ সভায় আশ্রয় নিয়েচেন। মধ্যে সভায় এত উকীল ঢুকে ছিল যে সভার মেম্বরেরা ভয় পেয়ে উকীলদের জন্য এক নূতন নিয়ম জারি করে। সেই জন্য উকীলদের ঐ সভার আশ্রয় নেওয়া একটু কম পড়েচে।

স্ত্রী। কি নিয়ম বার করেছিল?

ন। নিয়ম এই যে উকীল মেম্বরদের চাদরের বদলে পার্শিকোর্ট পর্তে হবে।

স্ত্রী। তাতে কম পড়লো কেন?

ন। সে যে ঘরে ঘরে হাঁটু জল। উকীলরা যে চাদর-নিবারিণী সভার মেম্বর হন, কেবল রুধির অভাবে বৈ ত না। পার্শিকোটে যে একেবারে দম্কা খরচ। রুধিরের স্রোত বইবে যে।

স্ত্রী। (হাস্য) খুব জব্দ ত।

[illegible]ম চিত্র।

(বৈঠকখানা—নকুড় বাবু আসীন, তাঁহার এক উকীল বন্ধুর প্রবেশ।)

ন। কি হে এস; আজকাল যে আর দেখাই পাওয়া যায় না?

উ। না ভাই কদিন আসতে পারিনি একটা কাজে বড় ব্যস্ত আছি।

ন। ভারি Case পেয়েছ নাকি?

উ। তাহলে আর ভাবনা কি? তা নয়, কিন্তু রোজগারের উপায় বটে।

ন। কি খুলেই বল না।

উ। সবজজের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা যাচ্চে।

ন। তাতে কি পাবে?

উ। তাঁর কোর্টের কমিশন গুলো।

ন। বটে? কি রকম বন্দোবস্ত?

উ। দেখ, এ কথা বড় গুপ্ত, যেন প্রকাশ না হয়। বন্দোবস্ত এই যে আমি সদর আলার ছেলে মেয়েদের পড়াব আর তিনি তাঁর সব কমিশন আমাকে দেবেন।

ন। ছেলে মেয়ে কটি?

উ। তা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গুটি দশ বার।

ন। পড়াতে হবে কি দুবেলা না এক বেলা?

উ। পড়াই না পড়াই দুবেলা হাজির থাকতে হবে।

ন। আরম্ভ করেচ নাকি?

উ। হ্যাঁ এই দিন দশ হোলো যাচ্ছি।

ন। এর মধ্যে দুই একটা কমিশন পেয়েচ?

উ। সে দুঃখের কথা বল কেন! সদর আলা বলেন যে দুমাস আমার পড়ান দেখে কমিশন দেবেন।

ন। তোমরা দেখচি শালের পাগড়ীর মান্ত আর রাখলে না।

উ। Necessity has no law. পেটের জ্বালা বড় না মান্ত বড় ভাই? আর একটা কথা বলি শোন। শুধু যদি পড়িয়ে নিস্তার হতো তাহলে ত বাঁচতুম। আবার সে দিন সদর আলার শালা বাবু শ্বশুর বাড়ী গেলেন, সদর আলা আমাকে বল্লেন তার হয়ে আপিসে কাজ করে এস। কি করি না বল্‌বার যো নাই। তাই সে দিন কাছারি যেতে পারি নি। সকলকে বল্লুম পেটের অসুখ করেছিল তাই আসিনি।

ন। হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চ হাস্য) আরও কত দুর্দ্দশা উকীলের কপালে আছে কে বলিতে পারে। এসব দেখে শুনে লোকে উকীল হতে চায়! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা সে কথা যাগ্‌গে। কাল বার লাইব্রেরীতে আমাদের চেয়ে দুচার বছরের সিনিয়ার বাবুদের খাতা দেখলুম, কেউ তিন শ, কেউ চার শর নীচে পান না। আমাদেরই কেবল দুর্দ্দশা—অন্ন যোটে না।

উ। তুমি তাঁদের খাতা কি দেখতে চেয়ে ছেলে, না তাঁরা আপনারা দেখালেন।

ন। আমি দেখতে চাইব কেন, তাঁরা আপনারাই দেখালেন।

উ। (হাস্য) তুমি এখনও ওকালতির কায়দা টা শেখ নি। নিশ্চয় জেন যাঁরা যেচে খাতা দেখান তাঁদের খাতা বাজার দর বুঝে লেখা।

ন। বাজার দর কি?

উ। বাজার দর জানো না? লোকে পরের টাকা খুব বেশী দেখে, তাত জানো—বিশেষতঃ উকীলদের; কারণ তাদের টাকার হিসাব নেই। সেই জন্য তুমি দেখবে উকীলেরা যথার্থ যা পায় বাজার গুজব

ঠিক তার ডবল। আর যারা খাতা দেখিয়ে বেড়ায় তারা সেই হিসাবে লেখে; অর্থাৎ যথার্থ যা পায় খাতায় ঠিক তার ডবল লেখে।

ন। বটে? আচ্ছা আমাদেরও ঐ রকম খাতা কল্লে হয় ত।

উ। খাতা যেন কল্লে, দেখাবে কাকে দাদা? যাঁরা চার বছর আগে বেরিয়েছেন তাঁদের খাতা দেখ্বার লোক—ছাই ফেল্তে ভাঙা কুলো—আমরা। আমাদের খাতা দেখ্বে কে? মোক্তারদেরও আমরা আগে নমস্কার করি। আদালতের চাপরাশিরা পর্য্যন্ত আমাদের পোছে না। তা যাহোক বড় বড় উকীল বাবুরা কিছু বলেন শুন্তে ইচ্ছা করে, আর শুন্লে উপকারও হয়। কিন্তু এই, নেন্কু সিনিয়ার দের advice gratis Patronising tone সহ্য হয় না।

ন। জানইত ভাই দুর্ব্বল পেলে সকলেই পীড়ন করে। সয়ে থাক, কি করবে বল।

উ। বেশী দিন আর সয়ে থাক্তে হবে না। Darwinএর Struggle for Existence theory, যদি সত্য হয়, তবে আমাদের শীগ্গিরই মরতে হবে। তাতে কেবল Survival of the fittest বৈত নয়।

ন। তুমিই বা fittest হবে না কেন?

উ। রোজ পাঁচ ঘন্টা বার লাইব্রেরীর চেয়ার গরম কল্লেই কি fittest হওয়া যায়?

ন। ভাল কথা মনে করে দিয়েচ। বার লাইব্রেরীর চাঁদাটা কাল দিতে হবে। পেটে না খেয়েও সেটা না দিলেই নয়। ঐটে আছে বলেই আমাদের একটু দাঁড়াবার স্থান আছে।

উ। আমরা যেন ভাই বার লাইব্রেরীর গোলাম চোর। গোলাম চোর খেলায়, যেমন এক এক খান বাইরের তাস টেনে হাতের তাসের সঙ্গে জোড় মিলিয়ে ফেলে দেওয়া যায়, সেই রকম বড় বড় উকীলগুলো লাইব্রেরীতে বসে বাইরের এক একটা মক্কেল আকর্ষণ করে আর জোড় মিলে কাছারির দিকে চলে যায়। আমাদের আর জোড় যোটে না; সমস্তদিন লাইব্রেরীতে চোরের মতন বসে আছি।

ন। ঠিক বলেছ দাদা।

উ। উঠি ভাই এখন বেলা হয়ে গেল, আবার সদরআলার বাড়ী যেতে হবে। (প্রস্থান)।

ন। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা আমি কেন তবে একটা প্রাইভেট টুইসন জোগাড় করি না। সদর আলার ছেলে পড়ান আর অপরের ছেলে পড়ান একই কথা। সকলে যদি করতে পারে তবে আমারই বা কি এমন বেশী মান যে আমি পারবো না। তা এটা করতে হবে খুব গোপনে; রাত্তিরে ঘন্টা দুইয়ের জন্য ঠিক করা যাক্।

জননীর প্রবেশ।

মা। চাল বাড়ন্ত হয়ে এল; কাল আর বোধ হয় হবে না।

ন। দোকান থেকে আন্তে পাঠাওনি কেন?

মা। মুদি আর ধারে দিতে চায় না। বলে তার অনেক টাকা পাওনা হয়েচে। বাবু এক পয়সাও দেন না।

ন। বাবু না পেলে কোত্থেকে দেবে?

এখন ত আমার হাতে কিছুই নেই।

মা। তবে কি করা যায়?

ন। ওকালতী ছাড়তে হোলো দেখ্‌চি এ রকম করে আর ক দিন যাবে।

মা। তা তুমি আগে যেমন সকাল বিকেল ছেলে পড়াতে সেই রকম পড়াও না কেন?

ন। কাজেই। কিন্তু একথা গোল করো না। আর আমি মনে কচ্চি ছেলেদের মামার বাড়ী রেখে আসি। ধার ধোরগুলো শোধ দিয়ে আবার নিয়ে আস্‌ব। আর এখানে ওদেরও কষ্ট হচ্চে।

মা। তা যা ভাল বোঝ তাই কর।

এইরূপে নকুড় বাবুর উকীল জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। কয়েক দিবস পরে স্ত্রী পুত্র দিগকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিলেন ও রাত্রিতে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ঋণ গুলি ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে লাগিলেন।

হবু উকীল।

সমালোচনা।

'প্রেম ও ফুল' বিভা প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের ইহার অধিক সমালোচনা করা ভাল দেখায় না। তবে তাঁহার মধ্যবিত্ত ধরনের একটী কবিতা পাঠকগণের জন্য উদ্ধৃত করিলাম। পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন গোবিন্দবাবু কি দরের লেখক। গোবিন্দবাবুর লেখা আমাদের বড় ভাল লাগে।

প্রেম ও ফুল—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত—

মূল্য ৷৹ আনা।

মা-মরা মেয়ে।

মা-মরা দুখিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণায়।
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, এ ঘরে ও ঘরে যেয়ে.
খোজে নিতি পাতি পাতি জননী তাহার!
শুধায় আসিয়া কাছে, "বাবাগো মা কোথা আছে?"
পারিনা উত্তর দিতে শিশু বালিকার!
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যারে দেখে তারে যেয়ে,
মা ব'লে আঁচল ধরে টানে অনিবার,
কিন্তু চেয়ে মুখপানে, ফিরে সে নিরাশ প্রাণে,
সে দৃশ্য দেখিতে বিশ্ব দেখি অন্ধকার।
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, কোলে উঠে চেয়ে চেয়ে,
কিন্তু কে লইবে কোলে কে আছে তাহার!
কিছুতে নাহিক ভোলে, উঠিবে মায়ের কোলে'
পারিনা কোলের মেয়ে কোলে নিতে আর।
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, চুমা খায় চেয়ে চেয়ে,
একাকী চুমিতে আজ বহে অশ্রুধার!
এই না দু'দিন আগে, দু'জনে কত সোহাগে,
একত্রে খেয়েছি চুমা কপোলে তাহার!
মা মরা দুখিনী মেয়ে, থাকে শুধু পথ চেয়ে,
যে পথে চলিয়া গেছে জননী তাহার!
আসিতে চাহেনা ঘরে, কাঁদিয়া পাগল করে,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার!
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, বিছানায় শু'তে যেয়ে,
মায়ের লাগিয়া স্থান পাশে রাখে তার,
নিশীথে ঘুমের ঘোরে, মা বলিয়া গলা ধরে,
কে জানে মা-মরা মেয়ে এত যন্ত্রণার!
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যদিও দেখিত চেয়ে,
হৃদয়ে উছলে উঠে শোক পারাবার,
তবু জীবনের আশা, একমাত্র ভালবাসা,
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার!
মণিরে গিয়েছে রেখে, হাসিব কাঁদিব দেখে,
সান্ত্বনা মণিই তার স্নেহ মমতার!
মণিরে রাখিয়া বুকে, মণিরে দেখিয়া সুখে
অন্তিমে যাইব চলি নিকটে তাহার।
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার!

বিভা।

[৯ম সংখ্যা   সন ১২৯৪ সাল   ১ম খণ্ড]

লক্ষ্ণৌ ও ইহার ভগ্নাবশেষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে নসিরুদ্দীন হায়দর গতাসু হন। নবাবের বিবাহিতা পত্নীর কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার পিতৃব্য নসিউদ্দৌলা অযোধ্যার শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। পুত্রাদি অবর্ত্তমানেও প্রধানা বেগম রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। মুনাজান নামে নবাবের জনৈক জারজ পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; এবং নসিউদ্দৌলাই অবশেষে মহম্মদ আলিশা উপাধি গ্রহণ করত লক্ষৌয়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সহিত এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি পত্রের কিয়দংশের মর্ম এই যে, "নবাবের রাজ্যে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা অযোধ্যা সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া পরে উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" ইহাই পরে রাজ্যলোলুপ ডালহৌসীর চক্ষুশূল হইয়াছিল, ও ইহাই অবাধে অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত গবর্ণর জেনারেল হতভাগ্য ওয়াজিদআলিকে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

মহম্মদ আলি সা হোসেনাবাদের নির্ম্মাতা। এই পল্লী রুমি দরোজার কিয়দ্দূর পশ্চিমে। এখানকার অট্টালিকা ও আপণাদি সকলই মহম্মদ আলি সার নির্ম্মিত। ইমাম বাড়াই ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখনও এই স্থান নগর মধ্যে যাবনিক উৎসবের অদ্বিতীয় রঙ্গভূমি। হোসেনাবাদ অদ্যাপি মহরমের রজনীতে অসংখ্য সুন্দর দীপ মালায় সজ্জিত হইয়া থাকে। ইমামবাড়ার উচ্চ তোরণাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দুই পার্শ্বে ধাতু গঠিত

মানবমূর্ত্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়। দ্বারের শিখর দেশ হইতে লম্বমান সুদীর্ঘশৃঙ্খল আকর্ষণ করিয়া উহারা দণ্ডায়মান আছে। সুবিস্তৃত অঙ্গন ফল ফুলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ। দুই পার্শ্বে দুইটি মস্‌জিদ। একটি ইষ্টক ও চূর্ণে নির্ম্মিত তাজমহলের সুন্দর প্রতিকৃতি; অপরটি তাহারই 'জবাব'। এরূপ সুন্দর গঠিত যে, এখনও দূর হইতে শ্বেত মর্ম্মর বলিয়া ভ্রম হয়। মস্‌জিদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রস্তর নির্ম্মিত উৎস ও ক্ষুদ্র কৃত্রিমজলাশয়। শেষোক্তটির উপর মনোরম লৌহ সেতু। প্রশস্ত সোপান শ্রেণী অবলম্বনে ইমামবাড়ায় প্রবেশ করিতে হয়। অট্টালিকা যদিও আসাফুদ্দৌলার ইমামবাড়া অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্রতর তথাপি কারু কার্য্যে বা গৃহসজ্জায় উহা অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। অনেকগুলি বৃহৎ ঝাড়ও অপরাপর মূল্যবান গৃহালঙ্কার এখনও দেখা যায়। গৃহ তল শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে মহম্মদ আলি সা ও তাঁহার মাতার কবর।

ইমামবাড়া হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথের বাম পার্শ্বে যে বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয় তাহা এই নবাবের আদেশেই খাত। চারিদিকে গভীর জলগর্ভ পর্য্যন্ত সোপানাবলী গঠিত আছে। মধ্যে মধ্যে অবরোধ বাসিনীদিগের অবগাহনের নিমিত্ত জলাভ্যন্তরে আবৃত পথ। পুষ্করিণীর নিকটেই এক বৃহৎ মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ ও 'সাতখণ্ডা।' জুমা অপেক্ষা উচ্চতর মস্‌জিদ স্থাপন করিবার মানসে মহম্মদ আলি ইহার নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই নবাবের মৃত্যু হয়। অধুনা ভগ্নাবশেষ তদবস্থই আছে। 'সাত খণ্ডা' অর্থাৎ সপ্ততল কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণেও মহম্মদ আলি সা পূর্ণ মনস্কাম হইতে পারেন নাই। শিখর দেশ হইতে স্বকীয় কীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করাই ইহার নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য। 'সাত খণ্ডা' চারিতলের অধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় নাই।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে স্বপুত্র আমজদ আলি সার উপর রাজ্য শাসনভার অর্পণ করিয়া মহম্মদ আলি পরলোক গমন করেন। ছয় বৎসর রাজত্বকাল মধ্যে কেবল ইঁহার নিজেরই কবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্ণৌয়ে ছোট ইমামবাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমজদ আলির কবর এক্ষণে গির্জ্জা রূপে পরিণত হইয়াছে।

কুক্ষণে আমজদ আলির মধ্যম পুত্র ওয়াজিদ আলি সা অযোধ্যার রাজছত্র তলে উপবেশন করিলেন। কুক্ষণে যবনের হতভাগ্য ক্রমে ডালহৌসির হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পিত হইল। তৎকালে এতদ্দেশে যবন-গৌরব প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। আকবর সাহ মুরশিদ কুলি খাঁ ও টিপু সুলতানের বংশধর গণ একে একে ইংরাজের বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা দুই একটি রাজ্য ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে কেবল অযোধ্যা প্রদেশেই উড্ডীয়মান হইতেছিল। তখনও লক্ষ্ণৌ ভারতবর্ষীয় যবনদিগের আদরের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইত। তখনও ছত্রমঞ্জিলের সুবর্ণ ছত্রের জ্যোতি সূর্য্য কিরণে গোমতীর জলে প্রতিফলিত হইত।

তখনও মচ্ছি ভবন দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিশ করকবলিত হইয়াও নবাবের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না। এই সকল রাজ্যভুক্ ডালহৌসির গোচর হইলে তিনি অযোধ্যা হরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহম্মদ আলির সহিত লর্ড অকল্যাণ্ডের সন্ধি অগ্রাহ্য হইল। তদানীন্তন রেসিডেন্ট কর্ণেল স্লিমানের ন্যায় সঙ্গত বাক্যে গভর্ণর জেনারেল কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে মেজর আউট্রাম লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইয়া ওয়াজিদ আলি সার পদচ্যুতি বিষয়ক ব্রিটিশের ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অযোধ্যার শেষ যবন রাজা ইংরাজের বেতন ভোগী হইয়া কলিকাতার সন্নিহিত মুচিখোলায় নজর বন্দী ছিলেন। কয়েক মাস গত হইল মৃত্যু তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে। কি কি কারণে ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষগণ ডালহৌসির অহিতাচরণ অনুমোদন করিলেন বা পরে ইহার কি বিষময় ফল ফলিল, এ সকল বর্ণন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সিপাহী যুদ্ধের বিস্তারিত ইতিহাস পাঠ করিলে পাঠক এ সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

ওয়াজিদ আলি সা লক্ষ্ণৌ হইতে বহুকাল বহিষ্কৃত হইয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি ঐ নগরে এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। 'কেসর বাগ' এখনও ভারতের দর্শনীয় বস্তু, যবনের গৌরবের স্থল। এখনও কেশর বাগের নামে লক্ষ্ণৌবাসীদিগের ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবল বেগে বহিতে থাকে। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে কেসর বাগের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় ও উহা দুই বৎসর পরে সম্পূর্ণ হয়। গৃহ সজ্জা শিল্প কার্য্যাদি সমেত ইহাতে অশীতি লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। 'কেসর বাগ' নামে দুই ভাষার দুইটি শব্দ মিলিত হইয়াছে। 'ক্যায়সর অর্থাৎ 'বাদশাহ' অর্ম্মণ ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং পারসী শব্দ 'বাগ' অর্থে উদ্যান। অযোধ্যার নরপতিগণ কায়সর উপাধি ধারণ করিতেন, তাঁহাদের রাজকীয় মোহরেও এই শব্দ ব্যবহৃত হইত।

উত্তর পূর্ব্ব তোরণ পথে কেসর বাগে প্রবেশ করিলে 'জিলোখানা' নামে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে দলবদ্ধ নবাব সমারোহ সহকারে নগর দর্শনে যাত্রা করিতেন। ইহার দক্ষিণ ভাগে 'চিনি বাগ।' সম্মুখে হরিদ্বর্ণ পরী অঙ্কিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া হজরত বাগে প্রবেশ করিতে হয়। এই দ্বারের উপর উজীরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার, দক্ষিণ পার্শ্বে চাঁদিওয়ালি বারদোয়ারি 'খাস মোকাম' ও 'বাদসা মঞ্জিল।' প্রথমোক্তটির হর্ম্ম্যতল রৌপ্যে আবৃত থাকিত।

শেষোক্ত দুইটীতে ওয়াজিদ আলি সা কিছুকাল বাস করিয়া ছিলেন। বাদসা মঞ্জিল সাদত আলির নির্ম্মিত, পরে ইহা কেশরবাগের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। হজরত বাগের বামদিকে বৃহৎ অট্টালিকা গুলির নাম চৌলক্কি অর্থাৎ চারিলক্ষ মুদ্রায় ক্রীত। ইহা নবাবের ক্ষৌরকার আজিমুল্লা খাঁ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত মূল্যে নবাবসরকারে বিক্রয় করিয়াছিল। চৌলক্কি

ওয়াজিদআলির প্রধানা বেগমের মহল। এই স্থানেই বিদ্রোহী বেগম ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত থাকিতেন; ইহারি একটি নিম্নতল কক্ষে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বন্দীদশায় ছিলেন। এই বাটীর সন্নিকটেই মর্ম্মরাবৃত-তল এক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহা-মেলার সময় ওয়াজিদআলিসা ফকির বেশে এই স্থানে উপবেশন করিতেন। কয়েকপদ অগ্রসর হইলেই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত প্রকৃত কেশরবাগ প্রাঙ্গণের বৃহৎ সিংহদ্বার। নির্ম্মাণে লক্ষমুদ্রা ব্যয় হওয়ায় ইহার নাম "লাখি দরোজা" হইয়াছে। প্রাঙ্গণের ভিতর মনোহর দৃশ্য। এরূপ রমণীয় স্থান অসংখ্য সৌধমালা সজ্জিত লক্ষ্ণৌ নগরে অতি বিরল। সমগ্র ভূমিখণ্ড মনোরম উদ্যানে পরিবৃত। চতুর্দ্দিকে সুন্দর পীত-বর্ণ সমশির সৌধরাজি প্রাচীরাকারে দণ্ডায়-মান আছে। এই হর্ম্ম্যশ্রেণীই ওয়াজিদ-আলির অসংখ্য বেগমদিগের অন্তঃপুর ছিল। অধুনা প্রায় সকল অট্টালিকাগুলিই অযোধ্যার জমিদারদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে নানারূপ কারুকার্য্য খচিত উপবন বাটীকা এখনও দৃষ্ট হয়। কোথাও বা রমণীয় সেতুসংলগ্ন যবনের রামলীলাস্থল "লঙ্কা" নামক দুইটী অট্টালিকা। সেতুটি সেতুবন্ধ রামে-শ্বর নামে খ্যাতছিল। উহার নীচে কয়েক পংক্তি সোপানের উপর শ্বেতপ্রস্তরের সুন্দর আসন। কোথাও বা রাসবিহারাদি কৃষ্ণ-লীলার্থ শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত বৃহৎ বারদোয়ারি অর্থাৎ দালান। কোথাওবা উক্ত প্রস্তর গঠিত ক্ষুদ্র সরোবর ও তদুপরে ক্ষুদ্র সেতু। গল্প আছে, ইহা ওয়াজিদ আলিসা ও তাঁহার রমণীগণের জলকেলির নিমিত্ত গোলাপজলে পূর্ণ হইত। বারদোয়ারি গুলির মধ্যে দুইটি প্রধান; একটি শ্বেত ও অপরটি লোহিত। পূর্ব্বোক্তটি অধি-কাংশ প্রস্তরে গঠিত; শেষোক্তটিতে অনেক কাঠের কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণলীলার রঙ্গভূমি শ্বেত বারদোয়ারির কথা উপরে লিখিত হইয়াছে। শত সহস্র গোপিনীগণে পরিবৃত হইয়া নবাব এই স্থলে যশোদানন্দনরূপে অবতীর্ণ হইতেন। এই বাটী এক্ষণে অযোধ্যার জমিদার রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ক্রয় করিয়াছেন ও তাঁহারই চিত্রে ইহা সজ্জিত আছে। লাল বারদো-য়ারি অধুনা গভর্ণমেণ্টের মিউজিয়ম বা যাদুঘর। ইহাতে লক্ষ্ণৌয়ের কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পদ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মৃণ্ময় সামগ্রীই অধিক। ফল পুষ্প ইত্যাদির গঠন প্রণালী এমনই চমৎকার যে স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের কৃত্রিমত্ব সহজে অনুভূত হয় না। পুরাতন রেসিডেন্সির এক সুন্দর মৃণ্ময় প্রকৃতি যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। অট্টালিকার দ্বারদেশে পৌরাণিক অশ্বমেধ যজ্ঞের এক পাষাণময় অশ্বমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে।

সাদত আলির কবর সমীপস্থ কেশর-বাগের অট্টালিকাগুলি ভূমিসাৎ করিয়া তৎস্থানে ক্যানিংকলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সমীপবর্ত্তী প্রাসাদরাজির সহিত মিলনার্থ ইহার বহির্ভাগ যবনপ্রথায় গঠিত। অভ্য-ন্তরের কক্ষগুলি সুন্দর ও সুপ্রশস্ত।

কেশরবাগের পূর্ব্বদিকে যেরূপ লাখি দরোজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে পশ্চিম দিকেও ঠিক ঐরূপ একটি তোরণ আছে। এই দ্বার দিয়া বহির্গত হইলে বামদিকে কেশর পসন্দ প্রাসাদ প্রাপ্তহওয়া যায়। নবাব নসিরুদ্দীন হায়দরের উজীর রসুন উদ্দৌলা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত। এই প্রাসাদ প্রায় বারহদ বক্সের স্থায় উচ্চ। ঊর্দ্ধে বৃহৎ গম্বুজ ও তদুপরে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধাতু-নির্ম্মিত চূড়া। ওয়াজিদ আলি ইহাকে কেশরবাগ ভুক্ত করিয়া মাসুক উল্ সুলতান নাম্নী প্রণয়িনীর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। শের দরোজা; কটক এস্থান হইতে কয়েক পদ ব্যবধান। এই দ্বারদেশে জেনারেল নীল বিদ্রোহীদিগের গোলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থই ইহা এখনও রক্ষিত হইয়াছে।

কেসববাগ ব্যতীত ওয়াজিদ আলিসা সেকেন্দর মহল নাম্নী বেগমের নিমিত্ত সেকেন্দর বার্গ উদ্যান স্থাপন করেন। পূর্ব্বে ইহা উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ও সুন্দর দ্বার সংলগ্নছিল। সার কোলিন ক্যাম্বেল নগর উদ্ধারার্থ আগমন করিলে পর দুই সহস্র বিদ্রোহী ইহার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে যুদ্ধে উহারা সকলেই হত হইয়াছিল। উক্ত দ্বিসহস্রের সমাধি-স্থান এই উদ্যান এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

এতদ্ভিন্ন লক্ষ্ণৌ নগরে আলমবাগ ও "বাদশাবাগ" নামে দুইটি প্রসিদ্ধ উপবন গৃহ আছে। প্রথমটি সহর হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ অন্তরে কানপুরের পথে স্থাপিত। উদ্যান বহুদূর বিস্তৃত এবং দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। মধ্যে দ্বিতল গৃহ। নগর উদ্ধারার্থ আসিয়া সেনাপতি হ্যাভেলক ও আউট্রাম এখানে কিছুদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সার হেনরি হ্যাভেলক এইস্থানেই উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বীরত্বকাহিনী-সম্বলিত সুন্দর কবরস্তম্ভ সুচারুরূপে রক্ষিত হইয়াছে। "বাদশাবাগ" গোমতীর অপর পারে। এই উদ্যানে নানাদেশীয় ফল ফুলের বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। মধ্যে দ্বিতল প্রস্তর নির্ম্মিত বারদোয়ারি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে।

নগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকারও শেষ হইল। অসংখ্য প্রাসাদরাজির মধ্যে প্রধান কয়েকটিই কেবল বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াজিদ আলিসার পদচ্যুতির পর তথায় নূতন যবন-কীর্ত্তিস্তম্ভের চিহ্নমাত্রও স্থাপিত হয় নাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে সিপাহী সমরের ঝঞ্ঝাবাতে ঐ নগর কিরূপ অপূরণীয় ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছিল—কিরূপে শতবৎসরের অগণ্য ধনরাশির, অসীম সহিষ্ণুতার ও অমানুষিক বিলাস প্রিয়তার পরিচয় স্থল স্তূপরাশি নিমেষ মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সিপাহীযুদ্ধের পরেও অনেকগুলি অট্টালিকা আধুনিক রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের আদেশে ভূতল শায়ী হইয়াছে ও হইতেছে। ঘড়ি-স্তম্ভ, ক্যানিং কলেজ এবং উইন্‌ফিল্ড পার্ক ইত্যাদি কয়েকটি নূতন গঠিত ও হইয়াছে। হোসেনাবাদের পুষ্করিণীতীরে স্থাপিত ঘড়ি-

স্তম্ভটি ছত্রমঞ্জিলের চূড়া অপেক্ষাও উচ্চ। ক্যানিংকলেজের বিষয় উর্দ্ধে লিখিত হইয়াছে। উইন্‌ফিল্ড পার্ক অতি রমণীয় উদ্যান—ইংরাজদিগের বৈকালিক বায়ু-সেবন স্থান। ইহা হজরৎ গঞ্জ হইতে প্রায় লামার্টিনিয়র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূতপূর্ব্ব চীফ কমিশনর উইন্‌ফিল্ড সাহেবের স্মরণার্থ এই উদ্যান স্থাপিত হইয়াছে। শ্বেত মর্ম্মরের বারদোয়ারি ও প্রতিমূর্ত্তি সমূহ কেশরবাগ ভ্রষ্ট হইয়া এখানে আনীত হইয়াছে।

সময় ও অদৃষ্টের সহিত দ্বন্দ্বপরম্পরায় বিপর্য্যস্ত হইয়াও লক্ষ্ণৌ যে অবস্থায় বর্ত্তমান তাহা দেখিলেই পর্য্যটকের গমনশ্রম সফল হইবে সন্দেহ নাই। আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান অট্টালিকা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। যিনি বারাণসীর [illegible] দেবালয় শ্রেণী সন্দর্শন করিয়াছেন তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন লক্ষ্ণৌ কিরূপ অসংখ্য মিনার ধাতুময় কলস ও গম্বুজে শোভমান। লক্ষ্ণৌয়ের পথ সমূহের ন্যায় সুগঠিত ও সুপ্রশস্ত পথ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আর কোথাও প্রায় দৃষ্ট হয় না। বৃহৎ রাজপথ গুলির অধিকাংশ নগরের নিম্নভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে গঠিত। সেই জন্য প্রায় সকল পল্লীরই সঙ্কীর্ণ-পথে গমন করিতে হইলে নীচে অবতরণ করিতে হয়।

লক্ষ্ণৌ এখনও বহুসংখ্যক ধনাঢ্যের আবাস। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। প্রতি পল্লীতে দশবার জন ‘নবাব’ পদবীধারী লোক পাওয়া যায়। ইহাঁরা সকলেই ভূতপূর্ব্ব নবাবদিগের জ্ঞাতি-কুটুম্ব বংশীয়। গভর্ণমেণ্ট সকলেরই বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ বৃত্তি-বিতরণের জন্য নগরে এক বৃহৎ কার্য্যালয় আছে। কোন২ কোন ‘নবাব’ দিগের আয় নিকৃষ্ট কেরাণী দিগের বেতন অপেক্ষাও ন্যূন, কিন্তু তথাপি ইহাঁদিগকে ‘নবাব’ বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়। লক্ষ্ণৌবাসীগণ অতীব মধুর-ভাষী। ইহাদিগের সম্মান সহকারে অভিবাদন প্রথা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকা যায় না। কি ভদ্র, কি নীচ, সকলের মুখেই শুদ্ধ ভাষা। এমন কি মৎস্যওয়ালীগণও মৌলবির ন্যায় বিশুদ্ধ পারসী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। প্রবাদ আছে নাগরিকগণ ঐরূপ ভাষায় বাক্যালাপ করিতে না পারিলে ওয়াজিদ আলিসার আজ্ঞায় নগর হইতে বহিষ্কৃত হইত। লক্ষ্ণৌ এতদ্দেশের সঙ্গীত চর্চ্চার এক প্রধান স্থান। লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। সঙ্গীত প্রিয় নবাব ওয়াজিদ আলি এবিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি পারসী ভাষায় অনেকগুলি সুললিত কবিতাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। শুনাযায় এখানকার কোন কোন বারবনিতাও কবিতা রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শিনী। লক্ষ্ণৌবাসীগণ সচরাচর অতিশয় বিলাসপ্রিয় ও ভোগাভিলাষী। ধনীদিগের কথা দূরে থাকুক, যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্গতি নাই তাহাদেরও ভোগস্পৃহা নিতান্ত বলবতী। পরিবারবর্গ হয়ত অন্নাভাবে অনশনে রহিয়াছে কিন্তু তাহারা সন্ধ্যাকালে কেহবা রজকের, কেহবা পুরাতন বসনাদি

বিক্রেতার দোকান হইতে বেশভূষা করিবা বেশ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। যাহার তাম্রমুদ্রা মাত্র সম্বল সেও তাহা তাম্বুল ও আতরে ব্যয় করিবা থাকে। এমন কি মলবাহীগণের গাত্রেও সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ। তাহাদের ও বেশভূষার পারিপাট্য দেখিলে চৎকৃত হইয়া যাইতে হয়। ভিক্ষাজীবীদিগের অবস্থাও ঐরূপ। বিদেশীয় পথিক হঠাৎ স্থির করিতে পারিবেন না যে ভিক্ষুক তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছে বা কোন ভদ্র মৌলবি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষারও অত্যন্ত যাঁকজমক। বেহারের রমনীদিগের ন্যায় ইহারা শাড়ী ব্যবহার করেনা। ভিখারিনী পর্য্যন্ত 'লঙ্গা' বা এতদ্দেশীয় ঘাগরা পরিধান করিয়া থাকে।

লক্ষ্ণৌবাসীদিগের সকল দোষ সত্বেও ইহারা এক অতি মহদ্গুণে জনসমাজের প্রিয়। ইহাদের ন্যায় স্বদেশানুরাগী এতদ্দেশে অতি বিরল। বৃদ্ধনাগরিকগণ লক্ষ্ণৌয়ের পূর্ব্বগৌরব বর্ণন করিতে করিতে [illegible] অশ্রুপাত করিয়া থাকে। অনেক শ্বেতশ্মশ্রু যবন রাজস্থানের চরণদিগের ন্যায় দ্বারে দ্বারে প্রাচীন গাথা গাহিয়া বেড়ায়। নগরের ইতিবৃত্ত সামান্য গাড়োয়ান দিগের পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ। তাহারাও ওয়াজিদ আলিসার উপর অসন্তুষ্ট, কারণ তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে অমূল্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা প্রদেশ স্বভাবত সমভূমি—বিস্তৃত—উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিপূর্ণ—নানাবিধ ফল ও অপর্য্যাপ্ত শস্যের আগার। এজন্য নগরে খাদ্য দ্রব্য সকলই প্রায় স্বল্পমূল্য। দেশের উর্ব্বরতা বশতই অযোধ্যার রাজগণ প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যয়ও যেরূপ অলৌকিক আয়ও তদনুরূপ অলৌকিক ছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। গোমতী নদীতে জল অধিক নাই। ইহার পরিসরও অতি অল্প। নগরবাসীগণ সকলেই প্রায় কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাও সচরাচর স্বাদু প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট।

সমাপ্ত।

শ্রীরাজচন্দ্র গোস্বামী।

কবিতা।

(বিশ্বেশ্বর স্তোত্র।)

(শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।)

কৈলাস শিখর, শোভার আকর,
নানাজাতি তরু সাজে,
তুঙ্গ গিরিবর, অপ্সরা অপ্সর,
কিন্নর কিন্নরী রাজে।

মনোহর কূট, তুষার মুকুট,
গগণে [illegible]শে শির,
তা[illegible]লিত, রজত নিন্দিত,
[illegible] পুরুষ ধীর।

পরমাত্ম ধ্যান, পরব্রহ্মজ্ঞান
গভীর সমাধি মগ্ন।
হৃদয় সুস্থির, রমে যোগবীর,
আপনে আপনি মগ্ন।
বিদ্যুত বরণী, উমা সুবদনী,
করযোড়ে করে স্তব,
না মেলি নয়ন, না হেরে কেমন,
নিজ ভাবে ভোর ভব।
গণ ষড়ানন, করিছে ভ্রমণ,
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ,
অটল অচল, সমাধি বিহ্বল,
নাহি কিছু পরমাদ।
নন্দী ভৃঙ্গীশ্বর, ভক্তিভরে রয়,
[illegible] প্রমথ গণে,
নাহি তাহা বোধ, প্রগাঢ় নিরোধ,
আছে আত্ম আলাপনে।
তরু শাখা'পরে, বিহগ বিহরে,
মধুর সমীর স্বর,
কলবিহ্ন পিক, গাইছে নির্ভীক,
মুখরিত গিরিবর।
কে রাখে সংবাদ, সে সকল সাধ,
রাখুক আসক্ত জনে,

মোহমুক্ত মন, মহা যোগী জন,
পিয়ে মকরন্দ মনে।
তপঃ সমাচ্ছন্ন, ধেয়ান অনন্য,
প্রভু চিদানন্দ মোর,
স্তিমিত নয়নে, বসি পদ্মাসনে
আছেন আত্মায় ভোর।
হে [illegible] শঙ্কর, ভবরোগ হর,
অপরাধ কর ক্ষয়
ভব পারাবারে, দুখ কব কারে;
গণিতে অগণ্য হয়।
ভবভার লয়ে, আছ ধীর হয়ে,
পরম পুরুষ তুমি,
বিশ্ববিষ রাশি, কণ্ঠে রাখ হাসি,
নিবাস শ্মশান ভূমি।
ওহে যোগীশ্বর, পরমাত্মপর,
[illegible] পরমার্থ-ধ্যান,
মোরা ধর্ম্মে দীন, সাধন বিহীন,
দেহ কিছুমাত্র জ্ঞান।
[illegible] যাই পার, এ ঘোর সংসার
নিদারুণ কারাগার;
লইলে শরণ, মহৎ যে জন,
নাহি তারে পরিহারি।

("ভুলনা এ মুখ আবরণ।")

(শ্রীযুক্তনারায়ণ [illegible] ঘোষ।)

'ভুলনা এ মুখ আবরণ।'
ভারত হৃদয় ধ্বনি, নি[illegible]নী মুখে শুনি,
জাগি যেন প্রতিধ্বনি [illegible] রোদন।
গোমুখীর নীরধার, ভারত [illegible]র,
ধীরে ধীরে সিন্ধুনীরে মিলিছে যখন;
বলিছে বারীশে আর, লহ দুঃখ সমাচার,
ডুবাও [illegible] আসি জলধি-জীবন।

রজনীর অন্ধকারে, দূর অতীতের দ্বারে,
ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি করিছে রোদন।
ঝান্সি-রাণী দুর্গাবতী, সাবিত্রী সংযুক্তা সতী,
তাঁদের ভগিনী গর্ভে দাসের জনন!
যেই স্তনদুগ্ধ বলে, যেত ধরা রসাতলে,
আজি সেই স্তনদুগ্ধে দাসের জীবন!
আহা যে রমণীগণ, রণসাজে অনুক্ষণ,
সাজাইত সুত স্বামী বীরত্ব ভূষণ;
আজি সে ললনা কুল, গাঁথে মালা তুলে ফুল
সকলি হয়েছে ভুল নিশার স্বপন!
'ভুলনা এ মুখ আবরণ'

বহু রত্নে বিভূষিত নত মুখ আবরিত
ম্রিয়মাণ আর্য্য ভাষা করিছে রোদন।
ভারত মায়ের সনে, মিশাইয়া দিনে দিনে,
থাকিব বিস্মৃতি জলে হইয়া মগন।
শাস্ত্র শিরশোভা যার, কালিদাস অলঙ্কার,
বেদ যার হৃদয়ের কৌস্তুভ ভূষণ।
আজি সে ধরণী মাঝে, কাঁদে কাঙ্গালিনী সাজে,
কি দেখিবে বল তার কি আছে এখন।
'বনলতা', হেমলতা, শকুন্তলা, মহাশ্বেতা,
বিদায় দে জননীরে ফুরায় জীবন!

নারী।

(শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ।)

১

ভুবন ভুলাও নারি মোহিনী মায়ায়
স্বর্গের সৌন্দর্য্য রাশি,
তোমাতে বিরাজে আসি,
অমৃত বিলাও তুমি পতিত ধরায়।

২

তোমারি হৃদয় নারি কাব্য রসময়!
যে সুধা সন্তানে দাও,
যে গীত নিশ্বাসে গাও,
কত যে মধুরতর দুঃখের সময়।

৩

দুঃখীর জীবন তুমি হতাশের আশ!
তুমি জগতের প্রাণ,
তুমি শক্তি, তুমি ধ্যান,
প্রকৃতির মুখে তুমি করুণার হাস।

৪

পুণ্যের আশ্রমে তুমি চন্দ্রিকার জ্যোতি।
পবিত্রতা মুখে ধরি,
ধর্ম্ম রাজ্যে অধীশ্বরী;
সপ্তর্ষি মণ্ডলে তুমি শান্তি অরুন্ধতী।

৫

তুমি স্বর্গ, স্বর্গে সদা তোমার নিবাস!
অলকার আলো তুমি,
সাধ্বী রূপে শচী তুমি,
তুমি গো মমতা মায়া প্রেমের বিকাশ।

৬

স্নেহময়ী মাতা তুমি রোগীর শিয়রে।
দরিদ্র ভগিনী [illegible],
সহোদর [illegible],
ভাস তুমি [illegible]নি, দুখের সাগরে।

৭

প্রেমের প্রতিমা তুমি পতির সকাশে।
তুমিই প্রেমের কায়া,
তব নাম মহামায়া,
সোহাগ তোমারি ছায়া ভালবাসা পাশে।

৮

শত দোষে দোষী পতি ঘৃণিত ভুবনে।
তুমি প্রাণসখি তার;
ধরায় কে আছে আর,
তুমি তার সে তোমার জীবন মরণে।

৯

স্বর্গেতে গেছেন পতি ত্যজিয়া ভুবন।
প্রণয় অমৃত দিয়া,
পতি প্রাণ বাঁচাইয়া,
পূজ সে সাবিত্রী তুমি পতির চরণ।

১০

দরিদ্রের আহা তুমি অমূল্য রতন।
তব স্নেহে করি স্নান,
সহি দুঃখ অপমান,
ভুলে যাই সংসারের যাতনা ভীষণ

প্রতাপ।

(শ্রীকাল।)

"The rank is but the guinea stamp
The man is gold for a' that."

হারাইয়ে পূর্ণিমার নিশি,
হাসি হাসি যায় চলে শশী।
হাসিতে জনম তার হাসিই সুন্দর।
মরি! সে রূপের মহিমায়
চিহ্ন পড়ি; বল দেখি কার,
চারুরূপে সমুজ্জল না করে অন্তর!
[illegible] কি প্রতাপ! [illegible] কেন ভালবাসে
মানবে; জানকি কেন তার
বদন হেরিতে, এ সংসার
শূন্য পানে চেয়ে থাকে পূর্ণিমার আশে।
ধরাতল কোন [illegible]র চূড়ায়;
যেথায় তাহার পা[illegible];
তোমার নামের গন্ধ নাই।
তাইত মানবে এত ভালবাসে তায়
তাইত সে কলঙ্কটি তার,
লাজ ভরা মুখের তাহার,
মানবের চখে এত সুন্দর দেখায়।
জানত প্রতাপ! নীল গগনের কোলে,
এদিক ওদিক ঘুরি ফিরি,—
ছোট ছোট মেঘগুলি খেলি লুকোচুরী,
পড়ে সে চাঁদের গায় চলে।
দেখেছ [illegible] সে রূপের ছাঁদে
জগতের অন্য ছিরি,
পাছু রাখি, আসি ধিরি,
নয়ন আপনি পড়ে কাঁদে।
মহত্তের সামান্যের [illegible] মিলন

এ জগতে কত শোভা পায়।
দেখাইতে মানবের শিক্ষার কারণ,
সহসা জলদে লুকায়।
কচিছেলে-মুখের মতন,
রবির সোনার সেই হাসি;
প্রভাতে ছড়ায়ে রূপরাশি,
যখন মাতায় ত্রিভুবন।
তখন সকলে হেরি আগ্রহের সনে।
কতবার করি দরশন।
তবু সাধ মিটে না কেমন
অভাব কতই থাকে মনে।
ধরার দক্ষিণ চক্ষু প্রকৃতির প্রাণ,
জীবনের প্রধান সম্বল;
এমন প্রাণের রবি লভি উচ্চ স্থান,
প্রতাপে নয়নে আনে জল।
নিজের নিজত্ব ভুলি, লভি উচ্চ স্থান,
যেবা লয় আশ্রয় তোমায়;
মুহূর্ত্তেই হয়ে যায় বিকৃত-বয়ান
রূপ ধরে কল্পনার বায়।
মানব নামটি ভাল মানব সুন্দর
কতরূপ বাঁধা আছে তায়
অন্ত শোভা হতে তার কতই সুন্দর
স্বর্গ হারে তার তুলনায়।
একতা ভাঙিয়ে কিন্তু এ হেন রতন
যদি হয় অংশে পরিণত
মুহূর্ত্তেই হীরকের অংশের মতন
দাম তার কমে যায় কত!

শত নাগিনীর পাকে।

(শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল।)

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙে যাক্, এ মোর শরীর;
এ রুদ্ধ দেহ-পিঞ্জরে পরাণ-অধীর
খুঁজিতেছে ভাঙা-পথ, পাখা কাপটিয়া।
ঘুরিছে উন্মাদ মত, এধারে—ওধারে,
বার বার চারিধার করি আক্রমণ।
রুধিরে আপ্লুত দেহ, নিশ্বাস সঘন,
উঠিতেছে পড়িতেছে করুণ চিৎকারে।
দাও, দাও, ভেঙে দাও, এ দেহ পিঞ্জর,
দেখুক বাসন্তী শোভা এ বদ্ধ-কোকিল।
সবাই পেতেছে স্নেহ, পেতেছে আদর,
রবি, শশী, তারা, মেঘ, সমীর, অখিল।
এ একা আড়ালে পড়ি, বাঁচিবে কি করে?
সে জানে এ বাঁচা, তার ওইরূপ তরে।

দুদিকে ফিরাল মুখ।

(শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল।)

দুদিকে ফিরাল মুখ—নীরবে দুজন,
জন্ম মত একবার চেয়ে পরস্পরে।
পড়িল একটি শ্বাস, [illegible] নয়ন,
পড়ে বুঝি [illegible] বাধা,—তার-কাণ্ড ধরে।

এ চির পুষ্পিত কুঞ্জ রহিল পড়িয়া,
সুদীর্ঘ জীবন-পথে যাবে একা—একা।
কত দূর যাবে আর, ক'দিন ধরিয়া,
প্রতি পলে এ পথের ক্রোশ-চিহ্ন লেখা।

মিছে থর থর কর, মিলিবে না করে,
মিছে থর থর বুক, মিলিবে না বুকে।
এল গেল দুটি তরি আসিয়া সম্মুখে,
এল গেল দুটি তারা মুহূর্ত্ত ভিতরে।
শত বসন্তের গান, মুহূর্ত্তেকে শেষ,
শত বরষার স্বপ্ন হারাল উদ্দেশ।

বন-লতিকা।

(শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বি, এ।)

কাহার মহিমা লতে প্রকাশ নিভৃতে ?
নতশিরা ম্রিয়মাণা,
বায়ু ভরে কম্পমানা,
সলজ্জ মধুর ভাব, কে দিল তোমাতে ?
কাহার মহিমা লতে, প্রকাশ নিভৃতে ?

২

কানন শোভিনী তুমি বন-লতিকে !
কি বলে সম্ভাষি তোমা;
সুহাসিনী মনোরমা,
কি বোলে সোহাগ আমি করি তোমাকে ?
কানন শোভিনী তুমি বন-লতিকে !

৩

মৃদুল পবন তোমা নাচায় উল্লাসে ;
সোহাগের ছটা দেখে,
অন্তরে বিমল সুখে,
পুলকিত, প্রফুরিত, সুখ-সরে ভাসে,
মৃদুল পবন তোমা নাচায় উল্লাসে !

৪

কার ধ্যানে আছ মগ্ন বল মোরে শোভনে ?
প্রেম মাখা মুখ খানি,
মধুর স্নেহের খনি,
সচঞ্চল বায়ু ভরে, লাজ-নম্র আননে,
কার ধ্যানে আছ মগ্ন বল মোরে শোভনে ?

৫

অনুপম তুমি দেবি বন সোহাগিনি।
স্রষ্টার কৌশল চয়,
তোমাতে প্রকাশ পায়,
কি দিয়া গঠিলা বিভু কেমনে তা জানিনি।
অনুপম তুমি দেবি বন সোহাগিনি।

৬

অসীম সংসার মাঝে ধন্যা তোমা গণি।
কৃতজ্ঞতা পরকাশ,
তোমাতেই সুপ্রকাশ,
তা না হলে নত শিরে কেন রহ ধনি ?
অসীম সংসার মাঝে ধন্যা তোমা গণি !

৭

মানব কৃতঘ্ন জাতি লতিকার তুলনায়,
এই শিক্ষা মনে মনে,
শিখিলাম সযতনে,
স্রষ্টার বিপুল দয়া মদ-গর্ব্বে ভুলি যায়,
মানব কৃতঘ্ন জাতি লতিকার তুলনায় !

গান।

বসন্ত মিশ্রিত।

(শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।)

এই ফুটে এই মিশে, ওই ডুবে ওই ভাসে,
ওই ছোট ছোট ঢেউ, কত ভাবে খেলা করে।
দেখিতে দেখিতে হায়, সোনা পানা চারু কায়।
উলটি পালটি খেয়ে ভাইল সলিল পরে।
ছি! তোর লাজ নাই, লাজ খেয়ে কহি তাই,
নব নব রূপ ধরে, পুনঃ কেন ভাস ভাই?
যাহার এ বল নাই, আপনার ঘরে রাখি,
সে কেন এ দল বেঁধে করে এত মাখামাখি?
একা এস একা যাও চিরদিন একা রও,
রেখোনা অগাধ জলে কারেও গলায় ধরে।

মরণ।

(শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।)

মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ন লোর।
কি দিবস কিবা রাত্তি,
তারে চাহি গাহি গীতি,
স্বপনেতে কত নিশি তারই কোলে মাথা রাখি,
কহিতে কহিতে ব্যথা যেন গো মুদেছি আঁখি।
বসিয়া সিন্ধুর তীরে,
নিত্য সে ডাকিছে মোরে,
তিল তিল ধীরে ধীরে কাছে মোর আসিতেছে,
মোর মুখ তাঁর বুকে সতত জাগিয়া আছে।
নিত্য তার বাঁশি শুনি,
গৃহে রই উদাসিনী,
আকুলা দিবস গণি, সদা তারই কথা কই।
তার মত ভাল মোরে তোরা কে বাসিস্ সই?

বঙ্গে ডেনিস্ উপনিবেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দিনেমারদিগের অভ্যুদয়কালে শ্রীরামপুরে রাজস্ব আবকারী এবং বাজার ট্যাক্সে চারি সহস্র, ষ্ট্যাম্প হইতে তিন সহস্র, এবং জরীমাণা প্রভৃতি হইতে এক সহস্র মুদ্রা

বাৎসরিক আদায় হইত। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লবণের ও অহিফেনের হিসাবে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রতি বৎসর দিনেমারেরা প্রাপ্ত হইতেন। প্রথমে শ্রীরামপুরবাসীরা স্ব স্ব পাট্টাভুক্ত জমী বা ইমারতের খাজানা রাজ সরকারে অর্পণ করিত। ইহা ব্যতীত ব্যবসায়ীদিগকে লবণ, তৈল, ঘৃত, চাউল ও দাউল প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের প্রতি টাকায় দুই এক পয়সা হারে উক্ত রাজ সরকারে প্রদান করিতে হইত। পরে ঐ নিয়ম রহিত করিয়া এক দফায় চাউল, দাউল, লবণ, বাজার ও পাট্টাভুক্ত জমী বা ইমারতের খাজনার একটি প্রধান ডাক হইত, তাহাতে আনুমানিক আট সহস্র মুদ্রা ডেনিস কোম্পানি প্রাপ্ত হইতেন, এবং অপর একটী ডাকে পান, তামাকু, চিঁড়াটিক, মুড়ি প্রভৃতি দ্রব্যাদি বাৎসরিক সমোস্ত টাকায় ইজারা বন্দোবস্ত হইত। ইজারদারগণ যাবতীয় দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে একরূপ দেশের রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ শুল্ক আদায় করিতেন। ইতর লোকদিগের বিবাহোপলক্ষে এক টাকা হিসাবে লওয়া হইত। এই সমস্ত বিষয় ইজারদারের হাতে থাকিত। ডাকে যে টাকা দেওয়া ধার্য্য হইত, তাঁহারা সেই টাকা দিনেমার গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়া তদবশিষ্ট তাঁহাদের লাভ হইত। শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের বাণিজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইলে পর তাহাদিগের ষাট জন পেয়াদা (*Peon*) বা সিপাহী থাকিত; তৎপরে ঐ সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পঁয়তাল্লিশ জনে দাঁড়ায়। তাহাদিগের প্রায় দেড় শত কিম্বা দুই শত বন্দুক এবং কুড়ি পঁচিশটী কামানও ছিল। সেই সকল কামান প্রত্যেক বৎসর ১লা জানুয়ারী দিবসের উৎসবোপলক্ষে ছাড়া হইত। দিনেমারদিগের প্রথমাবস্থায় শ্রীরামপুরে বিচারের অতি ঘৃণিত পদ্ধতি ছিল। বিচার পতিগণ উৎকোচগ্রাহী ছিলেন। তৎকালে মোকর্দ্দমা হইলে বাদী ও প্রতিবাদীদিগকে আবেদন করিতেও হইত না এবং সাক্ষ্য প্রদান করিতেও হইত না; বিচার কর্ত্তাদিগের স্বেচ্ছাচারিতায় বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইত। ঐ সময়ে ষ্ট্যাম্প কাগজেরও ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিচার পতিকে অভিযোগের বষয় বাচনিক জ্ঞাত করাইলে তিনি উভয় পক্ষকে আহ্বান করাইয়া কথায় কথায় বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। তৎকালিক বিচার সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে কোন সময়ে গোস্বামীদিগের সহিত অন্য কোন ব্যক্তির বিবাদ হওয়াতে উক্ত ব্যক্তি উপঢৌকনসহ বিচার পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া গোস্বামী দিগের বিপক্ষে অভিযোগ করিলেন (ঐ সময়ে তাহার প্রাঙ্গে লাল শাল ছিল)। বিচার পতি উপঢৌকন অথবা, সাদা কথায় বলিতে হইলে, উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "মিস্তে তুমি ঘরে যেতে কর," (১) গোস্বামী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অধিক পরিমাণে উপঢৌকন বা উৎকোচ প্রদান করিলেন; উহা প্রাপ্ত হইয়া জজ সাহেব কহিলেন "ডর নেই বাবা তোর ডিক্রী নাকে ঝুলিতেছে"। পর

(১) "মিস্তে" সম্ভবতঃ ডেনিস্ ভাষার মিষ্টার কিম্বা মিষ্টারের অপভ্রংশ হইবে।

দিবস বাদী সানন্দে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদী শুভ্র শাল এবং প্রতিবাদী গোস্বামী লাল শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছেন, এবং ইহা ব্যতীত গোস্বামী মহাশয় অধিক পরিমাণে প্রণামীও দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া মস্তক [illegible] করিয়া এই নিষ্পত্তি করিলেন "লাল শালের ডিক্রী," তাহাতে এই মোকর্দ্দমার বাদী (যাঁহার গাত্রে শুভ্র শাল ছিল এবং যিনি, পূর্ব্বে লাল শাল গাত্রে দিয়া বিচার পতির বাটীতে গিয়াছিলেন) বিস্মিত হইয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন [illegible] এরূপ অন্যায় কেন হইল? তাহাতে সাহেব বলিলেন যে, "বাবা আমি কি করিতে পারি, তুমি পূর্ব্ব দিবসে রাঙ্গা শাল গাত্রে দিয়া আসিয়াছিলে সেই হেতু যাহার গাত্রে লাল শাল দেখিলাম তাহাকেই বাদী [illegible] করিয়া লাল শালের ডিক্রী দিয়াছি। এখন হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না, তা আমি কি করিব, তুমি নিজ দোষেই হারিলে।" শ্রীরামপুরস্থ জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে ঐ লাল শালের মোকর্দ্দমাটি সত্য বটে, কিন্তু উহা গোস্বামীদিগের সঙ্গে নহে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটার সঙ্গে গোস্বামীদিগের সংস্রব না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে কোন মোকর্দ্দমায় পরাজিত [illegible] না ইহা বলিলে অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। যে হেতু তাঁহারা শ্রীরামপুরের কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের প্রতিকূলে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না; কারণ হরিনারায়ণ এবং রামনারায়ণ গোস্বামীদিগের সহায়তায় ডেনিস কোম্পানী উক্ত নগরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা নগর পত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণ থাকিলেও গোস্বামিগণ কখন কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করিতেন না।

বঙ্গাব্দ ১২৩০ সালের পর দিনেমার উপনিবেশে [illegible] আইন প্রস্তুত হইয়া বিধি অনুসারে শৃঙ্খলাপ্রণালীতে বিচার হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে বিচারক দিগের স্বেচ্ছাচারিতা এবং উৎকোচ গ্রহণ প্রায় একরূপ রুদ্ধ হইল। কোন মোকর্দ্দমায় কেহ প্রাণান্তে সাক্ষ্য প্রদানে সম্মত হইত না; কারণ বিচারকগণ আসামী অপেক্ষা সাক্ষ্যের প্রতি বিশেষ [illegible] রাখিতেন এবং উহার জবানবন্দি মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ হইলে উহাকে দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডাজ্ঞা দিতেন। এই হেতু সে সময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে কেহ সাহস করিত না। খুনী আসামী হইলে তাহার ফাঁসী অথবা কোন প্রকারে [illegible] দণ্ডাজ্ঞা হইত না, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত। এই নিয়মটী যে অত্যন্ত মনুষ্যত্ব ও দয়ামূলক ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে সভ্যতায় প্রকৃতার্থে দিনেমারগণ ইংরেজ অপেক্ষা এক পদ অগ্রসর হইয়াছিল। অন্যান্য বন্দী দিগকে দিবারাত্র কারাগারে রুদ্ধ রাখিবার নিয়ম ছিল না। দিবসে উহাদিগের দ্বারা নগরের পথ সকল [illegible] এবং পরিষ্কৃত হইত, এবং রাত্রি কালে উহাদিগকে কারাগারের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইত। উহা-

দিগের পায়ে লৌহ শৃঙ্খল থাকিত এবং একজন শান্তিরক্ষক উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তস্করদিগকে বেত্রাঘাত করিবারও ব্যবস্থা ছিল।

দিনেমারদিগের শাসনকালে শ্রীরামপুরে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক এতদ্দেশীয় ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কলিকাতাস্থ ধনী ও ইংরেজ বণিক সমিতির প্রদত্ত রাজ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ উক্ত নগরে কিছু কিছু ভূমি ক্রয় করিলেন, অদ্যাবধিও কাহার কাহার ঐ ভূমি আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে উপরোক্ত কারণ বশতঃ অনেকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে অনেক খুনী বদমায়েস এবং দেউলিয়াগণ কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া দিনেমারদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং উহাতেই শ্রীরামপুরের-প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কোন লেখক (৮) বলেন যে "এই প্রবাদটি সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক, কারণ তৎকালে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নিয়মানুসারে মানী লোকের মান রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইতেন, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কালাতিপাত করিতে হইত, সুতরাং সেই সমস্ত লোক আপন আপন মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য উপায় না থাকা প্রযুক্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া রক্ষা পাইতেন। কলিকাতায় ইন্‌সলবেন্ট কোর্ট স্থাপিত হইলে পর ঐ সকল ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা দস্যু অথবা নষ্ট লোক হইতেন তাহাহইলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেন। নিঃস্ব ঋণপ্রযুক্ত মান রক্ষা করিবার জন্য শ্রীরামপুরে আশ্রয় লওয়াতে যদ্যপি শ্রীরামপুর দুষ্ট লোকদিগের দ্বারা স্থাপিত বলা যায়, তাহাহইলে সিরাজ উদ্দৌলার ত্রাসে কৃষ্ণদাস প্রভৃতির কলিকাতায় আশ্রয় লওয়াতে কলিকাতাকেও দুষ্ট লোকের আশ্রয় স্থান বলা যাইতে পারে?" এ বিষয়ে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে এই প্রবাদের মূলে কিছু সত্য না থাকিলে এইরূপ রটিত না। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ব্যক্তিব নিকট আমরা শ্রুত হইয়াছি যে প্রবাদটী সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং তিনি বলেন যে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের এখনও শ্রীরামপুরে বসতি রহিয়াছে, তাহা তিনি বিশেষ রূপে অবগত আছেন; কিন্তু উহাদিগের নাম উল্লেখ করিলে অনেকের অন্তরে ব্যথা লাগিবার সম্ভাবনা বলিয়া উহা হইতে তিনি বিরত থাকিলেন। ইহা ব্যতীত অনেক ইংরেজ লেখকও (৯) এই প্রবাদের সত্যতা বিষয়ে পোষকতা করিয়াছেন।

(৮) Vide the steam Engine and the East Indian Railway by Kali dass Moittra of Srerampore.

(৯) Vide Railway guide by Sanders Cones তাহাতে তিনি বলেন ;—"Srerampore formerly the house of refuge for Insolvent debtors and rogues".

শ্রীরামপুরে হলেন বর্গ সাহেব বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়া মোহন প্রসাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর কলিকাতা হইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। তৎকালাবধি শ্রীরামপুরের বিচারপতিগণ এবম্প্রকার সূক্ষ্ম বিচার, করিতেন যে তাহার তুলনায় কলিকাতায় ইঙ্গরাজ কোম্পানির তৎকালিক বিচার বিচার বলিয়াই জ্ঞান হইত না। হলেনবর্গ সাহেবের সময় হইতে কোন দোষী ব্যক্তি অন্য স্থান হইতে পলায়ন করিয়া মুক্তি পাইবার আশয়ে শ্রীরামপুরে গমন করিলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত না। যদি কদাচ কেহ উক্ত স্থানে আসিত, তাহা হইলে তথ তৎকালিক দিনেমার দিগের উপনিবেশিক বিধি অনুসারে ডেনিস বিচারপতিরা কৃপা করিয়া তাহার বিচার আপনারা করিবেন, নতুবা ইচ্ছা করিলে যে ব্যক্তি যে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আসিত তাহাকে ধৃত করিয়া সেই স্থানে প্রেরণ করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার সমূহের নিষ্পত্তির জন্য তৎকালে উক্ত স্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইত। তাঁহারা তিন চার জন একত্রে বসিয়া বিচার করিতেন। ফলে উক্ত ভদ্র ব্যক্তিগণ কতকটা ইদানীন্তন বঙ্গদেশ গবর্ণমেন্টের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ছিলেন। মাতাল ধৃত হইলে মত্তাবস্থা পর্য্যন্ত তাহার পদদ্বয় হাড়ি কাঠে দিয়া খিল লাগাইয়া রাখা হইত, তদপরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

দিনেমার দিগের সময়ে তাহাদিগের বাণিজ্য দ্রব্যাদির ভাণ্ডার, বিচারালয় প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা (লাট) এবং মাজিষ্ট্রেটগণের থাকিবার বিভিন্ন বিভিন্ন আবাস বাটী ছিল; তন্মধ্যে একণে কেবল মাত্র লাট ও অন্যের কুঠীটি রহিয়াছে; এবং উক্ত বাটী গুলি সংলগ্ন প্রস্তর ভূমির (Compound) মধ্যে মাজিষ্ট্রেটেরও কুঠী ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহার অস্তিত্ব নাই, উক্ত কুঠীর উপর তলে মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং থাকিতেন এবং নিম্নতলে সিপাহীরা থাকিত। সুবেদার, হাওলদার, বাঁশিওয়ালা সিপাহী প্রভৃতি পুলিস কর্ম্মচারী দিগের পদ ছিল। নগরের মধ্যে কয়েকটি প্রশস্ত সুন্দর সুন্দর রাজপথ ছিল, গলিপথ বড় ছিল না। অদ্যাবধিও ঐ সকল রাজপথের মধ্যে অনেক গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে (১০)।

কাছারি বাড়ী ও থানাতে বড় বড় নাগারা থাকিত। ডাকাতি এবং অগ্নি লাগার সংবাদ উহা দ্বারা নগরে প্রচার করা হইত। শ্রীরামপুরের নিম্নে ভাগীরথীতে প্রায় পঞ্চাশ বাট খানি বাষ্পীয় পোত ও বাণিজ্য তরি বাঁধা থাকিত। এখনও অনেক গুলি জাহাজ ডেনিস গুদামের সন্নিকটে, নিশান ঘাটের সম্মুখে ভাগীরথী গর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছে। রিসড়ায় দিনেমার দিগের জাহাজ সকল জীর্ণ সংস্কার হইত।

দিনেমার দিগের উন্নত অবস্থায় তাহা-

(১০) Queen's street, Oxford street, New gate street, Strand road, College street, এবং লেন ছিল, ইহা ব্যতীত নগরের মধ্য দিয়া Grand Trunk Road চলিয়া গিয়াছিল।

দিগের বিলক্ষণ প্রতাপ ছিল। কথিত আছে যে যদ্যপি ইঙ্গরেজাধিকারের কোন ব্যক্তির জুতার এক খণ্ড দিনেমার দিগের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়িত, তাহা-হইলে ঐ জুতা পাটী সে ব্যক্তি লইয়া যাইতে সাহস করিত না, সাহস করিলেও লইয়া যাইতে পারিত না। আরও প্রবাদ আছে যে যদ্যপি কেহ দিনেমার দিগের জজ সাহেবের নিকট গিয়া অভিযোগ করিত যে অমুক সাহেব তাহার বৈতন দেয় নাই, তাহাহইলে জজ সাহেব তৎক্ষণাৎ পদাতিক কিম্বা আর্দালি দিয়া সেই সাহেব বা ফিরিঙ্গীকে আপনার বাটীতে ডাকাইয়া পাঠাইতেন, আসিলে কহিতেন, যে "তুমি তোমার ভৃত্যের মাহিনা দেও নাই কেন ?" তাহাতে উক্ত ব্যক্তি যদ্যপি বলিত যে "আমি উহার মাহিনা দিয়াছি" তাহাতে জজ সাহেব বলিতেন যে "কালা আদমি মিথ্যা বলে না।" আরও বলিতেন যে "তুমি যদ্যপি এই মুহূর্ত্তে উহার সমস্ত বেতন চুকাইয়া না দেও, তাহাহইলে তোমাকে ফটকে দিব।"

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে শ্রীরামপুরস্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক দিগের বিষয় কিছু বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তাহে ইঙ্গরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে উহাদিগের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোক দিগের শিক্ষার (বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা) পথ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৭৯৬ বা ৯৭ খৃষ্টাব্দে দুই জন মোরেভীয় ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীরামপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজি কালিকার খৃষ্টিয়ধর্ম্ম প্রচারকদিগের ন্যায় পথে পথে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন না, যাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া উক্ত ধর্ম্ম বিষয়ে জানিতে অথবা উপদেশ লইতে ইচ্ছা করিতেন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দিবসে ক্রাইটেরিয়ন (Criterion) নামক একখানি মার্কিন জাহাজে চারিজন ব্যাপ্টিষ্ট (Baptist) খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারক বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, কিন্তু ঐ সময়ে এতদ্দেশে তাঁহাদিগের কোন বন্ধু বান্ধব অথবা পরিচিত ব্যক্তি না থাকাতে তাহারা উক্ত জাহাজে অধ্যক্ষ কাপ্তেন উইকিস (Captain Wickes) সাহেবের পরামর্শে শ্রীরামপুরে গমন করিয়া উক্ত স্থানের য়ুরোপীয়দিগের পান্থ নিবাসে (হোটেলে) আশ্রয় লয়েন। তৎকালে দিনেমার দিগের উন্নত অবস্থা প্রযুক্ত উক্ত হোটেলেরও বিলক্ষণ জাঁকজমক ছিল। এই সময়ে কেরি সাহেব মালদহ প্রদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বোক্ত প্রচারক চতুষ্টয় এতদ্দেশে গমন করিয়া উক্তধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে কলিকাতায় ইঙ্গরেজী পত্রিকার সম্পাদকগণ এইরূপ ঘোষণা করেন যে বঙ্গদেশে চারিজন পেপিষ্ট (Papist) ধর্ম্ম প্রচারক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ঠিক সেই সময়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রেরিত গুপ্তচরসকল রাজনৈতিক এবং সেনা সম্বন্ধীয় বিষয়সকল অবগত হইবার জন্ত রোমান কাথোলিক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

এ কথা বঙ্গীয় ইজবেঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ বিদিত ছিল। বাস্তবিক উপরোক্ত বিষয় সকল অবগত হইবার জন্য ফরাসিস্ গবর্ণমেণ্ট জনৈক ইঞ্জিনিয়র ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন ইংলণ্ডের প্রধান সচিব মিষ্টার পিট ছিলেন। পিটের চক্ষু হইতে কাহারও এড়াইবার যো ছিল না। মিষ্টার পিট ফরাসিদিগের, এইরূপ অভিসন্ধি অবগত হইয়া কৌশলে উক্ত ব্যক্তির প্রতিরূপ (Photograph) লর্ড ওয়েলেসলির নিকট প্রেরণ করেন। ওয়েলেসলি ঐ ব্যক্তির কলিকাতায় আগমন সংবাদ [illegible] হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া ঐ প্রতিরূপ প্রদর্শন করাতে তিনি যে কার্য্যে ভারতে প্রেরিত হয়েন তাহা প্রকাশ করিলেন। ওয়েলেসলি অমনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এ দেশ পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই উপন্যাসটি যে কত দূর সত্যমূলক তাহা বলা সুকঠিন; কিন্তু সাধারণতঃ লোকে উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু এতদ্বারা বুঝা যায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎকালিক রাজনৈতিক সঙ্কটে কতদূর সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এমত সময়ে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস সংবাদ পত্রে সংবাদ পাইলেন যে চারিজন পেপিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক একখানি বৈদেশিক পোতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং উহারা কলিকাতায় না নামিয়া একেবারে বৈদেশিক উপনিবেশ শ্রীরামপুরে গিয়াছেন, তখন তিনি সাব্যস্ত করিলেন যে উহারা অবশ্যই ফরাশিসদিগের চর হইবে। সেই হেতু তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত পোতাধ্যক্ষকে পুলিসে আনাইয়া এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, যদ্যপি তিনি (পোতাধ্যক্ষ) অনতিবিলম্বে উক্ত প্রচারকদিগকে ফিরাইয়া লইয়া না যান তাহাহইলে তাঁহার পোতস্থ দ্রব্যাদি নামাইতে পারিবেন না। ধর্ম্মপ্রচারকচতুষ্টয় এইরূপ আজ্ঞাশ্রবণে অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে রেভারেণ্ড ডেভিড্ ব্রাউনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের স্বরূপ অবস্থা জানাইলেন। গবর্ণর জেনারেলের নিকট ব্রাউন সাহেবের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকাতে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিলে পর উক্ত জাহাজের দ্রব্যাদি নামাইবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত প্রচারকদিগকে কেরি সাহেবের নিকট যাইবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যদিও এই সময়ে কোন য়ুরোপীয় পাস ব্যতিরেকে অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিত না তথাচ অনেক য়ুরোপীয়, অভ্যন্তর প্রদেশের নানা স্থানে বাস করিতেন। গবর্ণমেণ্ট যেন এ বিষয় দেখিয়াও দেখিতেন না। কিন্তু কোন সময়ে যদি কেহ কোন প্রকার কষ্টের কারণ হইতেন, তাহাহইলে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হইত। তৎকালে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদিগের কোন প্রকার কার্য্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাস না থাকায় উক্ত মিশনরিগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারা যাহা যাহা করিতেন, তৎসমস্তই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিকর্ত্তৃক বিদ্বেষরূপে পরিলক্ষিত হইত। সেইহেতু মদনাবাটী নামক স্থানে তাঁহাদের

যাইবার অভিপ্রায় হওয়াতে তাঁহারা পাসের জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করেন, কিন্তু উহা লর্ড ওয়েলেস্‌লী অগ্রাহ্য করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে রাজধানীর সীমার বহির্দ্দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিতেও নিষেধ করেন। প্রচারকদিগের প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করা যে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল এমত নহে, তবে দেশ কাল বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি এইরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসেরও বিশেষ আজ্ঞা ছিল। এতদ্দেশে মিসনারিগণ অবস্থিতি করিয়া যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন সে বিষয়ে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর কিছু আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি কি করেন, তাঁহার উপরস্থ ব্যক্তিদিগের আজ্ঞামত কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যখন উহাদিগকে ব্রিটিশ ক্ষমতার বহির্ভূত, অথচ বৈদেশিক পতাকার আশ্রয় গ্রহণে স্থাপিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি মনে মনে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালের শেষ পাঁচবৎসরের মধ্যে যদিও উক্ত মিসনারিগণ ব্রিটিশ অধিকারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার এবং উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিতরণ করিতেন, তথাচ লর্ড ওয়েলেস্‌লী উহাদিগের কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক এমন কি, উহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম প্রচারক কেরি সাহেবকে (বিশেষতঃ তিনি মিসনারি বলিয়াই) গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে কেরি, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড সাহেবগণ মিলিয়া "শ্রীরামপুর মিসন" নামক একটী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক নিকেতন সংস্থাপিত করেন। শ্রীরামপুর তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করাতে উক্ত স্থানীয় ডেনিস-কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং উহাদিগের সেই ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য সংস্থাপনের বিষয় দিনেমার রাজের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। দিনেমাররাজ ষষ্ঠ ফ্রেডারিক উক্ত মিসনারী সম্প্রদায়কে নিজ আশ্রয়াধীন করিলেন এবং শ্রীরামপুরস্থ দিনেমার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে উহাঁদিগের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যত দিন লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাবৎকাল তিনি উক্ত বিষয়ের কোন প্রকার প্রতিকূলাচরণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং লর্ড মিণ্টোর ভারতে আগমনের পর সেই বিরক্তি উহা বৈরিতায় পরিণত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের চক্ষুর সম্মুখে রাখিবার জন্য লর্ড মিণ্টো শ্রীরামপুরস্থ ডেনিস গবর্ণরকে, তাঁহার আশ্রয় হইতে উক্ত মিসনারীদিগকে তাঁহাদিগের মুদ্রাযন্ত্র সহ কলিকাতায় প্রেরণ করিতে কহিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ডেনিস গবর্ণর বলিলেন যে "উক্ত মিসনারীদিগকে দিনেমাররাজ নিজ রক্ষণাধীনে রাখিয়াছেন অতএব তাঁহার রাজার আজ্ঞা ভিন্ন তিনি কোন

মতে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ নহেন"। দিনেমার গবর্ণরের এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য না হইয়া উক্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। কালসহকারে লর্ড মিণ্টোর মন ফিরিয়া গেল, এবং পূর্ব্বকার ব্যবহারজন্য যথেষ্ট আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মিসনারীগণ ১৮,৫০০ মুদ্রাব্যয়ে শ্রীরামপুরে একটী অত্যুৎকৃষ্ট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গির্জ্জা নির্ম্মাণার্থে লর্ড (Marquis of) ওয়েলেস্‌লী এক সহস্র এবং বক্রি নগরীয় ও অপর অপর ব্যক্তি চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন। এই গির্জ্জা স্থাপনাবধি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুরস্থ বাপ্টিষ্ট মিসনারীদিগের আয়ত্তাধীন ছিল, তৎপরে কলিকাতাস্থ লর্ড বিশপ উহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া চর্চ্চ অব ইঙ্গলণ্ডের (Church of England) অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজ ও অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্যে উক্ত গির্জ্জায় একটী ঘড়ি (Clock) সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দিনেমারদিগের সময়ে এতদ্রূপ ছিল না।

ডাক্তর কেরি ও মার্শম্যান সাহেবের প্রযত্নে শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়। অতএব শ্রীরামপুরে উক্ত মিসনারীদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হয়। উহারা প্রথম গৌড়ীয় ভাষায় "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রথম প্রকাশ করেন, সেই হেতু অনেক প্রাচীন ব্যক্তি সংস্কারবশতঃ সংবাদ পত্র মাত্রেই "সমাচার দর্পণ" বলিত। এই সমাচার দর্পণ দৃষ্টে কলিকাতায় "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রভৃতি সংবাদ পত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত মিসনারীদিগের দ্বারায় এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে শ্রীরামপুরে "শ্রীরামপুর কলেজ" স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে চল্লিশ সহস্র খণ্ড নানা জাতীয় পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত উহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে প্রথম "বোটানিকেল গার্ডেন" প্রস্তুত করেন, এবং যত্ন আয়াসে তিনি উক্ত উদ্যানে তিন সহস্র নানা জাতীয় বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানীয় লোকেরা ঐ উদ্যানকে সাধারণতঃ "কেরি সাহেবের বাগান" বলিয়া থাকে। ঐ উদ্যান এক্ষণে অবস্থান্তরিত হইয়াছে। উক্ত মিসনারীগণ ঐ নগরে প্রথম স্ত্রীশিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন, ডেনিস রাজপুরুষদিগকে লওয়াইয়া সহগমন নিবারণ, এবং বাষ্পীয় কলে কাগজ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করান। উক্ত নগরে ফিরিঙ্গীদিগের একটী ধর্ম্মমন্দির আছে, উহা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারেটোদিগের (Barettos) দ্বারায় নির্ম্মিত হয়। ইহা ব্যতীত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ডেনিস গবর্ণমেণ্ট-হাউস ও নিশান ঘাট নির্ম্মিত হয় উহাকে লোকেরা সাধারণতঃ "বড় সাহেবের বাটী" কহিত। ১৮০৩ সনে বিচারালয় ও কারাগার নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে একটী সামান্য গৃহে বিচার কার্য্য হইত। ডাক্তার মার্সম্যান ও জন মার্সম্যান সাহেবের

প্রযত্নে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত নগরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। উক্ত নগরস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বয় মৃত রঘুরাম গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ দে উহার জন্য বিলক্ষণ অর্থ ব্যয় করেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত নগরে চারিটী মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হয়, তন্মধ্যে [illegible] মার্সম্যান সাহেবের "শ্রীরামপুরের প্রেস" সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ লোকে উক্ত যন্ত্রালয়কে "কেরি সাহেবের ছাপাখানা" বলিত, উহা ডেনিসদিগের সময়ে স্থাপিত হয়। এই যন্ত্রে সংস্কৃত প্রভৃতি নানা প্রকার পুস্তক, "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্র [illegible] বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট প্রকাশিত হইত। দ্বিতীয় "শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয়" ১৮৪১ সনে মৃত কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার দ্বারায় স্থাপিত হয়, ঐ যন্ত্রে প্রতি বৎসর এক পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তৃতীয় "জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়" স্থাপিত হইলে ১৮৫৩ সনে গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর সাহায্যে কেশব চন্দ্র কর্ম্মকার দ্বারায় "জ্ঞানারুণোদয়" নামক মাসিক পত্র বঙ্গভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। চতুর্থ "শ্রীরামপুর তমোহর" যন্ত্রালয় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেলে হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ এবং শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরীণদিগের দ্বারায় স্থাপিত হয়।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

মহাকাব্যের সাদৃশ্য।

মহাভারতের সহিত রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি ঘটনা, কি পাত্রগণের চরিত্র উভয়তঃ এই সাদৃশ্য প্রতীয়মান। যাহাদিগের উদ্দেশ্য একই, তাহাদিগের কল্পনার মধ্যে সাদৃশ্য না থাকিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কই? এই জন্য আমরা দেখিতে পাই এই দুই মহাকাব্যে অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে, কেবল সদৃশ ঘটনা কল্পনা করিবার একটু বিভিন্নতা মাত্র। যিনি যে রূপ কবি, তিনি সেই রূপে ঘটনা কল্পনা [illegible] পাত্রগণের চরিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের সাদৃশ্য এত অধিক যেন বোধ হয় একজন অন্যের সামগ্রী [illegible] কল্পনা লইয়া নিজ কাব্য [illegible] করিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যেন বাল্মীকির সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামায়ণে রাজসভা [illegible] রাজৈশ্বর্য্য বর্ণিত আছে, তিনি সেই ছবিকে ম্লান করিবার জন্যই যেন উজ্জ্বলতর ও অতুলনীয় রাজসভা [illegible] রাজৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিলেন। রাজভোগের পর একেবারে বনবাস এবং বনবাসে রামচরিত্রের কেমন সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইতেছে। এই বিপরীত দশায় পাণ্ডবগণকেও দেখাইবার জন্যই যেন পাণ্ডবগণের বনবাস কল্পিত হইয়াছে। দাশরথিগণের চরিত্র সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দলে দলে দেখাইবার জন্য বাল্মীকি যেমন রাক্ষস ও রাবণ পক্ষের কল্পনা করিয়া-

ছেন, তেমনি মহাভারতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কল্পনা। রাবণ যেন রামলক্ষণের চরিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যই মহা মায়াজালের বৈরব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এদিকে দেখা যায় পঞ্চপাণ্ডবের চরিত্র সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবার জন্যই যেন দুর্য্যোধনাদির দুষ্ট-ব্যাপার ও শত্রুতাচরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। যদি পাণ্ডবগণের চরিত্র দেখিতে চাও, তবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কল্পনার দিকে চাহিয়া দেখ। যদি পাণ্ডবগণকে বুঝিতে চাও তবে, অগ্রে দুর্য্যোধনকে বুঝ। আবার দেখ রামায়ণে প্রতিজ্ঞা ও সত্য পালন আছে, মহাভারতেও তাই। বরং মহাভারতে সেই সত্যপালনের অনেক বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যপালনের জন্য রাজ্য ত্যাগ উভয় কাব্য মধ্যেই লক্ষিত হয়। দাশরথিগণ যেমন ত্যাগী, পাণ্ডবগণ তদপেক্ষা কিছু ন্যূন নহেন। সীতার বিবাহে যেমন ধনুর্ভঙ্গ পণ, দ্রৌপদীর বিবাহেও তেমনি লক্ষভেদ। দাশরথিগণের ভ্রাতৃভাবকে পরাজয় করিবার জন্যই যেন দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ একাত্ম পঞ্চপাণ্ডবগণকে সৃষ্টি করিয়া সেই পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা কল্পনা করিয়াছেন। নহিলে আমরা দেখিতে পাই, এ বিবাহ শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ। কেবল মাতৃ আদেশের বিশেষ বিধি আনিয়া কবি এই বিবাহ প্রথম করিলেন। এই বিবাহ আনিয়া তিনি দেখাইলেন, পঞ্চপাণ্ডব এমনি একাত্ম ও ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ ছিলেন যাহাতে সুন্দ উপসুন্দের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা এই ভ্রাতৃগণের বিচ্ছেদের কারণ হয় নাই। রামায়ণে দাশরথিগণ ও সীতার জন্ম যে রূপে কল্পিত, মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত ঠিক তদনুরূপ অভৌতিক ব্যাপার। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের জন্ম-বৃত্তান্ত আরও অদ্ভুত। কর্ণের জন্ম তদপেক্ষা অদ্ভুত। কর্ণ হইতে কখন কি সন্তান জন্মে? না সূর্য্যের সহিত সঙ্গম সম্ভব? শুদ্ধ জন্ম নয়, পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদীর মৃত্যু যেমন অদ্ভুত মহাপ্রাকৃতিক ব্যাপার, রাম ও সীতার মৃত্যু তদনুরূপ অদ্ভুত ব্যাপার। ঐতিহাসিক পাত্রগণের জন্ম মৃত্যু কি এরূপ অভৌতিক ব্যাপার হইতে পারে? দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা যেমন পাঞ্চালীকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, রাবণও তদ্রূপ সীতাকে আপন সেবায় নিয়োজিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতেই মহা-যুদ্ধের উৎপত্তি। মনুষ্যের প্রবৃত্তি যখন ধর্ম্মসাধনে অনুবর্ত্তী হইয়াছে, তখন যদি পাপমতি সেই প্রবৃত্তিকে দুষ্কৃতির দিকে আকর্ষণ করে, তখন যেমন অন্তর্জগতে মহা ধর্ম্মযুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, তেমনি যুদ্ধের অনুরূপ কল্পনার ছবি এই মহাকাব্যদ্বয়ে প্রদর্শিত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপা দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞক্ষেত্ররূপ কর্ম্মভূমি হইতে সম্ভূতা, সীতাও তদ্রূপ। সীতার গৌরব বাড়াইবার জন্যই যেন বাল্মীকি তাঁহাকে রাবণ-আলয়ে স্থাপিতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সীতার যে লৌকিক অপকলঙ্ক স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা, যে অপকলঙ্কের জন্য সীতা চিরদুঃখিনী, সেই অপকলঙ্ক নিবারণ জন্য ভারতকার ব্যাস দ্রৌপদীকে দুর্য্যোধন আবাসে স্থাপিত করেন নাই। ব্যাস নিজ মতে কল্পনাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন

মাত্র। দ্রৌপদীকে চিরদুঃখিনী সীতার কল্পনায় পর্য্যবসিত করা তাঁহার অভিপ্রেত বোধ হয় না। কিন্তু সীতাহরণে রঘুকুলের যে অপমান হইয়াছিল, সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ব্যাপার কিছু তদপেক্ষা [redacted] অপমানের বিষয় নহে। গণেশসংহিতায় এই বস্ত্রহরণ ব্যাপারের সুন্দর তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। গণেশ বলেন ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যিনি ভগবদ্ভক্ত, শত্রুপক্ষের কেহই তাঁহার বাহ্য ও অন্তর্হানি সাধন করিতে সক্ষম নহে *। সীতার যেরূপ অপকলঙ্ক ঘটিয়াছিল সেইরূপ অপকলঙ্ক নিবারণের জন্য ব্যাস সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা কল্পনা করিয়াও সীতাহরণের বৃত্তান্ত দিতে তিনি ছাড়িলেন না। তিনিও দ্রৌপদীর অন্তর্বল ও ধর্ম্মতেজ দেখাইবার [redacted] বনপর্ব্ব মধ্যে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণের আখ্যান প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণের যুদ্ধ [redacted] সীতার উদ্ধার, মহাভারতীয় যুদ্ধ এবং দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের সাদৃশ্য প্রতীয়মান করে। এই যুদ্ধ ব্যাপারে আমরা বিদুরের সহিত বিভীষণের কি সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। পবননন্দন হনুমান পবনাংশ সম্ভূত ভীমের সাদৃশ্য দেখাইতেছে।

রামায়ণে যেমন অযোধ্যার ঐশ্বর্য্য বনবাসের ভূমি [redacted] করিয়া দিয়াছে, মহাভারতেও তদ্রূপ ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য পাণ্ডবগণের বনবাসেরই [redacted] প্রতীয়মান হইয়াছে, এবং রামায়ণে যেমন বনবাসে মহাযুদ্ধের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে, মহাভারতেও তদ্রূপ পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্যহীনতায় এবং বনবাসেই কুরুক্ষেত্রের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের রাজ্যচ্যুতি হইবার পর যুদ্ধের উভয়পক্ষীয় বীরগণ প্রাণসংহারক বৈরতায় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে লাগিলেন। যেন দেখা যাইতে লাগিল ভবিষ্যগগণে এক [redacted] প্রলয়কারী জলদজাল উদিত হইতেছে—সেই জলদজালের পূর্ব্বান্ধকার পৃথিবীকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছিল।

প্রধান উপাখ্যানের ঘটনা সমূহ যদি এই কাব্যদ্বয়ের প্রকৃত হইত, তাহা [redacted] তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্যের [redacted] ঘনিষ্টতা হইত না। যাহা প্রকৃত হয়; তাহা কি ধারাবাহিকরূপে অন্য ব্যাপারের সহিত সদৃশ হইয়া ঘটিতে পারে? এরূপ কখনই সম্ভাবিত নহে। ধার্ত্তরাষ্ট্র [redacted] পাণ্ডবগণ যদি প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতেন, তাহাদিগের জন্ম কখন অলৌকিক ব্যাপার হইত না। আর তাহাদিগের জীবনচরিতে রামায়ণোক্ত পাত্রগণের জীবন চরিতের সহিত ঠিক সাদৃশ্য ঘটিত না। বাস্তবিক মহাভারত ও রামায়ণ যে একই জিনিষ, তাহা সেই কাব্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য, লক্ষ্য, [redacted] প্রভৃতির সাদৃশ্য দেখিলেই প্রতীতি হয়। [redacted] অলঙ্কার ভেদে ঘটনা বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত [redacted] যে কৃষ্ণতত্ত্ব পাওয়া যায়, মহাভারতেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মহাদেব, সর্ব্বভূতের পরমাত্মা রূপে সর্ব্বজীবে আছেন, যাঁহাকে জার্ভ

*। ন বাহ্যোঽবান্তরঃ শত্রুর্বাধতে ভগবজ্জনম্।
ক্রোধ দুঃশাসনৌ কৃষ্ণাস্যপাদ্যাপি [redacted] তেরতুঃ।
(গণেশঃ [redacted] শ্লোকঃ)

করিলে সকলদুঃখের শান্তি হয়, সেই পরমার্থ তত্ত্ব লাভের সাধন পথ প্রদর্শক শাস্ত্রই মহাভারত। শুধু মহাভারত কেন, যে যে শাস্ত্র এই উদ্দেশ্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, তাহাদের একই নাম জয়। এই জন্য আমি বলিয়াছি রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য একই। শুধু রামায়ণ কেন, এই দেখুন জয় নামে কি কি শাস্ত্র বুঝায় :—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমং যৎ মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, পঞ্চম বেদ মহাভারত এবং শিবধর্ম্ম ও বিষ্ণুধর্ম্ম, ইহাদের নাম জয়। প্রাচীন ঋষিগণ এই সংসার বিজয়ের পন্থার জন্য অত্যন্ত লোলুপ হইতেন। সেই পন্থা বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য বেদব্যাস মূল মহাভারত সংহিতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ লাভ সেই সংহিতার প্রধান উদ্দেশ্য। যে স্থলে মহাভারতের সকল গ্রন্থি একত্রিত করা হইয়াছে ও সকল সমস্যার পূরণ হইয়াছে সেই ভগবদ্গীতায় এই উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র রূপ মহা কর্ম্মক্ষেত্রের রণে যিনি কৃষ্ণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্ত হন, তিনি পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারের দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত হয়েন, তাহারই উপদেশ দিবার জন্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। এই মুক্তি পথ রামায়ণে যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভারতেও তদ্রূপ। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই এক দিকে পাপ পঙ্ক দশেন্দ্রিয়ের চিহ্ন স্বরূপ দশানন কল্পিত হইয়াছেন। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় যখন যখন অত্যন্ত প্রবল থাকে, তখন তাঁহার পরাক্রম দশাননের সমান। পাপ মানুষকে মৃত্যু ও ধ্বংস পথে লইয়া যায়, এজন্য আমরা দেখিতে পাই দশানন মহাকালের সহায়তা লাভ করিয়া একেবারে বিশ্ববিজয়ী রূপে দম্ভে সংসার ধামে বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াসক্তিতে লিপ্ত হইলে মানুষ পাপাচারে কেবল ধ্বংসের দিকেই আসিতে থাকে; সুতরাং পাপের প্রবণতা ধ্বংসের দিকে। যে শক্তি সেই ধ্বংস নিবারণ করিতে পারে তাহাই বিষ্ণু শক্তি। বিষ্ণুশক্তির অর্থ জীবের ও সংসারের রক্ষিণী শক্তি। বিষ্ণু স্থিতিকারী, মহেশ্বর প্রলয় কারী। মহেশ্বর দশানন রূপে জীবে বিরাজিত, বিষ্ণু রামরূপে তাহাতে আবির্ভূত। যে জীবে দশানন প্রবল সেই জীবের নিশ্চয় মৃত্যু উপস্থিত হয়, এবং জীব অশেষ দুঃখে জন্মান্তর ভোগ করিতে থাকে। পাপ যেমন জীবকে মৃত্যু পথে লইয়া যায়, ধর্ম্ম তেমনি তাহাকে স্থিতি পথে লইয়া যায়। পাপ জীবকে মৃত্যুতে আনে, ধর্ম্ম জীবন দান করে। কিন্তু পাপ যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, যখন দশেন্দ্রিয় প্রবল বর্গে বিষয় ভোগে রত থাকে, তখন মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্রোৎপন্ন ধর্ম্মাসক্তি রূপা বিষ্ণু পত্নী সীতাকে সেই দশানন নিজ সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য বিবিধ মত চেষ্টা পায়। কিন্তু মানবের ধর্ম্মাসক্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাহার কেন পাপাসক্ত হউক না, কিছুতেই পাপের সেবিকা হইতে চাহে না। যে জীবে সেবিকা হয় সে জীব অমঙ্গি-

কাল বিলম্বে মৃত্যু মুখে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু যে জীবে না হয়, সে জীবে ধর্ম্মাসক্তি বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করে এবং ধর্ম্ম বিষ্ণুশক্তিরূপে এতই প্রবল হইতে থাকে যে, শেষে অন্তর্জগতে এক মহা যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে বিষ্ণুশক্তিরই জয়। রাম সীতাকে সমুদ্ধার করেন। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত ও বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সীতার একেবারে উদ্ধার সাধন হয় না। সীতার উদ্ধার সাধন হইলে যখন তিনি কেবল রাম সেবিকা রূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন জীব ক্রমশঃ জ্ঞান পথে অগ্রসর হইয়া একে একে সমুদয় সংসার বিসর্জ্জন দিতে থাকেন। কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া জীব তখন কর্ম্ম সন্ন্যাসী। কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হইয়া জীব কেবল তত্ত্বজ্ঞানে আসিতে থাকেন। সংসারের ধর্ম্মাসক্তি (সীতা) পর্য্যন্ত তখন বিসর্জ্জিতা হয়। ধর্ম্মের সহায় ও বীর্য্য স্বরূপ লক্ষ্মণও বর্জ্জিত হবেন। জীব তখন একাকী মহা প্রস্থানে আসিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া মহা আনন্দ সাগরে সমুদয় সংসার-দুঃখ চির দিনের জন্য নিমজ্জিত করেন। জীব পরমাত্মার লয় প্রাপ্ত হন। ইহাই কৃষ্ণ লাভ ও মোক্ষ। রামায়ণে যে মোক্ষ পথ এইরূপ আধ্যাত্মিকা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভারতেও তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যুধিষ্ঠির রূপ মহাদ্রুমের মূলে কৃষ্ণ বিরাজিত। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, দশাননের মত দুর্য্যোধনও শতভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া মহা বলদর্পে কুরুক্ষেত্রের রণে আসিয়াছে। সেই কুরুক্ষেত্রের রণে সর্ব্বপাপবীজ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলে যুধিষ্ঠির তত্ত্বজ্ঞান পথে সম্পূর্ণ রূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না। যখন সমুদয় কৌরবগণের ধ্বংস হইল, তখন যুধিষ্ঠির কি করিলেন? যুধিষ্ঠিরের তখন সমুদয় বিষয়াসক্তি তিরোহিত হইয়াছে। তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে উঠিয়া আর রাজ মুকুট ধারণ করিতে চাহেন না। যাঁহার বিষয়াসক্তি তিরোহিত হইয়াছে তিনি তখন তত্ত্বজ্ঞানে আরোহিত এবং সম্পূর্ণ সংসার ত্যাগী। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, মহা যুদ্ধের অবসান পরেই যুধিষ্ঠির সর্ব্বত্যাগী হইতেছেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী তাঁহাকে হাজার হাজার যুক্তি কথায় প্রবৃত্তি দিতেছেন, সে সমুদয় কথায় তাঁহার একমাত্র উক্তি "আমার প্রবৃত্তি নাই" বলিয়া তিনি একেবারে সকলকে নিরস্ত করিতেছেন। তৎপরে ব্যাসের আদেশ ক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, যেমন সংসারত্যাগী আরণ্যাশ্রমী অরণ্য মাঝে ঋষিগণের পাদমূলে বসিয়া আরণ্যকের উপদেশ গ্রহণ করিতে বসেন, তিনিও তেমনি ভীষ্মের পাদমূলে বসিয়া সমস্ত জ্ঞান পথের তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই আমরা দেখিতে পাই পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান। সেই মহাপ্রস্থানে অগ্রে দ্রৌপদী বিসর্জ্জিতা, তৎপরে একে একে সকল ভ্রাতৃগণ বিসর্জ্জিত হইলে যুধিষ্ঠির দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। এই মোক্ষ পথ সমস্ত [illegible] শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণ লাভের এই সাধন পথ মহাভারতের প্রতিপাদ্য।

বাল্মীকি অন্তর্জগতের বাহ্য বিকাশ প্রকটনে প্রীতি পাইতেন, কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেরূপ ছিলেন না, তিনি অন্তর্জগতকেই বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। জীবের যখন বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সে জীবকে তদ্রূপই দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি তাহা দেখান নাই। তিনি সেই বিষয়াসক্তি-বিবর্জ্জিত জীবকে রাজভোগে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, করিয়া তাঁহার বিষয়াসক্তি তিরোধানের প্রভাব কেমন প্রভূত তাহা প্রদর্শন করিলেন। বিশেষতঃ রামকে পূর্ব্বে কখন সিংহাসনে বসাইয়া বাল্মীকি দেখান নাই। বনগমনকালে তিনি তাঁহাকে সিংহাসনত্যাগীরূপে এবং বনবাসেও তাঁহাকে চিরদিন ত্যাগীরূপেই দেখাইয়াছেন। কিন্তু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও রামচন্দ্র কেমন ত্যাগীর চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বাল্মীকি রামচন্দ্রকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। রামচন্দ্র রাজছত্র ধারণ করিয়া এবং রাজৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া কেমন নিষ্কামভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন ও প্রজাপালন করিতেন, তাহারই চিত্র দিবার জন্য বাল্মীকি তাঁহাকে অযোধ্যা-রাজরূপে প্রদর্শন করিলেন। সিংহাসনারূঢ় হইয়া তিনি ত্যাগী ঋষি চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়রাজ অঙ্গে এক দিন ব্রাহ্মণ ত্যাগী ঋষিচরিত্র সম্ভবিতে পারে। তিনি দেখাইয়াছিলেন, রাজভোগ মধ্যেও সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বিরাগী হইয়া রাজকার্য্যও সম্পন্ন করা যায়। এই রাজৈশ্বর্য্য সমস্তই বিষয়ভোগ, সমস্তই কর্ম্মযোগ, অথচ তন্মধ্যে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস। সকল কার্য্যই করিতে হইবে অথচ নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাবে সকল সমাধা করিতে হইবে। সংসারী অথচ সন্ন্যাসী। এই কঠিন ব্রত রামচন্দ্র একদা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র একদিন দেখাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ ঋষির নিস্পৃহ চরিত্র ক্ষত্রিয় ভোগী রাজ অঙ্গেও সম্ভাবিত হয়। এই রাজর্ষি-চরিত্রের চরম আদর্শ দেখাইবার জন্য বাল্মীকি শেষে সীতার বনবাস কল্পনা করিয়াছেন। এইস্থলে বাল্মীকি রামচন্দ্রের কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন, মোক্ষপথে আসিতে হইলে জীবকে কতদূর অনাসক্ত ত্যাগী হইতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিলেন। বাল্মীকি এইরূপে জীবের অন্তর্জগতকে বাহ্য অবয়বে মূর্ত্তিমান করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস তাহা করেন নাই। বাল্মীকি যাহা মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। ব্যাস সেই নীতির ব্যাখ্যা করিয়া ভগবদ্গীতা প্রচার করিলেন। দার্শনিকের মত সেই নীতির ব্যাখ্যা দিয়া পরে যুধিষ্ঠির চরিত্রে অন্তর্জগতকে একেবারে স্তরে স্তরে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে গেলেন। কুরুক্ষেত্রীয় যুদ্ধের পর আমরা সেই দৃশ্য দেখিতে পাই। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী যতই ভোগপ্রবৃত্তি দায়ক কথা বলিতেছেন, যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-রাজ্য ততই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহার নিস্পৃহতা ও অনাসক্ততা ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সেই ভাবকে প্রগাঢ় ও প্রবল করিয়া দিবার জন্যই যেন দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুনাদি তাঁহার ভোগবাসনা উদ্দীপন

করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের কথাসকল যতই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তাঁহাদিগের বাগ্মিতা যতই প্রবল ও বাক্‌কৌশলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যুধিষ্ঠিরের অনাসক্ততা ততই যেন দ্বিগুণ উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। প্রবৃত্তি-বল সমস্ত যুক্তি ও বাক্‌কৌশলকে পরাস্ত করিল। বাল্মীকি সেই অনাসক্তিকে রাজভোগে আনিয়া তাঁহার প্রাবল্যের বাহ্য বিকাশ দেখাইলেন। ব্যাস সেই অনাসক্তি হৃদয় মধ্যে কত বলীয়ান হইয়া সর্ব্ববিজয়ী হইয়াছে তাহাই দেখাইলেন। ব্যাস ও বাল্মীকি-প্রতিভার এই পার্থক্য জন্য তাঁহাদিগের কল্পনাও পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

আর এক কল্পনায়ও তাঁহাদিগের প্রতিভার এই রূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাল্মীকি একা রঘুবংশে মোক্ষার্থীর ধর্ম্ম জগৎ সাজাইয়াছেন, সেই ধর্ম্মবীরের বিপক্ষে রাক্ষসকুল। ব্যাসের মোক্ষার্থী ধর্ম্মজগৎ কৃষ্ণাশ্রিত যুধিষ্ঠির তাঁহার, বিষয়ী জগৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ। উভয় পক্ষই কুরুকুল-সম্ভূত। বাল্মীকির বিষয়ী পক্ষ কিন্তু রাক্ষসকুল সম্ভূত। বাল্মীকি তাঁহার বিষয়ী পক্ষকে ইন্দ্রিয়-প্রবল দশানন রূপে সাজাইলেন। তিনি সেই ইন্দ্রিয়-প্রবল মানবের বাহ্য অবয়ব কি রূপ হয় তাহা দশানন মূর্ত্তিতে প্রদর্শিত করিয়া বলিলেন, এই দশানন রাক্ষসকুল সম্ভব। রাক্ষসের ক্ষুধা যেমন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, ইন্দ্রিয়াসক্ত সংসারী জীবের ভোগলালসা তেমনি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সমগ্র জগতের ধনভাণ্ডার ও সম্পত্তি ঐন্দ্রিয়িকগণের ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে পারে না। এরূপ ঐন্দ্রিয়িক জীবকে রাক্ষস না বলিয়া কি বলিতে পারি। বাল্মীকি এজন্য দশাননকে রক্ষঃকুল সম্ভূত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ী লোক বাহ্যজগতে যেমন লোভমোহের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাক্ষসরূপে প্রতীয়মান হয়, দশানন সেই রাক্ষসরূপে বাল্মীকির কল্পনায় দেখা দিয়াছিল। বাল্মীকি বিষয় বাসনার অতৃপ্ত রাক্ষস মূর্ত্তি এত জাজ্জ্বল্যরূপে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি দশাননে সেই মূর্ত্তি প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্যাস কিন্তু তাহা করেন নাই। ব্যাস ইন্দ্রিয়াসক্তের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুৎপিপাসা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের চরিত্র-বর্ণনায় প্রদর্শন করিলেন। ব্যাসের কাব্যকল্পনায় আমরা দেখিতে পাই, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া যেন পৃথিবীকে আপনাদের লোভ-কবলে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সেই সংসারীগণের উৎপত্তি কোথায়? যে হৃদয়ে মোক্ষ ধর্ম্ম, সেই হৃদয়েই সংসারাসক্তিরূপ মোক্ষবিরোধী অধর্ম্ম। ইহাদিগের জন্মস্থান একই। ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যেই প্রতীত হয়। মানবের হৃদয়রাজ্যে যে কার্য্যাসক্তি আছে, তাহার নাম কুরুরাজ, সেই কুরুরাজেরই সন্তান পঞ্চপাণ্ডব এবং দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা। ইহাদের যে বিবাদ, তাহা জীবাত্মার হৃদয়রাজ্যের ঘোর আভ্যন্তরিক গৃহবিচ্ছেদ ও মহাযুদ্ধ। ব্যাস জীবের এই অভ্যন্তর দেশ যথাযথ চিহ্নিত করিতে চান। [illegible] কর্ম্মভূমি কুরুজাঙ্গল বা কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে লিখিত আছে:—

"মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল *।"

এই মানবের কর্ম্মভূমিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের যে তুমুল সংগ্রামের বিকাশ হয় সেই তুমুল সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র। কৌরবগণের এই গৃহসংগ্রাম প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করাইবার জন্য ব্যাসের মহাভারতীয় কাব্য-সৃষ্টি। ব্যাস মানবের অভ্যন্তর দেশকে দার্শনিকের মত কাব্য-কল্পনায় মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। বাল্মিকী সেই অভ্যন্তর দেশের বাহ্য বিকাশকে প্রকটিত করিয়াছেন। এই জন্য একের কল্পনায় রাবণ রাক্ষসরূপে প্রতীত হইয়াছেন, অন্যের কল্পনায়, দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত এক কুরুকুলেই সম্ভূত হইয়াছেন। তথাপি কৃষ্ণের কাছে এই দুর্য্যোধনাদি যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেই যে বিনষ্ট হইয়াছেন তাহার আর সন্দেহ কি? সেই জন্য তিনি অর্জ্জুনকে সেই দুর্য্যোধনাদির যথার্থ উত্তেজিত করিয়া তাঁহার মোহ অপনয়ন করিয়াছিলেন। কারণ, চিত্ত যখন সমূলে প্রবৃত্তি-পথ নিষ্কণ্টক দেয়; তখনও যেন এক একবার চিত্ত দুর্ব্বলতা মোহে অভিভূত হইতে থাকে। মন যেন সংসার ও বিষয়াসক্তি ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না। সংসারের এমনি সম্মোহন বেগ। এই সম্মোহন বেগে হৃদয়ে একদা ধর্ম্মবীর অর্জ্জুনকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। মোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুন মোহক্ষেত্রবর্ত্তী সাংসারিক মূর্ত্তিগণকে ভিন্নরূপে বিনষ্ট করিতে যাইবেন? সে বিষয়াসক্তি যে হৃদয় হইতে যাইয়াও যাইতে চাহে না। হৃদয়ে এতদিন পোষিত করিয়া ধর্ম্মবীর কি বলিয়া সেই বিষয়াসক্তিকে অন্তর হইতে তাড়াইয়া দিবেন। সে বিষয়াসক্তি যে আপনার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। সেই মোহ যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপনার বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু জীব জানে না, সেই বিষয়াসক্তিই যথার্থ আপনাকে পর করিয়া দেয়। এই বিষয়াসক্তি যাহা বাস্তবিক আপনার তাহাকে পর করে, এবং যাহা বাস্তবিক পর তাহাকে আপনার করে। আত্মা গৃহে থাকিয়া বাহ্য পৃথিবীর বশ। আত্মা গৃহে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশ। কোথায় ইন্দ্রিয়গণ আত্মার বশবর্ত্তী হইবে, না, ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী আত্মা। জীব এই মোহে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনরূপে ভগবদ্গীতায়ও দেখাদিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সেই মোহ অপনয়ন করিতেছেন। ব্যাস এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবের অভ্যন্তর্দেশকে মূর্ত্তিমান করিয়া মহাভারতের কল্পনাসৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সেই অভ্যন্তর্দেশকে দলেদলে বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন, সেই নীতির সারতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের দর্শন-তত্ত্ব। আচার্য্য শঙ্কর সেই দর্শনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এককালীন সমুদয় মহাভারত ও রামায়ণের সারতত্ত্ব সমুদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর দেখিলেন, সমগ্র ভারতীয়

* । শল্য পর্ব্বান্তর্গত ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় দেখ।

পর্ব্বের একে একে ভাষ্য করা সামান্ত কার্য্য নহে। এজন্য তিনি সমুদয় গ্রন্থের এক কেন্দ্র স্থান গ্রহণ করিলেন। সেই কেন্দ্র-দেশে তিনি এরূপ উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা সমুদয় মহাভারতীয় বিস্তীর্ণ ভূমি আলোকিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় ঘটনা পুঞ্জের সমুদয় রহস্ত একত্রিত করিয়া অর্জ্জুন ভগবদ্গীতায় এক বৃহৎ সমস্যায় সমস্ত কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তিনি এই সমস্যায় মহাভারতীয় সমস্ত ঘটনার এক বৃহৎ গ্রন্থি দিয়া কৃষ্ণের নিকট সেই গ্রন্থি খুলিতে দিলেন। কৃষ্ণ তাহা অতি কৌশলে খুলিয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য সেই কৌশল দেখাইয়া দিয়া গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই গীতার ভাষ্যে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় সমুদয় ঘটনা বুঝিতে গেলে, পাঠক, তোমার জানা চাই যে, একমাত্র Principle এর জন্য, এক মাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিয়োজিত হইয়া ত্যাগ স্বীকার করাই মানবের প্রধান কার্য্য ও গৌরব। এই ত্যাগস্বীকারে যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে তাহাই সংসার রূপ কর্ম্মস্থলের প্রধান লক্ষ্য। সেই ত্যাগ স্বীকারে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন তিনিই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মোক্ষ ও ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। গীতায় এই উপদেশ শুদ্ধ মহাভারতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা নহে, এই নিয়মে রামায়ণের সমগ্র ঘটনাবলীও নিয়োজিত হইয়াছে। রামায়ণে গীতার মত কোন পর্ব্বের বিন্যাস না থাকাতে তাহাতে সে নিয়মটি বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু মহাভারতে সে রহস্ত বিশদ রূপে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আলোকে আমরা বিলক্ষণ দেখিতে পাই রামায়ণোক্ত ও মহাভারতীয় সমগ্র ঘটনাবলী কি নিয়মে চালিত হইতেছে। কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে সমুদয় ত্যাগ স্বীকার ও বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দিবার জন্য সমগ্র মহাভারতীয় ঘটনার আয়োজন ও রামায়ণ-কল্পনার সৃষ্টি। সেই ত্যাগস্বীকারের পার্থিব কর্ম্মফল যাহাই হউক না কেন, ঐ কর্ম্মফলে উদাসীন হইলে মানব পরমার্থ ধনে ধনী হইয়া চিরসুখী হইতে পারে। সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের এই অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষা। এই সত্য মানব মনে সংস্কারবৎ বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য ভারতীয় কল্পনার সৃষ্টি ও কাব্য রসের আয়োজন হইয়াছে। এই লক্ষ্যের প্রতি এক দৃষ্টি চাহিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতীয় কাব্য-কল্পনার রচনা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস একজন মহা দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন এ জন্য তিনি সমুদয় কাব্যকল্পনার যে সত্য লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন, সেই সত্যের সমুদয় দার্শনিক তত্ত্ব এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। রামায়ণ পাঠে সেই সত্য মাত্র হৃদয়ে চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া যায়। রামায়ণে কাব্যরস ও সৃষ্টি এত ঊর্দ্ধতায় উঠিয়াছে যে, তাহাতে এই সত্য যেন দ্বিগুণ বলে আসিয়া তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পড়ে। মহাভারতে এই সত্যের চৈতন্য করিয়া দেয়, তুমি জানিতে পার, এই সত্যের প্রকৃতি কিরূপ; কিন্তু রামায়ণে এই সত্যের চৈতন্য উৎপাদন করিয়া দেয় না, তাহা অজ্ঞাতসারে তোমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, অচৈতন্য

ভাবে তোমার হৃদয়ে সংস্কারবৎ অবস্থান করে এবং অজ্ঞানত ভাবে তোমাকে জীবন ক্ষেত্রে চালিত করিতে থাকে। মহাভারত পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহার চৈতন্য হয় রামায়ণ পাঠে যাহা শিখিয়াছ তাহার চৈতন্য তত [illegible] না বটে কিন্তু তাহার প্রভাব তোমার হৃদয়ে নিয়ত অনুভূত হই তথাকে।

ভগবদ্গীতায় ব্যাস যাহা সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন, অনুগীতায় ত [illegible] বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন [illegible] দগ- বদ্গীতা কাব্যের যে স্থলে সন্নিবিষ্ট। [illegible] ল তত বিস্তৃত রূপে দার্শনিক তত্ত্ব [illegible] হইবার সময় নহে। [illegible] জন্য অনু [illegible] সৃষ্টি। সে যাহা হউক, পাণ্ডব [illegible] চরিত্র যে রূপ বিশুদ্ধ ভাবে চিত্রিত হই [illegible] তাহাতে গীতোক্ত বাক্য সকল যে অর্জু [illegible] মুখে বিশেষ রূপে শোভা পাইয়াছে ত [illegible] আর সন্দেহ নাই। সে প্রকার ধর্ম্মপ্রশ্ন সমস্যা আর কোন জাতির ইতিহাসে গৃহ- বিচ্ছেদ মূলক যুদ্ধ ব্যাপারে উত্থাপিত হয় নাই। চরিত্র সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যও গীতার সমাবেশ আবশ্যক হইয়া- ছিল। রামায়ণে রামপক্ষে অরাতি বিনাশে আত্মকুলক্ষয়ের ভয় ছিল না বলিয়া তাহাতে গীতার ন্যায় কোন অধ্যায়ের আবশ্যকতা [illegible] নাই। গীতার সন্নিবেশ দ্বারা কাব্য রসের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে বটে, কিন্তু মহাভারত মধ্যে গীতার প্রয়োজন [illegible] উপ- যোগিতা বুঝিয়া আমরা তাহার সমাবেশে তত দোষ দেখিতে পাই না। গীতাতে ব্যাস সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া হিন্দুর প্রকৃত মোক্ষপথ যেমন পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তেমন পরিষ্কৃত রূপে সংক্ষেপে কোথাও তাহা প্রদর্শিত [illegible] নাই।

এই গীতায় আমরা সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের নীতি এবং দর্শন তত্ত্ব প্রকৃষ্ট- রূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই। সেই নীতি [illegible] তত্ত্ব কল্পনায় যেমন অবয়বী হইয়া বিশাল মহাভারত [illegible] রামায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। "রাঘব পাণ্ডবীয়ের" গ্রন্থকার এই কল্পনার একত্ব কত বিশদ রূপে [illegible] কত সুন্দর কৌশলে কাব্যাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা সেই গ্রন্থ [illegible] 'ড়িয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। [illegible] দের শাস্ত্রালোচনায় [illegible] প্রভৃতি [illegible] যে প্রাচীন কালে এইরূপ [illegible] পণ্ডিত [illegible] ত্র মনে [illegible] নাছিল। কালবশে যত- [illegible] লোচনা [illegible] স হইয়া আসিয়াছে [illegible] সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, [illegible] পুনরায় শাস্ত্রালোচনায় যে সেই জ্ঞান আবার পুনরুদিত হইবে এমনও প্রত্যাশা আমাদের বিলক্ষণ আছে। এক্ষণে সেই জ্ঞানের পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। এত- দ্বারা আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়ের [illegible] প্রমাণ দিতে পারি নাই বটে, কিন্তু কথঞ্চিৎ আলোক পাত করিয়া সেইদিকে লোকের মন আকৃষ্ট করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

আমাদের আহারের নিয়ম।

বাঙ্গালী কেন দুর্ব্বল এই বিষয় লইয়া আজি কালি আলোচনা হইতেছে। আমাদের মতে বাঙ্গালীর আহারের নিয়ম নাই, এইজন্যও বাঙ্গালী দুর্ব্বল। আয়ুর্ব্বেদে আছে –

"দুগ্ধং ন ভুঞ্জীত কদাপ্যতপ্তং
তপ্তং নচৈতল্লবণেন সার্দ্ধং।"

দুগ্ধ কখন শীতল খাইবে না। শীতল না হইলেও লবণের সঙ্গে খাইবে না। আমাদের মধ্যে কেহ ঠাণ্ডা দুধ না খায়, কে লবণাক্ত তরকারীর সঙ্গে দুধ না খায়

মৎস্যমাংসগুড়মদ্যমূলকৈঃ
কুষ্ঠ মাবহতি সেবতাং

মাছ, কিম্বা মাংস কিম্বা গুড়, কিম্বা সহিত দুধ খাইলে রক্ত খারাপ হয়। আমাদের মধ্যে কে তা বাছে। টকের মূলা ও দুধ এক সঙ্গে দিব্য চাটনী হয়। অম্লের সঙ্গে দুধ খাওয়া নিষেধ, তাইবা কে বাছে।

আত্রেয় ঋষি কহিয়াছেন যে কোন প্রকার মৎস্যের সহিত দুধ খাইবে না। বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস ও দুধ একসঙ্গে খাইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব।

কদলীফলং তালফলেন পয়সা, দধ্না,
তক্রেণ বা।

লকুচ ফলং পয়সা দধ্না মাষসূপেন বা মধুনা
ঘৃতেনচ।

প্রাক্ পয়সং পয়সোন্তেবা।

তাল কি দুধ কিম্বা ঘোল কিম্বা দধির সহিত ী খাইবে না। দুধ কিম্বা দই কিম্বা কলায় কিম্বা মধু কিম্বা ঘৃতের সহি ।দারফল (লকুচ) খাইবেনা। অমুক বস্তুর সহিত খাইবে না বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে হইতপূর্ব্বে বা পরে বা মধ্যে খাইবেনা। ফলা এক সঙ্গে খাওয়া বারণ একথা ল পেটুকেরা বোধ আয়ুর্ব্বেদ য়া ফেলিবে।

রসবীর্য্যাভ্যাং বিরুদ্ধৌ,
ধুর-লবণৌ মধুর-কটুকৌচ সর্ব্বতঃ।

মধুর ও অম্লরস একসঙ্গে খাইবে না। খাইলে রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়। এইরূপ মধুর ও লবণ এবং মধুর ও কটু রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ।

মধুর-তিক্তৌ রস-বিপাকাভ্যাং।

মধুর ও তিক্তরস একসঙ্গে খাইবে না। খাইলে রসে ও বিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর-কষায়ৌ চাম্ল-লবণৌ রসতঃ।

মধুর রস ও কষায় রস অথবা অম্ল ও লবণ-রস মিলিত হইলে রসে বিরুদ্ধ হয়।

অম্ল-কটুকৌ রসবিপাকাভ্যাং
অম্ল-তিক্তেন অম্লকষায়ৌচ, সর্ব্বতঃ।

অম্লরস ও কটুরস রসে ও বিপাকে বিরুদ্ধ হয়। অম্লরস ও তিক্তরস অথবা অম্ল ও

কষায়রস রসে বীর্য্যে ও বিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

লবণকটুকৌ রস বিপাকাভ্যাং
লবণ তিক্তেন লবণ কষায়ৌচ সরুতঃ।

লবণ ও কটুরস রসে ও বিপাকে বিরুদ্ধ; লবণ ও তিক্তরস এবং লবণ ও কষায়রস রসে, বীর্য্যে ও বিপাকে বিরুদ্ধ।

কটু তিক্তৌ রস বীর্য্যাভ্যাং কটুকষায়ৌ
তিক্ত কষায়ৌ চ রসতঃ।

কটু ও তিক্তরস রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ। এইরূপ কটু ও কষায় এবং তিক্ত ও কষায় রসে বিরুদ্ধ।

বিরুদ্ধান্যেব মাদীনি রস বীর্য্য বিপাকতঃ।
তান্যেকান্তাহিতান্যেব।

দ্রব্যসকল রসে, বীর্য্যে ও বিপাকে বিরুদ্ধ হইলে এককালে ভোজন করিবে না। করিলে অহিত হইবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোধ হইবে যে বাঙ্গালীর অপেক্ষা হিন্দুস্থানী ও ইংরাজদের ভোজন ভাল। বাঙ্গালী শাক, ডাল, মাছ, মাংস, দুগ্ধ, দধি, পরমান্ন, সন্দেশ, ভাত, একবারে ভোজন করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানীদের যে পক্ষে বিচার আছে। তরকারীতে বাঙ্গালী মহাশয়েরা কচু, ঘেঁচু ইত্যাদি একত্র করিয়া থাকেন, হিন্দুস্থানীরা তাহা করেনা। গৃহস্থ কলমীশাক কিনিয়া দিলেন, গৃহিণী দেখিলেন পূর্ব্ব দিনের ডুমুর কিছু মজুত রহিয়াছে, কন্যা কহিলেন কুমড়ার খোলাগুলা পড়িয়া আছে, সুতরাং সমস্ত গুলিই একসঙ্গে চড়চড়ী করা হইল। গৃহস্থ, গৃহিণী ও কন্যা তিনজনেরই মানরক্ষা হইল, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের [illegible] করা হইল। ছ্যাঁচড়া নামক একটী তরকারী আছে তাহা বাঙ্গালীর মুখে বড়ই উপাদেয় হয়। উহাতে না থাকে এরূপ কোন সামগ্রী নাই। যজ্ঞশালায় রন্ধনান্তে যখন দেখাযায় যে ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর অবশেষ সকল পড়িয়া আছে তখনই সেই সকল একত্র করিয়া একটি ঘণ্ট করা হইয়া থাকে, ইহারই নাম ছ্যাঁচড়া। এতেও যদি বাঙ্গালী দুর্ব্বল না হয় তবে আর হবে কিসে? হিন্দুস্থানীরা ডাল ও রুটী একত্র খাইলেই যথেষ্ট বোধ করে। তাহাদের তরকারীতে দুই তিন ফলের একত্র মিশ্রণ দেখা যায় না। পটোল ও উচ্ছে হিন্দুস্থানীরাও খায় বাঙ্গালীতেও খায়, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা পটোল ও উচ্ছে এক সঙ্গে রাঁধে না। বাঙ্গালীর তরকারীর কোন নিয়ম নাই অথবা তরকারীতে তাহাদের সিদ্ধ বিদ্যা আছে, যাহা পায় একত্র মিশাল করিয়া ফেলে—তা ঝোলেই বা কি আর ঝালেই বা কি চড়চড়ীতেই বা কি আর ভাজাতেই বা কি। সাহেবেরা দিনের মধ্যে দশ বার খায় বটে, কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আহার করিয়া থাকে, আর এক সঙ্গে এত কখন খায় না। বাঙ্গালীর খাবার নিয়ম নাই। তেমন সুবিধা পায় তো ভাত খাবার পরই [illegible] তো এক সের সন্দেশ খাইয়া ফেলে। আর ভাতের সঙ্গে তো খাবার বিচারই নাই।

এই সকল কারণে বাঙ্গালীর বল হয় না। বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদ মানে না, এই জন্য তাহারা দুর্ব্বল। কেহ হয় তো বলিতে পারেন যে

সাত্ম্যতোঽল্পতয়া বাপি দীপ্তাগ্নে স্তরুণস্যচ।

স্নিগ্ধ ব্যায়াম বলিনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ।

অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজনে অভ্যাস থাকিলে কিম্বা পরিমাণ অল্প হইলে, কিম্বা অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, কিম্বা বয়সের অল্পতা থাকিলে কিম্বা স্নিগ্ধ ধাতু হইলে কিম্বা ব্যায়াম শালী হইলে কিম্বা বলবান হইলে বিরুদ্ধ ভোজনে অনিষ্ট করিতে পারে না। অতএব বাঙ্গালীর বিরুদ্ধ ভোজন দোষের কারণ নহে। আমাদের উত্তর এই যে গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে গাঁজায় অনিষ্ট না হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া কি গাঁজা খাইতেই হইবে।

বাঙ্গালী যে পরিমাণে দুধ খায় তত দুধ অন্য কোন জাতি খায় না বোধ হয়। শাস্ত্রে আছে দুধ খাইলে শরীর কাঞ্চন বর্ণ হয়, অঙ্গ সকল দৃঢ় ও গোল হয়। তবে আমাদের অঙ্গ এত জঘন্য কেন? কেবল বিরুদ্ধ-ভোজনই ইহার হেতু।

বাঙ্গালীর মত অপরিমিতাহারী জাতিও পৃথিবীতে নাই। সাহেবেরা বলে যে ইহারা এক এক জনে এককালে যত ভাত খায়, যে তাহাতে আমাদের একটা টেবিলে একবারে ৫।৭ জন লোকের পরিবেশন হইতে পারে। জোন্স নামক সাহেব রাম বাবু নামক এক জন বাঙ্গালীকে এক দিন এই কথা কহিলে রাম বাবু রাগত হইয়া কহিলেন যে তোমরা এত এত গোরুর মাংস খাও। জোন্স উত্তর করিলেন "তোমরা আবার আজ কাল তাতেও তো বড় কসুর যাও না। বেশীর ভাগ আবার এত এত ডাল ভাত খাও।"

কল্পনা শত প্রকার আছে তাহা বাঙ্গালীরা তরকারীতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "ডাল ও মাছ উভয়ই উপাদেয়- লাগে কোন্‌টা আগে খাওয়া যায়?" কর্ত্তা এই-রূপ প্রশ্ন করিলে রাঁধুনী অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া কহিল "দূর কর ডাল ও রুই মাছ আজ এক সঙ্গেই রাঁধা যাইবে" তদবধি "ডাল মুড়ির" সৃষ্টি হইয়াছে।

কোন একজন বাবুকে দেখিয়াছি যে সমস্ত তরকারী ভাত ও ডাল, টক্ ও ঝাল একত্র মাখিয়া খাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমতঃ কহিলেন যে আজি কালি এইরূপ ফ্যাসান হইয়াছে, পরে কহিলেন যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, রাজা, গরিব মরিলে পর সকলে এক জায়গায় কেমন করিয়া যায় তাহাই আমি দেখাইতেছি, পরে কহিলেন সকল তরকারী একে একে খাইতে গেলে আফিস যাইবার বিলম্ব হয় কাজেই এক সঙ্গে খাইতেছি, পরে কহিলেন সকল তরকারী মিষ্ট বোধ হয় কোন্‌টা আগে খাই, কোন্‌টা পরে খাই বুঝিতে না পারিয়া সমস্তই একবারে খাইতেছি। পাঠক দেখিবেন বাবুর এক খাওয়ার মধ্যেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফলাফল আছে। বিস্তারেণালং।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

আয়ুর্ব্বেদী চিকিৎসক।

সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও আলোচনা।

সংস্কৃত যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতি আদরের সামগ্রী ছিল তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক কারণ ভারতবাসী মাত্রেই এই বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন। যে সময়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বেদব্যাস, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া এই দেশ আলোকময় করিয়াছিলেন তখন যে সাহিত্য জগতে আমাদিগের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ অত্যুন্নত অতি দুর্লভ সর্ব্বজনবাঞ্ছিত গৌরবপদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন তাহা বিবেকশালী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম হয়েন। বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষা যে বর্ত্তমান সকল ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিতে বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সদুদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই [redacted] তাঁহাদিগের শ্রম যে বিফল [redacted] নাই তাহা নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত নহি। এই সদনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা আমাদের বিশেষ ভক্তিভাজন [redacted] প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ভরসা করি, ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া স্বদেশীয়েরা সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার করিতে সম্যক্ রূপে যত্ন করিবেন! ইহা না করিলে আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান ত্রুটি দোষে দূষিত হইব, [redacted] তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের নিকটও সেই সর্ব্বাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বরের নিকট সম্যক্ রূপে দায়ী হইব। অতএব সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় বিস্তার আমাদের একান্ত বিধেয়।

যে সময়ে মুসলমানেরা আমাদের দেশ [redacted] করে সেই দুর্দ্দিন হইতে আমাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত [redacted]। সুখের ভারত অসীম দুঃখের আবাস স্থানে পরিণত [redacted] সেই সময় হইতেই সংস্কৃত ভাষার আলোচনা [redacted] ক্রমে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। ইহা কি আক্ষেপের বিষয় নহে? ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় ব্যাপার হইতে পারে। বঙ্গীয় যুবকগণ! এখনও জাগ্রত [redacted] আর মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইও না, আর ভ্রমান্ধকারে থাকিও না, যাহা দ্বারা তোমাদের পিতৃপুরুষগণের আদরের ধন সর্ব্বজন প্রশংসিত সংস্কৃত ভাষা পুনরায় পূর্ব্ববৎ সাহিত্য জগতে বিজয় নিশান উড্ডীন করিতে পারে ও তদীয় কবিতা বল্লীর মধুময় কুসুম বিকশিত করিয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত করিতে পারে তদ্বিষয়ে একান্তমনে চেষ্টা কর। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ বোধ হয় যে যদ্যপি ভারতবর্ষে একতা সম্যক্‌রূপে সংস্থাপিত হইত [redacted] জাতি বিদ্যার চর্চ্চা ও শিক্ষা করিতেন তাহাহইলে আজ আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত না। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে

জানিতে পারা যায় যে যে দেশে একতা নাই সে দেশের উন্নতিও নাই। যথায় বর্ণবৈষম্য লক্ষিত হয় তথায় ঐক্য সংস্থাপন প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশে পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা কেবল বিদ্যাশিক্ষা করিতেন ও অপরাপর জাতিরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন যে দেশের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা দেখাইবার আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহা দ্বারা আমরা স্বাধীনতা রত্নোপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার জন্যই সংস্কৃত ভাষার আদর ও গৌরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। যে দেশ স্বাধীনতা রত্ন হারাইয়াছে সেই দেশবাসীগণ কিরূপে উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন? যে দিন হইতে ভারত বিজেতৃদিগের চিরদাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল যে দিন হইতে আমরা স্বাধীনতা রত্ন হারাইলাম যে দিন হইতে এ দেশে বিদেশীয়েরা আপনাদের হস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতেই ভারতে সকল অনিষ্টের বীজ অঙ্কুরিত হইল সেই দিন হইতেই স্বাধীনতা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল সেই দিন হইতেই ভারতের চির প্রজ্বলিত দীপ নির্ব্বাণ হইল ও আর্য্যগৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইল—সেই দিন হইতেই ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত যখন ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইল তখন যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা লুপ্ত প্রায় হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ইহার পুরাকালের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, যে ভারত এককালে শিক্ষিত জগতের আদর্শস্বরূপ ছিল সেই ভারতের অধুনাতন অবস্থা কি? যে ভারতের ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র সমস্ত প্রাচীন জাতির আদরের ধন ছিল, সেই ভারতে এখন কি এক খানি ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বা এক খানি দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কোন ভারতবাসীকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যরা প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মা কোলব্রুক সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে গ্রীস দেশের ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র হইতে আহৃত। তিনি বলেন যে হিন্দুদিগের দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র পুরাকালিক গ্রীকদিগের দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎপরে কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি ও তর্কের দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন যে যদ্যপি প্রাচীন হিন্দুরা প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা উহাদিগের পরবর্ত্তী উন্নতির বিষয় শিক্ষা করিতেন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;—"That the Hindus were, in this instance, the teachers, and not the learners." অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যরা গ্রীকদিগের নিকট দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা

করেন নাই। কিন্তু হায়! কি আক্ষেপের বিষয় আজ সংস্কৃত ভাষার সে আদর দেখিতে পাইতেছি না। আমরা যে সেই আর্য্য মহাপুরুষগণের বংশ পরম্পরা ইহা পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ হয়। আমরা কি এরূপ কুসন্তান হইয়াছি যে তাঁহাদের গৌরবের সামগ্রী সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার করিতে বদ্ধ পরিকর হইব না।

সংস্কৃত ভাষার বিষয় বলিতে গেলে আর্য্যদিগের বিষয় কিছুই না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। আর্য্য শব্দে সচরাচর হিন্দু বুঝায়, কিন্তু আর্য্য শব্দের এই অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। আর্য্য বলিতে গেলে কেবল হিন্দু বুঝায় না। ইউরোপের প্রায় সমস্ত সভ্য জাতি এই আর্য্য বংশ সম্ভূত। বোধ হয় এক শতাব্দী পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না যে ভারতবর্ষ বিজেতা শ্বেতকায় ইংরাজ ও তদ্বিজিত কৃষ্ণকায় হিন্দু এক আর্য্যবংশ হইতে সমুৎপন্ন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে হিন্দু ব্যতীত আর কোন জাতিই আর্য্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন দ্বারা আমরা ইহার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাইয়াছি। পিতা, মাতা, দুহিতা, পুত্র ইত্যাদি শব্দ সকল প্রায় সকল সভ্য জাতির ভাষার একরূপ। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা (Non-Aryans) আর্য্যবংশ সম্ভূত নহে। আর্য্যেরা যে মধ্য আসিয়া হইতে আসিয়াছিলেন তাহা এক প্রকার ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। শব্দ শাস্ত্রজ্ঞ ও ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা কোন রূপেই অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন ইংরাজদিগের, রোমিকদিগের জর্ম্মণদিগের, ও পারসিকদিগের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার এক প্রকার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি তখন কেমন করিয়া বলিব যে ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা একত্র বাস করেন নাই ও এক বংশ সম্ভূত নহেন। ইহা বলিলে শব্দ শাস্ত্রের প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যর্থ হইবার নহে। অতএব ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমান ইংরাজদিগের, জর্ম্মণদিগের, রোমিকদিগের পারসিকদিগের, ও হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক প্রাচীরের অভ্যন্তরে বাস করিতেন। বঙ্গের পণ্ডিতকুলতিলক সদাশয় পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে এই বিষয়ে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যার অনুশীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, "সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে। সংস্কৃতভাষী লোকেরা পৃথিবীর অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষের আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরাণ। তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে অতি পূর্ব্বকালে ইরাণের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মনি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। কালক্রমে বিভিন্নদেশে এই ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে

উহাদিগের পরস্পর কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণাম বিশেষমাত্র, এবিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই।" পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন যে, "আজ মহান আর্য্যজাতির জাতি বলিয়া, আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে ইউরোপের গৌরব, তাই ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণ বলেন আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসি নহে, যে দেশ হইতে লোক যাইয়া ইউরোপের আদিম অধিবাসিগণকে মারিয়া ধরিয়া দূর করিয়া দিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে, সেই দেশ হইতেই সেই লোক আসিয়া ভারতের আদিম অসভ্য রাক্ষসগণকে দূর করিয়া দিয়া ভারতে স্থান লাভ করিয়াছে।" আমাদের বিবেচনায় বোধ হয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। তিনি তাঁহার এ সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার মতের যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক প্রমাণ দিলে আমরা বাধিত হইব। তাঁহার প্রমাণ যদি আমাদের বিবেচনায় সন্তোষজনক হয় তাহা-হইলে আমরা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত নহি।

যে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন দ্বারা বিভিন্ন ও বিস্তৃত এক বংশসম্ভূত প্রমাণিত হইতেছে সেই সংস্কৃত ভাষা অনাদৃত হওয়া কি আক্ষেপের বিষয় নহে? সকল আর্য্যজাতির ভাষা যে কি ছিল তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখন পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু সকলে যে বর্ত্তমান সকল ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতর তাহা তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। প্রাচীন জগতে যে সংস্কৃত অতীব আদরণীয় ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এক প্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সংস্কৃত এককালে কথিত ভাষা ছিল। যখন আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন তখন যে সংস্কৃত তাঁহাদিগের কথিত ভাষা ছিল তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে অন্যান্য কথিত ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেই সকল ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিগণের (Non-Aryans) ভাষা ছিল। আর্য্যেরা এইসকল ভাষায় কথোপকথন করিতেন না। এই আর্য্য-দিগের কথিত ভাষা সংস্কৃত। যদি পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি কথিত ভাষা স্বীকৃত হইতে পারে, তবে সংস্কৃত যে কথিত ভাষা ছিল না তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে। পালি ও প্রাকৃত সংস্কৃত অপেক্ষা কোন প্রকারেই সহজ নহে। আমাদের দেশে এখনও এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায় (দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প) যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনায়াসে কথোপকথন করিতে পারেন। যখন অধুনা এত অল্প সংখ্যক লোক সংস্কৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা করিতে পারেন, তখন যে সংস্কৃত পুরাকালে কথিত ভাষা ছিল না (যে সময়ে ইহা দেশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে ছিল এবং সাহিত্য জগতে ইহার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল)—

ইহা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যেমন লাটীন এককালে কথিত ভাষা ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কতিপয় লাটীনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত আর কেহই এই ভাষা বুঝিতে পারেন না, সেইরূপ সংস্কৃত একসময়ে কথিত ভাষা ছিল। সংস্কৃত নাটক গ্রন্থাদি পাঠ করিলে ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইসকল গ্রন্থে নাট্যোল্লিখিত ভদ্র পুরুষগণ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন। ইহা কি প্রমাণ নহে? আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে ভদ্র মহিলাগণ সংস্কৃত ভাষায় সম্বোধিত হইয়াও প্রাকৃত ভাষায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ছিলেন না। যদি অনভিজ্ঞ থাকিতেন তাহা হইলে কোন প্রকারেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন না। যদি সংস্কৃত কেবল পণ্ডিত মণ্ডলীর ভাষা হইত, তাহা হইলে হিন্দু রমণীগণ ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। আর যদি এই কেবল কতিপয় পণ্ডিতবৃন্দের ভাষা হইত তাহাহইলে এই সংস্কৃত ভাষার এরূপ সমাদর দৃষ্ট হইত না। এইসকল বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিয়া দেখিলে সংস্কৃত যে এককালে কথিত ভাষা ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। মিউর (Muir) তাঁহার "Sanskrit Texts" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি দর্শাইতেছেন;—

The fact that the dramatic authors put Sanskrit into the mouth of the Brahmins, and other persons of the higher ranks, affords argument of considerable force that Sanskrit was once spoken by the whole community, and by the upper class down to a much later period: and even the common employment of the same language by learned Indians in their schools and disputations down to the present day, may go some way to prove its more general currency, as a vernacular at an earlier date. For if Brahmins did not at one time employ it in their ordinary discourse, how did they ever get into the habit of speaking it with so much ease and fluency? But if Sanskrit was at one time ordinarily spoken by Brahmins, the use of it would easily be propagated from one generation of learned men to another."

সংস্কৃত ভাষায় সকল প্রকার গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, সঙ্গীতবিদ্যা শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি। পুরাকালে হিন্দুদিগের জ্যোতিষের চর্চা এত অধিক ছিল যে তাঁহারা সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ উভয়ই গণনা করিতে পারিতেন। মহামুনি পরাশর প্রথম হিন্দুজ্যোতির্ব্বেত্তা। জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন

করিয়া তিনি তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি আমাদিগের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। গণিতবেত্তাদিগের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য ও আর্য্যভট্ট সুপ্রসিদ্ধ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত হিন্দুদিগের এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। চিকিৎসা শাস্ত্র লেখকদিগের মধ্যে চরক ও সুশ্রুত খ্যাতনামা ছিলেন। লীলাবতী এক জন প্রসিদ্ধা গণিতবেত্তা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পণ্ডিতদিগের সহিত এই বিদ্যার অনুশীলনে কালাতিপাত করিতেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পূর্ব্বকালে হিন্দু ললনাগণ অবরুদ্ধ থাকিতেন না ও তাঁহারা শিক্ষিতা ছিলেন। এবিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত আছে যদ্দারা প্রাচীন আর্য্য সমাজে যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল অনায়াসে প্রমাণিত হইতে পারে।

আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বিজ্ঞান শিক্ষার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের আদিম আবাসভূমী, বেদ বর্ণিত সময়ে আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চা দেখিতে পাই। আরবগণ এদেশ হইতে অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সভ্য ইউরোপ খণ্ডে প্রচার করেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যরা বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। যে রসায়ন বিদ্যার চর্চ্চা আজ সভ্য ইউরোপখণ্ডে ও আমেরিকাখণ্ডে এত অধিক হইয়াছে সেই রসায়ণ বিদ্যায় ভারতবর্ষীয়গণ সমস্ত জগতের গুরু। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা এলফিন্‌ষ্টোন তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"Their chemical skill is a fact more striking and more unexpected "They knew how to prepare Sulphuric Acid, Nitric acid, and Muriatic acid, the oxide of copper, iron, lead (of which they had both the red oxide and litharge), Tin and Zinc; the Sulphuret of Copper Zinc, and iron; and Carbonates of lead and iron. Their modes of preparing those substances) in some instances, if not in all seem to have been peculiar to themselves" চিকিৎসা শাস্ত্রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অভ্রান্ত ছিলেন। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ আরবেরা নিজ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া গ্রীকদেশে ইহা প্রচার করেন। আরবেরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপখণ্ড যে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এবং আজ এই বিষয়ে শিক্ষিত জগতে [illegible] বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাহার অধিকাংশ পুরাতন আর্য্যঋষিগণের নিকট হইতে গৃহীত। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'Their acquaintance with medicine seems to have been very extensive. We are not surprised

at their knowledge of simples; in which they gave early lessons to Europe, and more recently taught us the benefit of smoking Datura in asthma, and the use of cowitch against worms"

হন্টর তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন :— "In medicine the Brahmans learned nothing from the Greeks but taught them much. Arab medicine was founded on translation from Sanskrit works about 800 A.D. European medicine down to the 17th century was based upon the Arabic. The Indian physician Charaka who is supposed to have lived before Christ was often quoted in European books of medicine written in the middle ages".

অধুনা ইহা সর্ব্বত্র কথিত হয় যে অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে (Surgery) প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। অনেকে বলেন যে সম্প্রতি বিদেশীয় রাজপুরুষেরা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিয়াই ভারতবর্ষে ইহার সূত্রপাত আরম্ভ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহারা ইহা বলেন তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যগণের বিবরণ কিঞ্চিন্মাত্রও জানেন না। যদি বিদেশীয়েরা কেবল ইহা বলিতেন তাহাহইলে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম, কিন্তু হায়! কি আক্ষেপের বিষয় স্বদেশীয় শিক্ষিত লোকেরাও ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হন না ও কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জা ও অপমান বোধ করেন না। যাঁহাদের মনের ঔদার্য্য ও যাঁহাদের জীবনের যথার্থ [illegible] আছে তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে চিকিৎসাশাস্ত্র সমূহে প্রাচীন হিন্দুগণ জগতের গুরু। যে সকল ভারততত্বানুসন্ধায়ী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের যত্নে ও অনুশীলনে আমরা এই মহাসত্যে উপনীত হইয়াছি তাঁহাদিগকে আমরা ভূরি ভূরি ধন্যবাদ ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) বিষয়ে বৈদেশিক পণ্ডিত মহাত্মা এলফিন্‌ষ্টোন্ কি বলিতেছেন "Their Surgery is as remarkable as their medicine, especially when we recollect their ignorance of Anatomy. They cut for the stone couched for the cataract and extracted the foetus from the womb, and in their early works enumerate no less than 127 sorts of surgical instruments" সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তার এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে আমাদের মনে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ম্লেচ্ছ ভাষায় এরূপ লেখনী পাঠ করিলে মন যথার্থই আনন্দ সাগরে ভাসমান হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা হিন্দুদিগের বিশেষ গৌরবের সামগ্রী। মহর্ষি ঈশার জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতিষের আলোচনা দেখা যায়। প্রামাণিকতত্ব দ্বারা যত দূর জানিতে পারা যায় তাহাতে

মনুষ্য জন্মের কাল অন্যূন ৭০০০ বৎসর বলিয়া বোধ হয়। ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ মনুষ্য জন্মের কেবল মাত্র ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইউরোপ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল—যদি ভারতবর্ষীয়গণ জ্যোতিষের ন্যায় কঠিন বিদ্যার আলোচনা ও চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে মনুষ্য সমাজের অতি শৈশবাবস্থাতেই পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ সোপানে উঠিয়াছিলেন। আমাদের দেশ হইতে জ্যোতিষ ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হণ্টর বলেন :—"The Brahmans had advanced far in astronomy before the Greeks arrived in India in 327 BC" সূর্য্য যে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে না ও পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন :—

"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতি দৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাম্" ॥

পৃথিবীর আবর্ত্তন হেতু স্থির নক্ষত্র সকলের ও গ্রহগণের উদয়াস্ত হইতেছে। মহাত্মা কোলব্রুক বলিতেছেন যে হিন্দুরা ক্রান্তিপাতের বক্রগতি (Precession of the Equinoxes) ও কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর দৈনিক গতি (Diurnal revolution of the earth on its axis) এই উভয় বিষয়ে অপরাপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রথম বিষয়টী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত টলেমি (Ptolemy) অপেক্ষা স্থিরতর ও দ্বিতীয় বিষয়টী তাঁহারা পাঁচ শতাব্দীতে অতি সরলতার সহিত মীমাংসা করিয়াছিলেন। যদিও পুরাকালে গ্রীক পণ্ডিত হিরেক্লাইটস (Heraclitus) এই বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দিয়াছিলেন তত্রাচ ইহা সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ কোপর্ণিকসের সময়ের পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে, নানা ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নানা শাস্ত্র বিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাত্মা কোলব্রুকের কথা।

৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ সৌর্য্য বৎসরের (Solar year) গণনা স্থির করিয়াছিলেন।

ইউরোপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্য বিম্ব (Solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে।

"তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃ শনৈঃ।
তেনাস্মিন শ্যামিকা জাতা শাতনোর্চিষস্তথা।"

বিশ্বকর্ম্মা খণ্ড খণ্ড করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিলেন, প্রত্যেক কর্ত্তিত অংশ শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।

পৌরাণিক আখ্যানে ও বৈজ্ঞানিক সত্য দেখিতে পাইতেছি। পুরাণ বলিয়াই যাঁহারা এই সকল সত্যানুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন না তাঁহাদিগকে আর কি

বলিব। পুরাণ যে সমস্তই সত্য তাহা আমরা বলিতেছি না, পরন্তু বলিতেছি যে তাহা নয, কিন্তু, তাই বলিযা যে ইহা অশ্রাব্য করিব এমন কোন কথা নাই। পুরাণ আমাদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী ইহাতে অনেক মহাসত্য আছে তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করা হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিত হার্শেল (Herschel) সূর্য্যবিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান বহুকাল পূর্ব্বে বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎ সংহিতাগ্রন্থে বলিযা গিযাছেনঃ—যথা

"যস্মিন্ যস্মিন্দেশে অনিবাস্তি সূর্য্য-
অধিকস্য বিম্বস্যাঃ।
"তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীয়ং কর্ম্মাংপরিজ্ঞেয়ং॥
. . "বারিমুচোন প্রভূত বারিমুচঃ।
"সবিতো আয়াণি তনুত্বং কচিৎ কচি-
জ্জায়তে শস্যং"॥

যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায় সেই সেই মহীপতিদের বিপদ জানিতে হইবে . মেঘ সকল প্রভূত বারিবর্ষণ করে না। নদী সকল তনুত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কেবল কোন কোন স্থানে শস্য জন্মায।

জ্যোতিবশাস্ত্রের মূলস্বরূপ যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম (Law of Gravitation) আবিষ্কার করিয়া নিউটন জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত করিয়া গিয়াছেন সেই নিয়মের আংশিক জ্ঞান যে হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মাবিষ্কারের পূর্ব্বে ক্রান্তিপাতের গতি যে পৃথিবীর গতি সম্ভূত তাহা ইয়ুরোপে কেহই জানিতেন না, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট এই মীমাংসা করিয়াছিলেন। যখন ক্রান্তিপাতের গতি হিন্দুদিগের জ্ঞেয় ছিল তখন যে তাঁহারা মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। ইহার অন্য প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায। নিউটনের অন্যূন আটশত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেনঃ—

"ধৃতা ধৃতা ধরা কেন যেন নেয়মিধাদধঃ।"

এই যে পৃথিবী কিসের দ্বারা ধৃত আর কেনই বা অধঃপতিত হয না। ইহার উত্তরে এইরূপ বলিতেছেনঃ—

"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
"খস্থং গুরুস্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
"আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি
"সমে সমন্তাৎ কুরিযং যতঃখে॥"

এই পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিমতি, সেই আকর্ষণ শক্তিদ্বারা আকাশস্থ গুরুভাব যুক্ত বস্তু সকলকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে, সুতরাং তাহা পতিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই পৃথিবী আকাশে অবস্থিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে সমান আকাশ, সেই কারণ ইহার অধঃ ঊর্দ্ধ নাই, তবে ইনি কোথায় পড়িবেন? আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

"নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈ বিয়তি
"নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
"নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ
"মনুজাদিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ।"

এই পৃথিবীর অন্য কোন আধার নাই.

ইনি আপনার আকর্ষণ শক্তিতেই আপনি অবস্থান করিতেছেন এবং ইহারি আকর্ষণ-শক্তি প্রভাবে দৈত্য দানব [illegible] মানবাদি সমস্ত ইহার পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে।

ঋগ্বেদেও সূর্য্যের আকর্ষণ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়।

"আকৃষ্টেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং।

"হিরণ্ময়েন রথেন সবিতা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন"॥

আকর্ষণ শক্তিযুক্ত ও সর্ব্বপরিচালক রজো গুণ যাহার বর্ত্তমান, সেই সূর্য্যদেব অমরলোক সকলকে সন্নিবিষ্ট রাখিয়া হিরণ্ময় রথের দ্বারা ভুবন সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন।

এস্থলে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পণ্ডিত হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বেদ বিবাদ সমালোচনায় এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি বলেনঃ—

"যাঁহারা ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির উল্লেখ দেখিয়াই মনে করেন হিন্দুশাস্ত্রকারেরা Gravitation বুঝিতেন, যাঁহারা সংস্কৃত অভিধানে তড়িৎ শব্দের সন্নিবেশ দেখিয়াই Science of Electricity হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া বলেন যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের শক্তি [illegible] আধুনিক Dynamics নামক বিজ্ঞানের Force সমানার্থক ভাবেন, জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ" এই "যোগসূত্রটি দেখিয়াই যাঁহারা আধুনিক পরিণামবাদের ভ্রান্ত করেন তাঁহাদিগকে কোন বৈজ্ঞানিক কথা বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, এরূপ ফাঁকা কথা নিউটনের পূর্ব্বে ইউরোপেও সকলে বলিত, 'পাংশুবাদ হালিক' [illegible] জানিত, কিন্তু এরূপ কথায় বৈজ্ঞানিকের তৃপ্তি হয় না; যাহা পরিমাণ করা যায় না যাহার ইয়ত্তা স্থির করিবার উপায় নাই, তাহা বিজ্ঞানে স্থান পায় না। "Gravitation varies directly [illegible] the product of the masses and inversely [illegible] the square of the distances এই নিয়ম আবিষ্কার করাতেই বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল, ও নিউট[illegible] খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল [illegible] প কথা সুপণ্ডিত হরিদাস [illegible] হইতে শুনিতে হইবে তাহা আম[illegible] প্নেও ভাবি নাই। কিন্তু একটি ব[illegible]। আমরা জিজ্ঞাসা করি একেবারেই কি সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হয়? কে না স্বীকার করে যে নিউটন Gravitation আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দুরা Gravitation বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এ কথা কখনই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে হিন্দুদের Gravitation এর আংশিক জ্ঞান ছিল। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে একটা 'ফাঁকা কথা,' কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তা নয়। এই ফাঁকা কথাই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মাবিষ্কারের মূল স্বরূপ। আমাদিগের এই রূপ বিশ্বাস যে যদি কেপ্লর (Kepler) [illegible] না করিতেন ও তাঁহার তিনটী নিয়ম (Three laws of motion) না আবি-

কার করিতেন তাহাহইলে নিউটন Gravitation আবিষ্কার করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কেপলরের নিয়ম তিনটি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে পাঠক মহাশয় তাহা হইতে বিবেচনা করুন। Kepler's laws of motion are :—(1) The radii vectores describe areas in one plane proportional to the times of describing them. (2) The orbits are ellipses with the sun in one focus. (3) The squares of the periodic times vary as ... of the mean dist... the sun. প্রথমে আংশিক ... পরে পূর্ণ জ্ঞান বিকাশ পায়। বিজ্ঞা... ের মধ্যে কেপলর যে একজন অদ্বিতীয় ... তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু তত্রাচ তিনি Gravitation varies directly as the product of the masses and inversely as the square of the distance এ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া কি কেপলরের নিয়মকে 'ফাঁকা কথা কহিব। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে এ নিয়ম আবিষ্কৃত না হইলে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইত কি না সন্দেহ। তবে ইহা হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব ইহা ফাঁকা কথা, আর Laws of motion কেপলরের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে অতএব ইহা ফাঁকা কথা নয়, কারণ কেপলর একজন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক। আমরা এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র। আমরা আশা করিয়াছিলাম তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র ও ইংরাজি যুক্তির সাহায্যে সভ্য জগতকে দেখাইবেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বিজ্ঞান শিক্ষার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমাদের সমস্ত আশা বিফল হইল। তিনি এইরূপ লিখিয়া আমাদের মর্ম্মে আঘাৎ করিয়াছেন। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ দিয়াছি। ইহার আরও বহুল প্রমাণ আছে।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির বিশেষ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে হিন্দুরা সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি সম্পূর্ণ রূপে জানিতেন এবং মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞের ছিল না। যদিও আমরা এই নিয়মের সুস্পষ্ট জ্ঞান পুরাকালে ছিল এরূপ প্রমাণ পাই না কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইহা হইতেই নিষ্পত্তি করিতে পারি না যে তৎকালে কেহই মাধ্যাকর্ষণ বুঝিতেন না। হিন্দুদিগের প্রকৃত ইতিহাস নাই, অতএব আমরা ভারতে বিজ্ঞানের যে কত উন্নতি হইয়াছিল তাহা সবিশেষ অবগত নহি। যদি মাধ্যাকর্ষণের আংশিক জ্ঞান ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রাপ্ত হই, তাহাহইলে যে তাঁহাদের ইহার সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল এরূপ মীমাংসায় কি উপনীত হইতে পারা যায় না? হিন্দুদিগের লুপ্তাবশেষ গ্রন্থে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা কেবল সেই প্রাচীন আর্য্যোন্নতির ছায়া মাত্র।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থে জোয়ার ভাটা সম্বন্ধে (Phenomena of the tides) লিখিত আছে। তাঁহার রঘুবংশ নামক

গ্রন্থের পঞ্চম সর্গে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"তং তস্থিবাংসং নগরোপকণ্ঠে
"তদাগমারূঢ় গুরুপ্রহর্ষঃ।
"প্রত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রঃ
"চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্ম্মিরিবোর্ম্মিমালী॥"

উর্ম্মিমালী সমুদ্র যেমন চন্দ্রের প্রতিগমন করে তদ্রূপ অজের আগমনে অতীব হৃষ্ট বিদর্ভাধিপ নগরের উপকণ্ঠে স্থিত অজরাজার প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের সপ্তম সর্গেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

"দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং
"নিন্যে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ।
"বেলা সকাশং স্ফুটফেন রাজিঃ
"নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ॥"

নবোদিত চন্দ্রকিরণ কর্ত্তৃক সমুদ্রোর্ম্মি উচ্ছ্বলিত হইয়া যেমন তীরবর্ত্তী হয় তদ্রূপ নম্র অন্তঃপুররক্ষক কর্ত্তৃক অজরাজা বধূর নিকটে আনীত হইয়া ছিলেন।

হিন্দুরা যে চন্দ্রের আকর্ষণশক্তিরদ্বারা জোয়ার ভাটার উৎপত্তি জানিতেন তাহা এই শ্লোকদ্বয় হইতে বিশেষ অবগত হওয়া যায়।

হিন্দুদিগের ত্রিকোণমিতির (Trigonometry) বিশেষ জ্ঞানছিল, যে ত্রিকোণমিতির সম্পূর্ণ জ্ঞান ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। প্রোফেসর প্লেফেয়ার (Professor Playfair) তাঁহাদের ত্রিকোণমিতির বিষয় এইরূপ বলিতেছেন:—"It has the appearance, like many other things in the science of those eastern nations, of being drawn up by one who was more deeply versed in the subject than may be at first imagined and who knew more than he thought it necessary to communicate. It is probably a compendium formed by some ancient adept in Geometry for the use of others who were more practical calculators."

বীজগণিত (Algebra) যে হিন্দু বা অপরাপর কোন জাতির নিকট শিক্ষা করেন না [illegible] বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কেহ [illegible] থাকেন যে আরবেরা প্রথ[illegible]তর চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন [illegible]রা তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিয়া[illegible]ন। কিন্তু ইহা বিষম ভ্রম। কোলব্রুক সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে আরবদিগের জানিবার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই বিদ্যা সম্যক আলোচিত হইয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও ভাস্করাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে উভয়ে এই বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা উভয়েই আর্য্যভট্টর গ্রন্থ হইতে অনেক লইয়াছিলেন। আর্য্যভট্টর সময়ে (পাঁচ শতাব্দীতে) এই বিদ্যা অত্যুন্নত শৃঙ্গে অধিরোহণ করিয়াছিল। এলফিন্‌ষ্টোন্ বলেন:—"But it is in Algebra that the Brahmins appear to have most excelled their contemporaries." কোলব্রুক বলেন:—"Their application of Algebra to astronomical investigations and geometri-

cal demonstrations is also an invention of their own ; and their manner of conducting it, is even now, entitled to admiration."

ক্রমশঃ।

শ্রীবিনোদ বিহারী মিত্র।

বাঙ্গালী, বাঙ্গলাভাষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

জগতের কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি-করিলে কেবল পরিবর্ত্তনই উপলক্ষিত হয়। যে বিষয়ই ধরি তাহাতেই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এমন কোন অনিত্য বস্তু নাই যাহা পরিবর্ত্তনের অধিকার বহির্ভূত। অতএব একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে জগতে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এই পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দ, উন্নতির জন্ত কি অবনতির জন্য তাহা বলিতে পারিনা, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাহা কল্য ছিল তাঁহা অদ্য নাই এবং যাহা অদ্য আছে তাহাও কল্য থাকিবে না। সকল বিষয়েই যখন পরিবর্ত্তন আছে তখন ভাষার ও পরিবর্ত্তন আছে, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার ও পরিবর্ত্তন আছে। বাঙ্গালাভাষার আলোচনার জন্যই যখন এই প্রবন্ধের অবতারণা তখন আমরা বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার জন্য অতীত কালের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় আমরা কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জীব, আমাদের কিছুরই অভাব নাই, আমরা খালি সভ্যতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত, মূর্ত্তিমতী বিলাসিতা আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় উপভোগ্য বস্তুর সরবরাহ করিতেছেন। আমরা চলি, বলি, যাহা করি সমস্তই বিজ্ঞান বলে, দুইক্রোশ পথ পদব্রজে চলিবার শক্তি আমাদের নাই, কষ্ট সহিষ্ণুতা আমাদের নিতান্ত অপরিচিতা। ঈদৃশ অবস্থায় পূর্ব্বকালের লোকের আচার ব্যবহার, রুচিরস, মতিগতি ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় অনুমান করা আমাদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য, অতীতের সঙ্গে যখন বর্ত্তমানের তুলনা করিতে বসিয়াছি তখন আর কষ্ট সাধ্য বলিলে চলিবে না বাধ্য হইয়া সেই সময়ের কথার উত্থাপন করিতে হইতেছে। পাঠকগণ, ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না, একটু মনোযোগ সহকারে পিতৃপুরুষগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করুন।

এক্ষণে যেরূপ ইয়ুরোপীয়গণ ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন পূর্ব্বে যে

রূপ ছিলনা, তখন দুই একজন ইয়ুরোপীয় বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতীয় উপকূলস্থ নগরে কিম্বা অন্যান্য প্রধান বন্দরে বাস করিতেন তাঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতিও ভাষার সঙ্গে দেশীয় লোকের কোন সম্পর্ক ছিলনা। দেশীয় লোকে তাহাদিগকে বানরঔরস ▪ রাক্ষসীগর্ব্ভজাত অসাধারণ শক্তিবিশিষ্ট এক প্রকার জীব বলিয়া জানিত। তখন বঙ্গদেশে সংস্কৃত বাঙ্গলা ও পারস্যভাষাই মাত্র প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত বেদভাষা শাস্ত্রাদি সমস্ত এই ভাষায় লিপিবদ্ধ বলিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী, যাজকশ্রেণী ▪ অন্যান্য স্বাধীনজীবীগণ এই ভাষার আলোচনা করিতেন। মাতৃভাষাবিধায় সকলেই অল্পাধিক বাঙ্গলা অভ্যাস করিতেন। আর পারসী রাজভাষা বলিয়া মসিজীবীদিগের নিকট বিশেষ আদৃত ছিল। এইক্ষণ যেরূপ আগ্রহ সহকারে ইংরাজি পঠিত হয়, তখন সেইরূপ আগ্রহের সহিত পারসী পঠিত হইত। কিন্তু তখনকার শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এইক্ষণে যেরূপ পল্লীতে পল্লীতে স্কুল পাঠশালা দৃষ্ট হয় তখন এরূপ কিছুই ছিলনা। বিএ, বিএল, এমএ, এমবি, এমডির নাম জানিত না। বিএলের কাজ তখন ব্যবহার শাস্ত্রধ্যায়ীর দ্বারা চলিত, এমএর কাজ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এম বি ও এম ডির কর্ম্ম বৈদ্যশাস্ত্র ব্যবসায়ীর দ্বারা সমাধিত হইত। পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে কোথাও অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্রের ঘটত্ব পটত্ব, কোথাও বেদান্তশাস্ত্রের কূটতর্কের মীমাংসা কোথাও বা বিদ্যার্থীগণের সি, ঔ, জস্, অম্, ঔ, শস্ প্রভৃতি বিভক্তির উচ্চারণ শব্দ শ্রুত হইত। আবার মৌলবীর মাদ্রাসায় গেলে আলিফ্, বে, পে, তে, গুলিস্তা বোস্তার নৈতিক উপদেশ এবং হাফেজের কবিতা শুনিতে পাওয়া যাইত। তখন প্রধান সুবিধা এই ছিল যে লোককে "হা অন্ন যো অন্ন" করিতে হইত না। পাঠকগণ, বিরক্ত হইবেন না, বাঙ্গলাভাষা আমাদের লক্ষ্য হইলে ▪ এই সকল আনুসঙ্গিক কথার আদৌ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক এইক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার কথাই কিছু বলিব। ঐ সময়ে বাঙ্গালা ভাষার গঠন প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, যাহাদের জানিতে ইচ্ছা হয় তাহারা প্রাচীন দলিল পত্র পাঠ করিলেই টের পাইবেন আমাদের এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তখন পারসী শব্দে বাঙ্গালা ক্রিয়া সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা রচিত হইত। রচয়িতা ঐ সকল শব্দের অর্থ বুঝুন আর না বুঝুন তাহাতে কোন দোষ ছিল না। "তমস্তুকে" "ইয়াদিকিস্" "দস্তখত" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইত কিন্তু সকল লেখকগণ এই সব শব্দের অর্থ বুঝিতেন না, বুঝুন আর না বুঝুন তাহাতে এই সকল শব্দের অভাব থাকিলে আর তমস্তুক সিদ্ধ হইত না। হস্তলিপি যাহার সুন্দর হইত এবং দাখিলা চালান, পাট্টা, কবুলিয়ত ▪ তমস্তুকাদি যিনি স্বয়ং লিখিতে পারিতেন সমাজে তিনিই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুচ্ছুদ্দি ছিলেন,

তাহার যশের পরিসীমা থাকিত না। এইত গেল লেখা সম্বন্ধে, পড়া সম্বন্ধে সে কালের লোক ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে কীর্ত্তিবাস রামায়ণ ও কাশীদাস মহাভারত পাঠ করিত, কাব্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরাদি পুস্তক। তখন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ছিল না সুতরাং সাধারণের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করা সুকঠিন ছিল। তখন যে কোন কবি জন্ম গ্রহণ করিতেন না এ কথাও বলা যায় না, উৎসাহ দাতার অভাবে ও প্রকাশ করিবার উপায় না থাকা প্রযুক্ত অনেকের মনের ভাব মনেই মজ্জিত কাহারও বা মনের ভাব লিপিবদ্ধাবস্থায় বাক্সেই পচিত।

ইংরাজ শাসন ও ইংরাজি শিক্ষা যে বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রধান কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাচারিতে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা চালাইয়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লোকের অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছেন। স্কুল পাঠশালা প্রভৃতি সংস্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার উপায় সহজ করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজি পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার জীবন সঞ্চার করিয়াছেন অক্ষয় কুমার দত্ত তাহার পুষ্টি সাধন এবং বঙ্কিম বাবু প্রমুখ সুলেখকগণ তাহাকে নানা প্রকার স্বদেশী বিদেশী ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন। দিন দিনই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা যে বিশেষ উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমরা ইহাও বলিতে প্রস্তুত নহি যে বাঙ্গালা ভাষা চরমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গালা ভাষা শীঘ্রই অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ভাষার সমকক্ষ হইয়া উঠিবেন।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক বাঙ্গালীর শিক্ষাগুরু। পূর্ব্বে ছাত্রগণ আচার্য্যগৃহে দীর্ঘকাল বাস করতঃ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন পরে শাস্ত্রানুশীলনে গুরুর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া উপযুক্ত উপাধি গ্রহণান্তর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইতেন। শিক্ষার তারতম্যানুসারে সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তির মান মর্য্যাদা, যশ প্রতিষ্ঠা এবং অন্ন বস্ত্র সংস্থানের উপায়েরও বিসম্য ঘটিত। সম্প্রতি শিক্ষাগুরুর পদটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন। যুবকগণ শিক্ষা লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপাধি লাভও বিশেষ আয়াস সাধ্য নহে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পাঠ গলাধকরণ ও সময়ানুসারে তাহা উদ্গীরণ করিতে পারিলেই উপাধি লাভ করিতে পারা যায়। উপাধি লাভের পর আর গুরু শিষ্যের কোন সম্পর্ক থাকে না সমাজে যাহারা পৃষ্ঠপোষক আছে তাহারই প্রতিপত্তি হইবার সম্ভাবনা অপরাপরের অদৃষ্টে যাহা ঘটে তাহা তো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু দক্ষিণা সম্বন্ধে পূর্ব্ব কালের সঙ্গে বর্ত্তমানের এই প্রভেদ যে পূর্ব্বে উপাধি দানের পর দক্ষিণা দত্ত হইত

* এই স্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে সেনেট সেণ্ডিকেট প্রভৃতির সমবেত শক্তি বুঝিতে হইবে।

এবং সে দক্ষিণাও ছাত্রের শক্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। এখন আর সে নিয়ম নাই দক্ষিণাটী পূর্ব্বেই দাখিল করিতে হয় তার হার নির্দ্দিষ্ট ও অপরিহার্য্য।

যখন কলিকাতা বাঙ্গালির শিক্ষা গুরু এবং মাতৃ ভাষা বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর অবশ্য শিক্ষনীয় তখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন ও বাঙ্গালীদিগকে মাতৃ ভাষায় সম্যক পরিপক্ক করান গুরু স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনে বিশ্ববিদ্যালয় কতদূর যত্নশীল ও কৃত-কার্য্য এইক্ষণ তাহাই বিচার্য্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাঙ্গালা ভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এই কথার উপর ভর করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় কার্য্যক্ষেত্রে ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে এবং কার্য্যের উন্নতি হইতেছে অথচ বাঙ্গালা ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং এই শ্রীবৃদ্ধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত্নের ফল। দুঃখের বিষয় এই যে এই কথার উত্তর স্বরূপ আমরা দন্ত্য ন'য় আকার ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না। তবে এই প্রশ্ন হইতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই উন্নতির বিধাতা না হইল তবে এ উন্নতির বিধাতা কে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিতে বাধ্য যে এই উন্নতির জন্য প্রথমতঃ বাঙ্গলা সম্পাদকগণ ধন্যবাদার্হ, দ্বিতীয়ত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ। আমাদের উত্তর শুনিয়া হয়ত অনেক পাঠক আমাদিগকে বাতুল বলিবেন। কারণ ভ্রান্ত সম্পাদকগণের প্রতিপত্তি আধুনিক বহু দিন পূর্ব্ব হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে নানা প্রকার পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলাভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত স্বীয় লেখনী প্রসূত উজ্জ্বল রত্নে বঙ্গলাভাষাকে সমালঙ্কৃত করিয়াছেন এবং অন্যান্য লেখক-গণও বাঙ্গলাভাষার যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছেন তথাচ ধন্যবাদ দেওয়া হইল আধুনিক সম্পাদক দিগকে। আমরা প্রকৃত বাতুল না হইলেও ভূপালের বেগম ও বেওয়ার মহারাণীর ন্যায় বাতুল হইলেও হইতে পারি। বাতুলের প্রলাপ বলিয়া পাঠকগণ প্রস্তাবটীর আদ্যপান্ত পাঠ না করেন এই আশঙ্কায় উত্তরের মর্ম্ম বিশেষ-রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভাষার উন্নতি আপেক্ষিক অর্থাৎ মানুষের আলো-চনা সাপেক্ষ। যে ভাষায় যত অধিক আলো-চনা হয় সেই ভাষা তত উন্নত। গ্রন্থ, ভাষাকে উন্নত করিতে পারে না যতক্ষণে সমাজের লোক সেই গ্রন্থের সমধিক আলো-চনা না করে। কোন কবি যদি একখানা প্রথম শ্রেণীর কাব্য রচনা করেন অথচ কেহ যদি তাহা পাঠ না করে তবে কি তাহাদ্বারা ভাষার উন্নতি হয়? কোন ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিক যদি দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন অথচ জন সাধারণ যদি সেই তত্ত্বের আলো-চনা না করে তবে কি তদ্দ্বারা কোন উপকার সাধিত হইবে? অবশ্যই না। ঐরূপ বহু ব্যক্তি গত শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষারও ঠিক সেই দশা। বিদ্যা-সাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ গ্রন্থকার-গণই প্রথম বাঙ্গালা ভাষার পাঠোপযোগী

পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজা রামমোহন রায়কেই বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বীজ বপন কর্ত্তা বলা উচিত। হইলে কি হয়, ঐ সব পুস্তক পাঠ করিত কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘৃণা জন্মিল। বাঙ্গালা পুস্তক অনেকেই স্পর্শ করিতেন না। উঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথা বার্ত্তা বলা পর্য্যন্ত অপমান বোধ করিতেন। অবকাশ উপলক্ষে বাড়ী গেলে বাধ্য হইয়া মাতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেন কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও "ক্যালকাটা" "নিউজ পেপার" "হলিডে" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সম্পাদকগণ এই ঘৃণা ক্রমশঃ অপসারিত করিয়া আসিতেছেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার ইংরাজি পত্রে লিখিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক বাঙ্গালা পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট; ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই একবার পাঠ করা উচিত, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঐ পুস্তক খানা একবার পাঠ করিতে ইচ্ছা হইল; অবশ্য তিনি পূর্ব্বেও পুস্তক খানির কলেবর দেখিয়াছিলেন কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। কৃষ্ণদাস পাল পেট্রিয়টে লিখিলেন কালীপ্রসন্ন বাবুর "প্রভাত চিন্তা" খানি বেশ পুস্তক আমরা শিক্ষিত যুবকগণকে এই পুস্তক খানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তখন ২।৩ লোকের প্রভাত চিন্তার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ষ্টেটস্‌ম্যান্ সম্পাদক নাইট সাহেব লিখিলেন সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র খানি অতি সুন্দর, লেখার বেশ পরিপাটী আছে ইহাতে অনেক সার গর্ভ বিষয়ের আলোচনা হয়; তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর চমক ভাঙ্গিল, সোমপ্রকাশের জন্য "থ্যাকারের" বাড়ী অর্ডার পাঠাইলেন। এইত ব্যাপার, এ অবস্থায় সম্পাদকগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইয়া দিলে অনেকেই বাঙ্গালা পুস্তক স্পর্শও করিতেন না। অল্প দিনের কথা বলিতেছি অনেক বাবু আমাকে বাঙ্গালা পুস্তক ও সংবাদ পত্র পাঠ করিতে দেখিয়া বিরক্তি সহকারে বলিতেন "তুমি সময়ের মূল্য বুঝ না, বাঙ্গালা পড়িয়া অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট কর, বাঙ্গালা ভাষায় কি কোন পাঠোপযোগী বিষয় আছে?" সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বাবুটি স্বয়ংই এখন সময়ের মূল্য বুঝেন না সম্প্রতি তিনি বাঙ্গালা পাঠে বিশেষ উদ্যোগী। যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে আমরা সম্পাদকগণকে অতিরিক্ত প্রশংসা দেই নাই এবং ইহাও প্রমাণীকৃত হইল যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের যথোচিত চেষ্টা করেন নাই সুতরাং কর্ত্তব্য বিমুখ।

সেনেট সভার মধ্যে মধ্যে যখন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলনের কথা উত্থাপিত হয় তখন দুইটী আপত্তি উঠে;— ১ম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা স্থান পাইলে সংস্কৃত চর্চ্চা হ্রাস হইয়া আসিবে। ২য় বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয় নাই। এই দুইটী

আপত্তি যুক্তিসঙ্গত কি না তাহাই এইক্ষণ বিবেচ্য। প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে এই দেখিতে হইবে যে বাঙ্গালা ভাষাকে উৎসাহ দিলে লোকের সংস্কৃতানুরূপ শিথিল হইয়া আসিবে কি না। ভাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংস্কৃত পড়ান হয় সে সংস্কৃতের প্রতি কি লোকের অনুরাগ আছে? না থাকারই সম্ভব। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী উন্নতি বিরোধিনী। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণাশ্রিত। ব্যাকরণ উপেক্ষা করিলে সংস্কৃত ভাষার বোধ জন্মিতে পারে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাই হইতেছে। আমরা একথা বলি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র কৌমুদী সুন্দর রূপে পাঠ করিলে সংস্কৃতে বোধ জন্মিতে পারে না আমাদের বক্তব্য এই যে স্কুল কলেজে কৌমুদী যথোচিত পঠিত হয় না। অর্থ না বুঝিয়া অনেকেই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে তার ফল এই হয় যে কোন একটী শব্দের রূপ জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্র মুখে হয়ত এক প্রকার উত্তর করিতে পারিবে কিন্তু লিখিতে হইলে শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিবে না। শিক্ষা প্রণালী যে এই দোষের কারণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। একজন ছাত্র স্কুলের নিম্ন শ্রেণী হইতে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন প্রবেশিকার উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমাগত চারি বৎসর কলেজে সংস্কৃত পড়িলেন, বি এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে "অনার" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু সংস্কৃতে স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিতে তিনি নিতান্ত অসমর্থ ইহার কারণ এই যে সংস্কৃত ভাষায় তাহার অধিকার [redacted] নাই। যে ভাষা আয়ত্ত নহে যে ভাষা ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারা যায় না সে ভাষার প্রতি লোকের অনুরাগ কি প্রকার থাকিবে? তাই বলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংস্কৃত শিক্ষা হয় তাহার প্রতি ছাত্রগণ অনুরক্ত নহেন, বিরক্ত। কিন্তু কি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইতে হইলে ইংরাজি ভিন্ন অপর একটী ভাষা পাঠ করা আবশ্যক. গ্রীক, লাটীন পারস্যাদি ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে সুবিধা জনক নহে তাই বাধ্য হইয়া সংস্কৃত গ্রহণ করেন। বাধ্য হইয়া না লইয়া যদি ছাত্রগণ আগ্রহ সহকারে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেন তবে বলিতে পারি সংস্কৃতের প্রতি তাহাদের অনুরাগ আছে। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পথ বন্ধ করিলেই যে লোকের সংস্কৃতে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পথ খুলিয়া দাও, সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন কর দেখিবে লোকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়ের প্রতিই অনুরক্ত হইবে।

এইক্ষণে আমরা শিক্ষা প্রণালীর প্রধান দোষ গুলি দেখাইব সেই দোষ গুলির অপনয়ন করিতে পারিলেই শিক্ষার পথ পরি-[redacted] হইবে। সচরাচর ব্যবহার্য্য শব্দ গুলির রূপ ও নিত্য ব্যবহার্য্য ক্রিয়া গুলির বিভক্তি যোগ বিশেষ অভ্যস্ত থাকা আবশ্যক যাহাতে [redacted] লিখিতে পারা যায়। পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শিক্ষা দান কালে বাঙ্গালা কিম্বা ইংরাজি ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন, এই একটী প্রধান দোষ। এইরূপ নিয়ম করিতে হইবে যে সংস্কৃত পড়িবার

সমস্ত ছাত্রগণ কেবল সংস্কৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিবেন। পরীক্ষার প্রশ্ন সম্বন্ধে এই দোষ যে প্রশ্নগুলি ইংরাজি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় ছাত্রগণও ইংরাজি ভাষাতেই উত্তর করেন কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত শব্দ দৃষ্টি গোচর হয়। এ সম্বন্ধে এই নিয়ম করিতে হইবে যে প্রশ্নগুলি সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইবে এবং উত্তরও সংস্কৃত ভাষায় হওয়া চাই অপর ভাষা আদৌ স্থান পাইবে না। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে ছাত্রগণের সংস্কৃতে লিপি চাতুর্য্য জন্মিবে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের শক্তি জন্মিবে তাহাহইলেই ভাষা আয়ত্ত হইবে এবং স্বেচ্ছা ক্রমে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবে সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় ছাত্র গণের আন্তরিক অনুরাগ জন্মিবে।

"বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত" এই আপত্তি নিতান্ত অসার। বাঙ্গালা ভাষায় এখন এমন অনেক পুস্তক আছে যাহা এল, এ, ও বি, এ, ক্লাশের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। সকল উপাধি ধারী ছাত্রই যে বৃত্র সংহার কাব্যের ন্যায় পুস্তকের সম্যক ভাবার্থ বুঝিতে পারেন এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভাল তর্ক স্থলে স্বীকার করিলাম যে বাঙ্গালা ভাষায় ত্রুটী আছে, তা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইবে না কেন? ত্রুটী থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইলে সে ত্রুটী ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইবে। বাঙ্গালা ভাষা সম্যকরূপে উন্নত না হইলে বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিব না, বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করিব না এবং উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিব না বলা আর স্থলে বসিয়া সন্তরণ না শিখিয়া জলে নামিব না ও হস্তাক্ষর সুন্দর না হইলে লিখিতে আরম্ভ করিব না বলা একই কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সকলেই শিক্ষিত তাঁহারা আমাদের কথাগুলি ফুৎকারে উড়াইয়া না দিয়া যেন একটু ভাবিয়া দেখেন তবেই তাঁহাদের সংস্কার দূর হইবে। বাঙ্গালা ভাষাও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপ হইলে গ্রন্থকারগণও দর্শন বিজ্ঞানাদি উচ্চ বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত না হইলে এই সকল পুস্তক সাধারণের নিকট বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণের নিকট কেবল নাটক নভেলই সমাদৃত তাই আজ বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে গণ্য অগণ্য নানা প্রকার নাটক নভেলের ছড়াছড়ি। আমাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে দর্শনবিজ্ঞানাদি উচ্চ বিষয় পূর্ণ বাঙ্গলা পুস্তকেরও বহুল প্রচার দেখিতে পাইব।

এইক্ষণে আর একটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সংস্কৃতের বহুল প্রচার না হইবার কারণ এই যে, সংস্কৃতটী ব্যাকরণাশ্রিতা ভাষা, ব্যাকরণে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে যখন সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল তখনকার আচার্য্যগণ আবশ্যক মতে ব্যাকরণের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন সেই উল্লঙ্ঘনকেই আমরা আর্ষপ্রয়োগ বলি। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা অপরিবর্ত্তনশীল ছিল না

কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হইত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ স্মৃতি ও কালিদাসাদি কবিগণের গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে উপলব্ধি হয় যে ইহার প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র। বেদের সময় হইতে কালিদাসাদি কবিগণের সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা কালসহকারে ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ সেই পরিবর্ত্তনের স্রোত বন্ধ হওয়াতেই সংস্কৃত চর্চ্চায় শৈথিল্য জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ ব্যাকরণের একটী নিয়মেরও ব্যতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে বাঙ্গালাভাষার উন্নতি করিতে হইলে ভাষাকে ব্যাকরণাশ্রিতা না করিয়া ব্যাকরণকেই ভাষার আশ্রিত করিতে হইবে। ইংরাজি ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির কারণও তাহাই। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকে আশ্রয় করিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হইবে। সুতরাং ব্যাকরণ ও পরিবর্ত্তনশীল ও উন্নতিশীল হইবে। তা বলিয়া আমরা একথা বলিতে চাই না যে বটতলার পুস্তকের আশ্রয়ে ব্যাকরণ রচিত হইবে। সুবিখ্যাত লেখকগণের ভাষাই ব্যাকরণের আদর্শ হইবে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল সুতরাং লেখনী সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু।

সৌন্দর্য্য।

ফুল ফুটে [illegible] লতার শোভা বাড়াইবার জন্য, মধুমক্ষিকা তাহার চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায় ফুলের শোভা বাড়াইতে আর প্রজাপতি ফুলে বসিয়া থাকে ফুল ও বৃক্ষ এতদুভয়ের সৌন্দর্য্য অধিকতর সুন্দর করিবার জন্য। বালক সেই ফুল দেখিয়া আহ্লাদে তুলিতে যায়। যুবা তাহা দেখিয়া আমোদে বিভোর হইয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে থাকে। তাপী এ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্ষণিক শোক তাপ ভুলিয়া যায়। চিত্রকর তুলিকায় সে সৌন্দর্য্য বাহির হয় না দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার শোভাই দেখিতে থাকে। কবির সে সৌন্দর্য্যে কবিতার উৎস উথলিয়া পড়ে। পরস্পর সম্মুখীন দুই দল সেনা "এ স্থান স্বর্গ, বৈর-নির্য্যাতনের স্থান নহে" বলিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া দুই দিকে চলিয়া যায়। আর দার্শনিক সে সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া "একই উদ্দেশে মানুষ ছুটিতেছে" বলিয়া পণ্ড দেশে [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] মনে ভাবিতে ও তাহার শোভা সন্দর্শন করিতে থাকে। বালক, যুবা, চিত্রকর, কবি, যোদ্ধা ও দার্শনিক সকলেই সে সৌন্দর্য্যে বিভোর। সকলেই মনে মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। সে সুখের মূল সৌন্দর্য্য।

প্রকৃতি আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া

মনুষ্যের কি এক অভাবনীয় অভাব মোচন করিয়াছেন। মানব সেই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত। তাহাতেই সে সুখী। জগতে সে আর কিছুই চাহে না। প্রাচীন গ্রীকেরা তাই বলিয়াছেন "পৃথিবীই সৌন্দর্য্য" অর্থাৎ এরূপ ভাবে পদার্থগুলি সুন্দর ভাবে জগতে সজ্জীকৃত রহিয়াছে যে, যে প্রকৃতির লোক হউক না তাহা হইতে সে সুখ অনুভব করিবেই করিবে।

কোন মহা কবি বলিয়াছেন "রূপ চক্ষে"। যাহার চক্ষে যাহা ভাল দেখায় অপরের চক্ষে তাহা ভাল না দেখাইলেও না দেখাইতে পারে। তুমি যাহাকে সুন্দর বলিতেছ আমি তাহাকে হয়ত সুন্দর বলিব না অথবা আমি যাহাকে সুন্দর বলিতেছি তুমি তাহাকে সুন্দর না বলিলেও বলিতে পার। যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা সকলের চক্ষে সুন্দর। তোমার আমার চক্ষে যাহা সুন্দর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তোমার চক্ষে যাহা সুন্দর তাহা দেখিয়া তুমি সুখী হও; আমার চক্ষে যাহা সুন্দর আমি তাহা দেখিয়া সুখী হই। জগৎ ত এই রূপেই সৃষ্ট। স্রষ্টা জগৎকে ত এই রূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এ ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা সকলেরই চক্ষে সুন্দর। তাহাতে পাত্র বা জাতিগত রুচিভেদ নাই। আপামর সাধারণ সকল জাতিই তাহাকে 'সুন্দর' বলিবে। জগৎ তাহাকে সুন্দর বলিবে। তবে পৃথক এই, যাহার প্রকৃতি যে রূপ—যাহার যে রূপ শিক্ষা লাভ হইয়াছে সে তাহাকে সেই 'রূপ সুন্দর দেখিবে।

একটি ছয় মাসের শিশু দোলায় শুইয়া নিদ্রিতাবস্থায় হাসিতেছে। একটি পঞ্চম বৎসরের বালক সেই হাসি দেখিতেছে আর হাসিতেছে। ক্রমে বালকের মস্তকের চুল গুলি সোজা হইল। মুখ লাল হইল। সে ভাবে বিভোর। তাহার মনে হঠাৎ কি উদয় হইল। সে তৎক্ষণাৎ একটি বিড়ালের লেজের রোম কাটিতে ছুটিল। বিড়ালটি তাহার মাতার অতি প্রিয়। বিড়ালটির লেজ কাটিলে তাহার 'মা' তাহাকে যে বকিবে সে ভুলিয়া গিয়াছে। সে তাহাতে একটি তুলি করিয়া কালি দিয়া সেই ছয় মাসের শিশুর হাসি আঁকিবে। বালক এক মনে সেই হাসি দেখিতেছে আর কি আঁকিতেছে। তাহার পিতা পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার সে জ্ঞান নাই। ক্রমে তাহার জননী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন তখনও তাহার সংজ্ঞা নাই। বলা বাহুল্য সেই বালকেই ইংরাজি ইতিহাসের চিত্রকরের সিংহাসন আজিও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বালকের প্রকৃতি স্বভাবত চিত্র অঙ্কনের দিকে। সে শিশুর হাসি দেখিয়া যে রূপ হইয়াছিল তুমি আমি সে রূপ হইব না সত্য তবে সে সৌন্দর্য, বালকের ন্যায়, হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হউক আর নাই হউক কিন্তু আমাদিগকে মোহিত করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। তুমি-আমি গান শুনিয়া থাকি, তিন বৎসরের নিধুও গান শুনিত তবে সে যখন গান শুনিত তখন সে গানের সহিত হাতে তাল দিত। ভাল গান না হইলে তিন বৎসরের নিধু (নিধুবাবু) হাতে তালও দিত না, গানও শুনিত না। গানের সৌন্দর্য্য নিধু

যত দূর দেখিতে পারিত ও বুঝিতে পারিত আমরা তত দূর দেখিতে ও বুঝিতে পারি না তবে সে সৌন্দর্য্যে উভয়েই মোহিত হইতেছি। নিধু ও তুমি-আমি উভয়েই বলিব সুন্দর গান। শিক্ষাতেও সৌন্দর্য্য অন্য রূপ দেখিতে পায়। হুগলীর জুবিলী সেতু তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তুমি-আমি সে সেতু দেখিয়া বিস্মিত হইব। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইব। নির্ম্মাতার বুদ্ধির প্রশংসা করিব অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আর এক জন ইঞ্জিনিয়ার উক্ত সেতু পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখিবে। তাহার পরিসর দেখিবে, ভিত্তি দেখিবে, কোপিতে এত ভারি জিনিষ অনায়াসে তুলিতে পারা যায় তাহাই ভাবিবে আরো কত কি ভাবিবে [illegible] পরম আনন্দ ভোগ করিবে। সে সৌন্দর্য্যে সেও বিমোহিত হইবে। সেও বিমোহিত হইতেছে তুমি-আমিও বিমোহিত হইতেছি। তবে আমরা বহিঃসৌন্দর্য্য দেখিতেছি। সে অন্ত ও বহিঃসৌন্দর্য্য উভয়ই দেখিতেছে। এইরূপ সামান্য তৃণ হইতে ফুল পর্য্যন্ত ও জগতে যাহা কিছু আছে সমস্ত পদার্থেই মানব, প্রকৃতি [illegible] শিক্ষা গুণে, সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে। মানবকে সুখী করিবার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ তারকাবলি প্রভৃতি প্রত্যেকেই আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মানব সুখের আকর—মানবসুখের ভিত্তি সৌন্দর্য্য।

হেমন্তের পর শীত, শীতের পর গ্রীষ্ম গ্রীষ্মের পর বর্ষা এইরূপ ক্রমান্বয়ে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। ঋতুর সহিত প্রকৃতি সুন্দরীও নানা বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া মানব মন আকর্ষণ করিতেছে। নদীর স্রোতও ঋতুর সহগামী হইয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রকৃতি সুন্দরীর চরণতল দিয়া যাইতেছে—প্রকৃতি সুন্দরীর তাহাতে আরো শোভা—আরো সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। প্রত্যেক ঋতু প্রতিবারেই নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে। প্রকৃতি সুন্দরীও প্রত্যেক ঋতুর সহিত প্রতিবারেই নূতন বেশে আসিতেছে। স্রোতও তাহার সাথে সাথে কি সুন্দরই নৃত্য করিতেছে। প্রত্যেকবারেই নূতন নর্ত্তন প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নূতন আবির্ভাব। স্রষ্টার সৃষ্টিই এইরূপ। যিনি মনোযোগ সহকারে জগতের বস্তুসমূহ দেখেন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের নব নবরূপে দেখিতে পাইবেন। এই যাহা দেখিতেছেন তাহা আর নাই—আবার এক সুন্দর নূতন রূপ। [illegible] গেল বহির্জ্জগতের কথা। অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য ইহার তুলনায় অতুলনীয়।

মানুষের গুণ একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। স্রষ্টা যেন সেই গুণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মানবকে দেখাইতেছে যে ইহাই সৌন্দর্য্য। কাল [illegible] স্রোত মানবের [illegible] চলিয়া যাইবার সময় প্রত্যেক মহাত্মার গুণ-গরিমার সহিত তাঁহার পদচিহ্ন চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া যাইতেছে। যেন ইঙ্গিতে বলিতেছে ইহা ধরিয়া চলিয়া যাও আর কষ্ট পাইবে না। মানুষ মানুষের চরণই অনুসরণ করিয়া থাকে। পৃথিবী সকলের; প্রকৃতি সুন্দরীও সকলের। যিনি যে [illegible] গুণের পরিচয় দিবেন পৃথিবী তাঁহাকে সেইরূপ সহায়তা করিবে। প্রকৃতিসুন্দরীও

তাহার পিছনে পিছনে সেইরূপভাবে ছুটিয়া যাইবে। শিবন যথার্থই বলিয়াছেন "পবন ও স্রোত উৎকৃষ্ট নাবিকেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে।" ডিস্‌রেলি তাই একদিন সদর্পে মহাসভার সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন "আজি আমাকে করতালি দিয়া সকলে উপহাস করিতেছ কিন্তু এমন একদিন আসিবে যে দিন আগ্রহসহকারে সকলে আমার কথা শুনিবে।" ডিস্‌রেলি জানিতেন পৃথিবী তাঁহারই জন্য। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাবলীও একদিন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞায় ভীত হইয়াছিল—একদিন দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞায় পৃথিবী টলিয়াছিল।

প্রকৃতি অত সঙ্গিনী না পাইলে কি অত সুন্দরী হইত? কাল যদি না তাহার প্রতি মুহূর্ত্তের ছবি আঁকিত তাহা হইলে কি কেহ তাহাকে সুন্দরী বলিত—না কল্লোলিনী কুলু কুলু করিয়া তাহার রূপের ডালি যদি না মানবকে ডাকিয়া দেখাইত তাহাহইলে কি সে অত সুন্দরী হইত?—এক অজানিত মহাদেশের দেশের নাম ও কেহ জানে নাই। ইহার সম্মুখে সমুদ্র মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। তটদেশে পর্ব্বতমালা উচ্চ শিরে স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান। প্রকৃতি সুন্দরী নিজ শোভা যত দেখাইতে পারে তাহা দেখাইতেছে। ইহাই এখন তুমি দেখিতে থাক। তাহার পর দেখিতেছ কাতারে কাতারে বেত্রনির্ম্মিত কুটীর হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছে। একখানি জাহাজ সেই সমুদ্রতটে লাগিয়াছে। এখন বল দেখি আর একটু শোভা বৃদ্ধি হইল কি না? তাহার পর কলম্বসকে দেখিতে পাইতেছ। এখন বল দেখি সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হইল কি না? এই সম্পূর্ণ ছবি খানি হইতে কি জাহাজখানি ও কলম্বসকে মুছিয়া ফেলা যায়?—না কলম্বসকে ঐ সমস্ত ছবি হইতে পৃথক করা যায়? প্রকৃতি কবে সে বেশ পরিত্যাগ করিয়াছে। কালস্রোত কবে আপন মনে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু যখনি কলম্বসের কথা মনে পড়িবে তখন তাঁহার সহিত প্রকৃতি সুন্দরীর তৎকালীন সৌন্দর্য্য ও প্রত্যেক ঘটনা ক্রমে ক্রমে মনে উদয় হইবে। ইহা না হইলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বায়ু সাগরে যেমন বায়ুর উচ্ছাস মিশাইয়া যায় তেমনি মিশাইয়া যাইত। রাজবিদ্রোহী সার হ্যারী পর্ব্বতশিখরের একখণ্ড শিলার উপর বসিয়া আসন্ন মৃত্যুর বিষয় ভাবিতেছিলেন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন "তুমি এরূপ গৌরবের আসনে পূর্ব্বে কখন উপবেশন কর নাই।" দ্বিতীয় চার্লস আপনার প্রজাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যখন স্বদেশ হিতৈষী লর্ড রাসেলকে উন্মুক্ত শকটে করিয়া রাজধানীর প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া কারাগারে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দেন, ও তাঁহাকে তদনুরূপ লইয়া যাওয়া হয় তাঁহার জীবনীলেখক যথার্থই লিখিয়াছেন "তখন দর্শকবৃন্দেরা ঠিক যেন দেখিতে পাইল স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম যেন অটল ভাবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে।" রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন পুরবাসীগণ তাহাও দেখিয়াছিল, আর আজি পিতার সত্য পালনার্থে রাজ্য ও প্রিয়

জনক জননী পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে বন গমন করিতেছেন পুরবাসীগণ তাহাও দেখিতেছে। তবে সে দেখায় এ দেখায় অনেক প্রভেদ; এ দৃশ্য তাহাদিগের চিরকাল নয়ন সমক্ষে থাকিবে। মানব এ সৌন্দর্য্য চিরকাল দেখিবে। ভরত-শত্রুঘ্ন রাজা হইলেন—কৈকেয়ী রাজমাতা হইলেন, বল দেখি তাহাদিগের কথা কে কবে কহিয়া থাকে? রাম লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমানের পাশে ভরত না আসিলে সে ভরতকে কে দেখিতে চায়? এইরূপ গুণের মহিমার ছবি যত সুন্দর দেখিতে হয় তত সুন্দর কি আর কিছু দেখিতে হয়? এ সকল মহাত্মাদিগের গুণগরিমার রেখাপাত গগনপটে অঙ্কিত থাকে। সূর্য্য ও চন্দ্র নরলোককে ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য উর্দ্ধ হইতে উজ্জ্বলতর আলো উক্ত ছবির উপর নিক্ষিপ্ত করেন।

এইরূপ প্রকৃতি সতী আপন শিশুর মত চিন্তাশীল গুণবান মানবকে ক্রোড়ে করিয়া বণে, বনে, পর্ব্বতে, কূলে, অনলে, সলিলে, তপনে, গগনে, নক্ষত্রপুঞ্জে ও চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার প্রিয়পাত্রের জন্য তিনি কি না করিতে পারেন? কেবল তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে হইবে। চিন্তা ও ক্ষমতা প্রদর্শন করাইয়া প্রথমে তাঁহাকে মোহিত করিতে হইবে; তবে ত তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারিবে। সীতা দময়ন্তী এই রূপেই তাঁহাকে দাসী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অধিক কি স্বয়ং ভগবানই অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব দশাননের তোরণ রক্ষক হইয়া ছিলেন। প্রকৃত গুণবান পুরুষের কার্য্যকলাপই প্রকৃতি সুন্দরীর যথার্থ সৌন্দর্য্য। কবে চিতোর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে কিন্তু পদ্মিনী সংযোজিনী ও দুর্গাবতীর অপার ছবি এখনও চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। হোমর, লিথর, সক্রেটিস্,* কোলিয়ান প্রভৃতির ন্যায় সুসন্তান প্রীশ পাইয়াছিল বলিয়া আজিও সে

---

*। মহাত্মা সক্রেটিস্ শত্রুগণ কর্ত্তৃক বধ্যভূমিতে নীত হইয়া নির্ভীক অন্তরে কিরূপে বিষ পান করিয়া ছিলেন তাহা একজন কবি অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃক্ষরাজি লতাবলি ছিন্ন ভিন্ন ঝড়ে,
কিন্তু পর্ব্বতের চূড়া কভু নাহি নড়ে।
সমর-অস্ত্রের বজ্র কঠোর গর্জ্জনে,
ভীত হয় যুদ্ধ ভীরু কাপুরুষ জনে।
যাহাদের ভ্রম ক্ষম স্বাধীন অন্তর,
সমর তরঙ্গে তারা না হয় কাতর।
কখন মানুষে আমি নাহি করি ডর,
শেল বা খড়েগর ঘাত তুচ্ছবোধ হয়।
বহুশ্রমে সত্য বলি জানিয়াছি যাহা,
শতবার বলিতেছি সত্য সত্য তাহা।
পশিয়া দেখুন মধ্যে যদি কেহ পারে,
যে সুখ বিরাজে মোর হৃদয় আগারে।
আবদ্ধ হয়েছে বটে পরাধীন দেহ,
বাঁধিতে স্বাধীন মন শত্রু নহে কেহ।
এখনও ভ্রমিতেছি অতি কুতুহলে,
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে আর সাগরের জলে
ঘটুক যাতনা কিম্বা হউক মরণ,
বাক্যের অন্যথা মোর নহে কদাচন।
এ জগতে সেই জন্য সত্যের পালন,
সত্য সত্য সেই রক্ষা করে যা নী মন।
খণ্ড খণ্ড হইবেক দেহ অস্ত্রাঘাতে,
কিন্তু সেই সত্য মন কার সাধ্য নাশে?
কি কষ্ট মরণে—সুখে চলে যাবে প্রাণ;
এখন আত্মার শিব অমৃত সমান।

তাহাদিগের আলোকে আলোকিত রহিয়াছে। নির্জীব [redacted] পরাধিন হইয়াও ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির জন্য স্বাধীন রহিয়াছে।

সত্যই ধর্ম্ম—ধর্ম্মই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। এই সৌন্দর্য্যেই বিমোহিত হইয়া পাপী পাপ হইতে বিরত হইতেছে উৎপীড়িত ব্যক্তি ইহা দেখিয়াই আপন মনকে প্রবোধ দিতেছে। এই সৌন্দর্য্যই মনুষ্যকে হিতাহিতের শিক্ষা দিতেছে। এই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াই ব্রুস্ স্কট্‌লাণ্ড স্বাধীন করিয়াছিলেন। এই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াই বাল্মীকি যোগতপে রত হয়েন। মিথ্যা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণেকে লয় প্রাপ্ত হয়। সত্যের [redacted] চিরকালই। এই বলে বলীয়ান হইয়াই [redacted] শত্রুপুরীমধ্যে মহাবীর ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। এই সাহসে সাহসী হইয়াই 'ম্যাকডফ্' সিংহবিক্রমী 'ম্যাকব্যাথের' মুখ হইতে "I'll not fight with thee" ('আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিব না') শুনিতে পাইয়াছিলেন ও এই সাহসেই তিনি

"Then yield thee coward,
And live to be the show and gaze o' the time:
We will have thee, [redacted] our rarer monsters are,
Painted upon a pole, and underwrit
" Here may you see the tyrant'

এইরূপ কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা সত্যের জয়। ইহা অলক্তরেখায় কালস্রোতের বেলাভূমিতে মানবকে মোহিত করিবার জন্য চিত্রিত রহিয়াছে। রাবণ সবংশে নিধন হইল। কুরুকুল ধ্বংস হইল। নেপোলিয়ান মহাসমুদ্র পার হইয়া আসিয়া শেষ কিনারায় ডুবিল—মহাবীর দিগ্বিজয়ী হইয়া শেষ বণিকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। সিরাজ আপন ভৃত্যপুত্রকর্ত্তৃক হত হইলেন—আর বর্ম্মাধিপতি থিবু রাজা হইয়া [redacted] রাজ প্রতিনিধির বন্দী হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মের নিশান চিরকালেই জগতে একভাবে উড়িতেছে। এ সৌন্দর্য্য জগৎকে চিরকালই দেখাইবে। শাক্যসিংহ [redacted] সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই বেশেই তিনি দিগ্বিজয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ও পরিশেষে তাঁহার দেহের প্রত্যেক অংশ লইয়া ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মন্দিরে অতি যত্নে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও এখনও বহুযত্নে তাঁহারা উক্ত অংশগুলিকে পূজা করিতেছেন। এই ধর্ম্মের জন্যই যীশু হাসিতে হাসিতে আপন দেহ ক্রুশে প্রদান করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের নিশান আজিও জগতে উড়িতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্য আজিও বাঙ্গালার প্রতি গৃহে বিরাজ করিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ভারত স্বাধীন। [redacted] ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি, ভাষা ও পরিচ্ছদ যতদিন অটুট রহিবে—যতদিন বাল্মীকি, বেদব্যাস, [redacted] প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে পূজা করিবে—ততদিন ভারত স্বাধীন। পরাধীন নাম মাত্র। [redacted] বিধর্ম্মীদের [redacted] আর একটু দৃষ্টি পড়িলে তাহাও থাকিবে না।

প্রকাশক।

সকলই লোপ হয় কিন্তু সত্য কখন লোপ পায় না। পৃথিবী সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যাইলেও তাহা লোপ হইবে না— এ সৌন্দর্য্য চিরকালই জগৎকে দেখাইবে।

"জগদীশ্বর কে—বা কিরূপ" জিজ্ঞাসা করিলে যেমন বুঝাইতে পারা যায় না, সত্যও সেইরূপ বুঝাইতে পারা যায় না— সৌন্দর্য্যও পাবা যায় না—সত্যই সৌন্দর্য্য — সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সুখ—সৌন্দর্য্যই ঈশ্বর।

প্রকাশক

পুনর্জ্জন্ম।

মনুষ্য মরিয়া আবার পুনবায় জন্মগ্রহণ করে কি না এ প্রশ্নের উত্তর অতি কঠিন। আমরা এই প্রশ্নের যাহা আধুনিক মত ও বিশ্বাস তাহা হইতেই উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কবিব। কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ দেখা যাউক কাহারা পুনর্জ্জন্ম মানিত ও এখনও মানিযা থাকে আর কাহাবাই বা পূর্ব্বে মানিত এখন মানে না কিম্বা কাহারা কখনই মানে না। অধুনা কেবল হিন্দুগণই সভ্য শ্রেণীব মধ্যে একাধিক জন্মবাদী; কিন্তু পূর্ব্বকালে এই বিশ্বাস যথা-ক্রমে মিসর, গ্রীশ ও বোমে ছিল; এবং প্রাচীন ব্রীটনদিগেব পুরোহিত 'ড্রুইডেরা'ও এই মত মানিতেন। মিসরে বিশ্বাস ছিল যে বহুজন্মেব পর আত্মা পুনরায মনুষ্যদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং যতদিন মৃতদেহ পচিয়া না যায তত দিন তাহার আত্মা সেই দেহকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। মৃতব্যক্তিব আত্মাকে তাহাব পরিজনেরা নিকটে রাখিবে বলিযাই 'মমীর' সৃষ্টি। রোমানেরা এই বিশ্বাসবশতই শব দাহন কবিত। তাহারা আবশ্যস্তরি মিসরবাসী-দিগের ন্যায় মৃত আত্মাকে কষ্ট দিযা নিজ দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম অপেক্ষা-মৃত আত্মাব মুক্তিই অধিক ভাল বাসিত। গ্রীশদেশেব এক সম্প্রদায় প্রাণিহিংসা করিলে পাছে পূর্ব্বপুরুষেরা কষ্ট পায এই ভয়ে প্রাণি-হিংসা কবিত না। সে যাহাহউক পুনর্জ্জন্ম এখন কেহ প্রায আর মানেন না; কিন্তু প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকেই মানিতেন, এবং আধুনিক যদ্যপি হিন্দুমতও একাধিক জন্মেব পক্ষপাতী। তবে জিজ্ঞাস্য যে কাহারা অভ্রান্ত? যখন উভয পক্ষই মনুষ্য তখন কোন পক্ষকেই সহসা অভ্রান্ত বলা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিক মতই উত্তম ও অধিক যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন ও নব বিশ্বাসকে

সমূলোৎপাটন করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে আমরা কি বলিয়া আজ প্রাচীন মত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিই। পুরাকালের পণ্ডিতেরা সূর্য্যকে অগ্নিময় বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু অনধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে জ্ঞানীগণ সূর্য্যকে তেজোময় বলিয়া মানিতেন না এবং কহিতেন যে সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় শীতল ও সম্ভবতঃ মনুষ্য, [illegible] কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষাদি যে সকল পদার্থ পৃথিবীতে আছে ইহাতেও তাহা আছে। এবং বহুদূরে কেবলমাত্র অগ্নিময় বাষ্প আবরণে আবৃত, আমরা পৃথিবী হইতে এই আবরণ মাত্র দেখিতে পাই ও তজ্জন্য তেজোময় দেখি। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি আমাদের ভ্রম দূর করিয়াছে। আমরা এক্ষণে বুঝিয়াছি যে প্রাচীন মতই যথার্থ। সূর্য্য তেজোময়—জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। অতএব ইহা বেশ দেখা গেল যে আধুনিক মত যে একটা সত্য মতের প্রমাণ তাহা নহে। এখনও আমাদের পূর্ব্ব সন্দেহ যেমন তেমনি রহিল। কাহারা ঠিক তাহা অন্যরূপে নিরূপণ আবশ্যক। কিন্তু এইরূপ নিরূপণের পূর্ব্বে দেখা যাক্ যে পৃথিবীতে পরস্পর বিরোধী মতের মধ্যে সত্য সাধারণতঃ কোথায় থাকে। যুক্তিতে উভয়েই সমযুক্ত। যুক্তি ধরিয়া বিচার করিলে কেহই পশ্চাদপদ হইবে না—কেহই হটিবে না। উভয় দিকেই উত্তম প্রমাণ আছে। সুতরাং আমরা দেখিব যে এমন অবস্থায় সত্য কোথায় থাকে। [illegible]। এ বিচারে প্রথমতঃ আমরা 'মিলের' দোহাই দিলাম। তিনি বলেন যে সত্য কখনই একেবারে একস্থলে আসিতে পারে না; তাহা হইলে দুই পক্ষ থাকিত না। দুই পক্ষ হইলেই সত্যও ভাগ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষেই কতক সত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতেছে যে আমরা চিন্তা করিলে ঠিক তাহাই দেখিতে পাইব। পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিলেও এই মতের সমর্থনকারী ঘটনা সকল স্মরণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ মনুষ্যের ইতিহাসে এই মত সমর্থন দৃষ্টান্ত অনেক আছে এবং তাহা হইতে একটিমাত্র এখন দেখাইব। ইউরোপে এককালে "নামবাদী" ও "বস্তুবাদী" নামে দুই দলে ঘোর বিতণ্ডা চলিয়াছিল এবং কতক পরিমাণে এখনও চলিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "নামবাদী দিগের মত এই যে দ্রব্যে দ্রব্যে নাম ভিন্ন আর কোন সম্পর্ক নাই। যথার্থ কোন কিছু বন্ধন নাই। "বস্তু বাদীরা" বলেন যে সমস্ত গুণ পৃথক করিলেও সকল বস্তুরই কিঞ্চিৎ শেষ থাকে। যেমন লৌহ এই ধাতু হইতে ধাতুত্ব, কাঠিন্য, ইষদ্ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি সমস্ত গুণ অপসৃত করিলেও যাহা থাকিবে তাহার নাম বস্তু (Matter) এবং সকল দ্রব্যের এই [illegible] নামক শেষ আছে। কিন্তু এই বিতণ্ডায় প্রবেশ করিবার আমাদের অধিকার বা আবশ্যক নাই। তবে ইহা জানা উচিত যে আধুনিক সুধীগণ স্থির জানিয়াছেন যে উভয় মতেরই কিয়দংশ সত্য। এক্ষণে স্থির হইল যে উভয় মতই আংশিক ভ্রান্ত। অতঃপর দেখা যাউক যে কোন্ মতের কি যুক্তি ও প্রতিবাদ বা কি? বহুজন্ম বাদীরা বলেন যে আত্মা পৃথিবীতে আসিয়া মাত্র

এত শুদ্ধ হইতে পারে না যে একবারে স্বর্গে যাইবে। পৃথিবীতেই বহু জন্ম হইয়া পাপক্ষয় ও আত্মোন্নতি হইয়া আত্মা ধরাধাম ত্যাগ করে ও পৃথিবী হইতে উন্নত ও উত্তমতর স্থানে যায়। দ্বিতীয়, নরজন্ম অথবা নর [illegible] পর পশু জন্ম পাপের শাস্তি ও উন্নতির সোপান। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে পুনর্জন্ম যদি গতজন্মের পাপের শাস্তিই হইল তবে গতজন্মের স্মরণ না থাকা কিরূপে সম্ভবে। যদি কোন শাস্তি পাইতেছি তাহাই না জানিলাম তবে কেমন করিয়া আত্ম শোধন করিব এবং যদি এক আত্মাই দুই জন্ম লাভ করে তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের বিস্মরণই বা কেমন করিয়া সম্ভবে। আমরা জীবনের কোন কোন ঘটনা ভুলি বটে কিন্তু কেহই নিজ জীবনের কোন অধ্যায় একেবারে বিস্মৃত হয়েন না। এবং এই স্মরণের কারণ আত্মা, দেহ নহে; কারণ আধুনিক নরদেহ তত্ত্ববেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে কয়েক বৎসরান্তর নরদেহে সমস্ত পদার্থান্তর হয় অর্থাৎ আজি আমার দেহ যে সকল বিশেষ বিশেষ পরমাণুদ্বারা গঠিত কয়েক বৎসর পরে তাহার একটি পরমাণুও আমার দেহে থাকিবে না সমস্তই নূতন হইবে। যদি আত্মাই আমাদের স্মরণাধার হইল তবে দেহপরিবর্ত্তনের আত্মবিস্মরণ হইবার কারণ কি? আমরা এক একটি করিয়া সমস্তগুলিরই উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ কারণজ্ঞান না হইয়া শাস্তি। স্বীকার্য্য যে কারণ জানিলে শাস্তি হইতে আমরা অধিকতর সুফল লাভ করি। কিন্তু জগৎকালব্যাপী নিত্যসত্য এই, যে "দুইটি আপদের মধ্যে ন্যূনতরটি বাছিয়া লইবে ও অধিক তরটি ত্যাগ করিবে"। জগৎপিতা জগদীশের জগতে এই নিয়ম প্রতিপালিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বজন্ম স্মরণ থাকিলে কি অনিষ্ট হইতে পারে। অগ্রে বলা হইয়াছে যে পর জন্ম কেবল শাস্তি নহে উন্নতিরও সোপান। অর্থাৎ এতদ্বারা জীবকে উন্নত করিবার পুনরায় জীবন ব্যাপক কাল দান করা হয়। যদি জীব জানিল যে তাহার সমস্ত বিপদাপদ পূর্ব্বজন্ম কৃত অপরাধের অবশ্যম্ভাবী ফল তবে সে উন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না। হতাশ হৃদয়ে কার্য্য করিবে। জীবন কিছুই নয়—জগৎ নিরয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। পূর্ব্বজন্মের সম্পদ এ জন্মের দুঃখকে লক্ষগুণে বর্দ্ধিত করিবে। মনে করুন একজন জমীদার মরিয়া পাপফলে তাঁহার নিজ জমিতেই অতিদীন প্রজা হইয়াছে। একদিন তাঁহার পূর্ব্বজন্মের চাকর আসিয়া খাজানা চাহিল। তিনি দিতে অক্ষম। চাকর তাঁহাকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে লইয়া চলিল। বলুন দেখি তাঁহার কত কষ্ট হইতেছে। প্রতি পাপোচিত দণ্ড অপেক্ষা কি অধিক দণ্ড হইল না? পুনরায় মনে [illegible] এক ধনাঢ্য বণিকের পিতা মরিয়া অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া জন্মিয়াছে। সে পুত্রের নিকট গিয়া আত্ম পরিচয় দিল। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিল। পুত্র ও আত্ম বৃত্তান্ত হইতে জন্মের পর জন্ম জানে সুতরাং পিতাকে চিনিল। বলুন দেখি এরূপ

স্থলে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ভিক্ষাজীবন অন্ধের ঘটিল কি? পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইল না। প্রত্যুত পুত্র যদি পরম ধার্ম্মিক হন তাহা-হইলে তাঁহার পিতার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি যে দুঃখিত হইবেন ইহার বিচিত্র কি? এ দুঃখ—এ কষ্ট—পুত্র অকারণ ভোগ করি-লেন? ইহাও জগদীশ্বরের অভিপ্রায় নহে। এখন বলুন যে পূর্ব্বজন্ম বিস্মরণ ভাল কিনা? প্রত্যুত এই বিস্মরণ ও শাস্তির অংশ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। আমরা আরও বলিতে চাই যে আমাদের দুঃখ বিপদাদি যে পূর্ব্বকৃত অপরাধের ফল তাহা আমরা না জানিলামই বা কেমন করিয়া। স্মৃতিদ্বারা না জানিলেই কি না জানা হয়? আমরা অন্য কোন রূপে কি জ্ঞান উপার্জ্জন করিনা? নেপোলি-য়ান অদ্ভুত যোদ্ধা ছিলেন ইহা আমরা দেখিয়াছি না আমাদের স্মরণ আছে? পৃথিবী যে ঘুরিতেছে তাহা আমরা দেখি-য়াছি কি যে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি? বরং আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই অন্যবিধ উপায়ার্জ্জিত। ঈশ্বর করুণা করিয়া আমাদের বিবেচনাদি শক্তি দিয়াছেন। এই সকল ব্যব-হার করিলেই আমরা বিপদাদিকে স্বকৃত অপরাধের ফল বলিয়া বুঝিতে পারিব। মৃত্যুর পর জন্ম না থাকিলেও কোনরূপ শাস্তি আছে এ কথা আমরা বিশ্বাস করি কি করিনা? আমরা কি কাহাকেও মৃত্যুর পর দণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি? যদি এ কথা আমাদের বিদিত হই তবে পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি বিশেষতঃ কেন জানিব না? অতএব বুঝিলাম যে আত্মবিস্মরণ অতীব প্রয়ো-জনীয়, এবং শাস্তির ফলোৎপাদনে বিঘ্ন-কারী নহে। দ্বিতীয় কথা আত্মাই যখন স্মৃতির আধার তখন স্মরণশক্তির লোপ কিরূপে সম্ভবে? সত্য, আত্মাই স্মরণাধার; কিন্তু আত্মা যে অবস্থাতে আমাদের দেহে এক্ষণে আছেন তাহাতে তাঁহার স্মরণ অন্যান্য শক্তির ন্যায় দেহসাপেক্ষ। এ বিষয়ে এই দুইটি প্রমাণ আমরা দিতে পারি। (১) আত্মাই বুদ্ধি ও জ্ঞানের আধার কিন্তু মস্তিকে প্রচণ্ডাঘাত আমাদের চেতনাহানি ও কখন কখন উন্মাদ করে। বুদ্ধি ও জ্ঞান বিষয়ে দেহসাপেক্ষ হইয়া স্মরণ বিষয়ে আত্মা কিরূপে অন্যবিধ হইবেন? (২) আমরা গাঢ় নিদ্রায় জিজ্ঞাসিত হইলে কখন কখন প্রশ্নোপযুক্ত উত্তর প্রদান করি কিন্তু নিদ্রাব-সানে এই উত্তরের বিন্দু বিসর্গ স্মরণ থাকে না; কারণ এই উত্তরে দেহ আত্মাদ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্ম্ম নহে। (এস্থলে বলা আবশ্যক যে আমরা ঘুমাইলে আত্মা ঘুমায় না—ইহার যথেষ্ট উদাহরণ Sir William Hamilton এ পাওয়া যায়) এ বিষয়ে আর একটি কথা এই যে মাতৃগর্ভবাস ও ভূমিষ্ঠ হওনান্তর একবর্ষকাল-স্মরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি এ জগতে নাই। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আত্মার একত্ব হইলে ও আত্মা স্মৃতির আধার হইলে ও দেহের অবস্থা বিশেষে আত্মবিস্মৃতি সম্ভব। কয়েক বর্ষান্ত দেহের পরিবর্ত্তন বিষয়ে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সহসা পরিবর্ত্তন ও ক্রম বিকার অতি ভিন্ন পদার্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যদি স্মরণাদি ব্যাপারে

আত্মা দেহের সাহায্য চায় তবে যে পূতাত্মার পুনর্জন্ম হইবে না, সে কি স্মরণাদি বিহীন হইবে অর্থাৎ লোপ পাইবে ? না, কখনই না। আমরা বলিয়াছি যে আত্মা যে অবস্থায় আমাদের দেহে আছেন সেই অবস্থায় তিনি স্মরণাদিতে দেহের সাহায্য অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ যে আত্মা মনুষ্যদেহনিবাসি তিনি এত শুদ্ধ ও উন্নত হয়েন নাই যে দেহের সাহায্য বিনা সকল কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু যে অবস্থাতে তাঁহাকে আর নর দেহে প্রবেশ করিতে হইবে না তাহাতে তিনি নিজেই স্মরণাদির আধার ও পরিচালক। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মা নিজ জন্মসমূহ একত্রে দেখিতে পাইবেন। আত্মা যে এই জীবনেই কোন কোন অবস্থায় অদ্ভুত স্বকীয় দেহের ইন্দ্রিয়াতীত স্মরণশক্তি প্রাপ্ত হয় তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। আমরা স্থানাভাবে তাহা আর দিলাম না। সহৃদয় পাঠক Sir W. H. এর Philosophy পড়িবেন। নিদ্রা যেমন মৃত্যুর ছায়া সেইরূপ এই অদ্ভুত ক্ষমতা বিকাস আত্মার চরম ইন্দ্রিয়-সাহায্য-নিরপেক্ষ ক্ষমতাব্যঞ্জক চিহ্নমাত্র।

এস্থলে একজন্মবাদী বলিতে পারেন যে আচ্ছা না হয় পুনর্জন্ম সম্ভব হইল ; কিন্তু (direct) প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে হঠাৎ একটি কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়। স্বীকার করা যাইতে পারে যে, সকল বিষয় প্রমাণ হয় না কিন্তু যে সকল বিষয় সকলেই একমতে মানেন, তাহারই প্রমাণ হয় না ও আবশ্যক নাই। পুনর্জন্ম সেরূপ নহে। বিষয়টি দুর্বোধ অতএব প্রমাণাপেক্ষ। যে ব্যক্তি কোন নূতন বস্তুর অস্তিত্ব স্থাপন করিবেন প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর। আমরা খালি "নাই" বলিয়া নিশ্চিন্ত হইব।

অবশ্য। আমরা প্রমাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু "ক খয়ের সমান, খ গয়ের সমান খ ঘয়ের সমান অতএব ক ঘয়ের সমান" এরূপ প্রমাণ আমরা দিতে পারিব না। মৃত্যুর পর, জন্মের পূর্ব্ব বিষয় লইয়া আলোচনা হইলে ওরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করা মনুষ্য সাধ্যাতীত। তবে আমরা যেরূপ প্রমাণ প্রদান করিতে প্রস্তুত ও সক্ষম তাহা যে বিশুদ্ধ ও সুধীগণ গ্রাহ্য সেই বিষয়টী আমরা অগ্রেই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছি।

আমরা নিউটনের গতির প্রথম নিয়মটি সত্য বলিয়া স্বীকার করি কেন? তিনি বলেন "কোন বল কার্য্য না করিলে একটি দ্রব্য অনন্তকাল চলিতেই থাকিবে।" আচ্ছা আমরা কি এরূপ বস্তু দেখিতে পাই? না (Experiment) পরীক্ষা করিতে পারি? কারেরা লিখেন যে যতই মসৃণ দ্রব্যের উপর আর একটি জিনিষকে চালাইয়া দেওয়া হয় ততই তাহা অধিকক্ষণ চলে। এই কি চির গতির যথেষ্ট প্রমাণ? এরূপ প্রমাণে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা যাইতে পারে। স্বীকার করি যে জমীতে একটি মার্বেল গড়াইয়া দিলে সে যতদূর যায় একখানি কাঁচের উপর গড়াইয়া দিলে তদপেক্ষা অধিকদূর গিয়া থামিবে। একখানি ঘোড়ার গাড়ি চালাইয়া ছাড়িয়া দিলে রাস্তার উপর নিজ বলে অতি অল্পক্ষণ চলিয়াই থামিবে কিন্তু রেলের উপরিসংস্থাপিত একখানি কলের গাড়ি ঐরূপ করিলে সে অনেক-

ক্ষণ চলিয়া থামিবে। কিন্তু এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যে "কোন বল না থাকিলে চিরকাল চলিবে" এ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়। বোধ হয় খুব ভাল করিয়া যন্ত্রাদি স্থাপন করিলে একদিন কোন যন্ত্রকে ঐরূপ চালাইতে পারা যায়। কিন্তু এক দিন দেখিয়া অনন্ত কালের কথা বলা কতদূর সাহসের কার্য্য! অধিকন্তু আমরা প্রতিবারই সীমা দেখিতে পাই এবং সর্ব্বদা শক্তির সীমা দেখিয়া অসীম স্থির করা কি সঙ্গত? গতি স্থান যত মসৃণ ... ক্তি ততই দীর্ঘ স্থায়ী হয় এই দেখিয়া ... হয় বলিব "বল না থাকিলে গ... হইবে শত বৎসর থা... কথা কেমন করিয়া ব... "উক্ত ব্যাপার সকল ... ঙ্গ চলন নিয়ম" (nature's ... inuity) অনুসারে আমি বলিতে... স্থায়ী।" কিন্তু আমি বলি আপনি ... বলিতেছেন; কারণ "অভঙ্গ চলন নিয়ম ... আমরা নিউটনের গতির নিয়ম ও ... নিয়ম দর্শন করিয়াই স্থির করিয়াছি সুতরাং উপস্থিত ব্যাপারে তাহার সাহায্য লইতে পারিতেছি না। অধিকন্তু অভঙ্গ চলনের ব্যতিক্রমে আমরা একটি উদাহরণ দিতে চাই। নিয়ম—পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে দূরত্বের বর্গানুসারে ধরার আকর্ষণ বল হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই নিয়মটি মনে করুন সূর্য্য হইতে কোন দেবযোনি দেখিলেন, দেখিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পার্থিব বল উক্ত নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ধরাধামে পৌঁছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি ধরাকেন্দ্রে গমন মনন করিলেন ও খাদ খনন করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রবেশ মাত্র দেখিলেন আকর্ষণ শক্তি কিঞ্চিৎ কমিল, তিনি নিম্ন গমন করিলেন, আরও কমিল। ক্রমে যখন কেন্দ্রে গেলেন দেখিলেন আকর্ষণ শক্তি নাই, সূর্য্য মণ্ডলে যাহা ছিল তাহাও নাই। ইহা সত্য যে আপাতত 'ভঙ্গ সদৃশ প্রতীয়মান নিয়মটি' কেবল অপর বড় একটি নিয়মের ফল মাত্র এবং সেই বড় নিয়মের স্থায়িত্বই এই ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নিউটনের ১ম নিয়ম যে কোন আর একটি বড় নিয়মের ফল বা অংশ নয় এবং তাহার স্থায়িত্ব কোথাও ইহার ভঙ্গের কারণ হইবে না, তাহার প্রমাণ কোথায়?

পাঠক মহাশয় বোধ হয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন ও মনে করিতেছেন কি আপদ! তুমি কি বলিতে চাও নিউটনের নিয়মের প্রমাণ নাই অতএব বৃথা? আর মাথা মুণ্ডু ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন? পুনর্জন্ম আছে কিনা এ বিচারে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ কেন?" মহাশয় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। নিউটনের নিয়ম অভ্রান্ত তাহা আমরা লক্ষবার নত শিরে স্বীকার করি; কিন্তু তাহার প্রমাণ ভিন্ন প্রকারের। আমরা যে এই কথা পাড়িয়াছি তাহার কারণ আমাদের পুনর্জন্মের প্রমাণ নিউটনের ১ম নিয়মের প্রামাণ্যাপেক্ষা বড় অধিক ক্ষীণবল বা নীচ নহে। এবং নিবেদন করিতে চাই যে আমাদের প্রমাণের দ্বারা আপনি অবজ্ঞা করিবেন না।

এক্ষণে দেখা যাউক গতির ১ম নিয়মের যথার্থ প্রমাণ কি? বিশেষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ও

সকল বিষয়ে প্রযোগ্য) প্রমাণ এই যে "উক্ত নিয়ম যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া অঙ্কাদি অকাট্য ও নিশ্চিত শাস্ত্র এবং ন্যায় যুক্তি দ্বারা উহা হইতে ফল নিষ্কাষণ কর, এবং সেই ফলযথার্থ উক্ত বিষয়ক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের সহিত মিলাও। যদি সম্পূর্ণরূপে মিলিল ও অন্য কিছুতেই সেরূপ মিলিল না তবেই নিয়ম যথার্থ। দ্বিতীয়তঃযাহাহউকউক্ত বিষয়ক কোন ব্যাপার গ্রহণ কর ও দেখ যে ইহা ঐ নিয়মের ফলমাত্র কি না, যদি সকল ব্যাপারই এইরূপে পরীক্ষিত ও ফল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল তবেই নিয়ম সত্য"। শুধু নিউটনের নিয়ম কেন "মাধ্যাকর্ষণ" "আলোকের ঢেউ খেলান গতি" "চুম্বকের তাড়িত গতি সমষ্টিত্ব" ইত্যাদি অগণ্য বিষয় এইরূপ প্রমাণে স্থিরীকৃত। অতএব এই প্রমাণ নিন্দনীয় নহে, যথার্থ ও ন্যায়শাস্ত্র সঙ্গত। আমরা এই পথই যথাসাধ্য অবলম্বন করিব।

পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনাঢ্য কেহ দরিদ্র, কেহ গাড়ি চড়ে, কেহ অশ্ব চালনা করে, কেহ পাল্কী চড়ে কেহ বাহক। কেহ সুন্দর চির বসন্ত বিরাজিত কাশ্মীরাদি দেশে বাস করে। কেহ নিদাঘতপ্ত অগ্নিকণারাশি সম বালুকাপূর্ণ জলহীন মরুভূমিতে থাকে। কেহ অজ্ঞান কেহ বিদ্বান কেহ বুদ্ধিমান কেহ নির্ব্বোধ। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক জন সুন্দর বলবান ও গুণসম্পন্ন অপর জন কুৎসিত দুর্ব্বল রুগ্ন ঈর্ষ্যান্বিত ও ক্রোধি। একজন মূর্খ হইয়াও ধর্ম্মশীল আর এক জন অদ্বিতীয় বিদ্বান হইয়াও অতি হেয় বৃত্তিশালী। এই সকল বিভিন্নতার কারণ কি? মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন; সুখ দুঃখাদি ত কিছুই নয়। জীবন পরীক্ষা কাল মাত্র। পৃথিবীতে যে যেমন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করুক না কেন সেই অবস্থায় সে যদি ঐশ্বরিক নিয়মাদেশাদি অনুসারে চলে ত তাহার চরমে মঙ্গল হইবে। আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক একই নিয়মে বিচারিত হইবে কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মে হইবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে বিচার হয় তবে প্রত্যেক নর নারীর জন্য এক একটি নিয়ম আবশ্যক। তাহা হইতে একেশ্বর ব্যঞ্জক জগতে একের মাহাত্ম্য কৈ রহিল। এবং নীতিসম্বন্ধীয় নিয়ম ও নীতিশাস্ত্র অসম্ভব হইল। কিন্তু জগৎ নীতি...য। এক ঈশ্বর স্বজিত একই নিয়ম সমস্ত সৃষ্টি শাসন করিতেছে একথা সকলেই স্বীকার করেন। এখন বলি যদি সকলের বিচার এক নিয়মেই হইবে তবে সকলকে প্র...মে একইরূপ অবস্থা দেওয়া হইল না কেন? অবস্থার অনেকাংশে লোককে ভাল মন্দ করে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। যদি কাহারও থাকে তবে তাঁহাকে বলি,—মনে করুন দুই সমান ধর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন রাজকুমার অপর জন ডাকাইতের সন্তান। রাজকুমার সৎ সহবাস পাইলেন তাঁহার শিক্ষার জন্য সদ্গুরু নিয়োজিত হইল। তাঁহার পিতার ধর্ম্মকার্য্য সর্ব্বদা তাঁহাকে সদাদর্শ দেখাইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মবৃত্তি ক্রমশই বলবান হইতে লাগিল। এদিকে দস্যুপুত্র পিতার ভীষণ হত্যাকাণ্ডে উল্লাসিত না হইলেও অভ্যস্ত হইল। এবং

বাল্যকালাবধি দর্শনে ও সদুপদেশাভাবে হত্যা যে অন্যায় কার্য্য তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল না। তাহার ধর্ম্মবৃত্তি এক ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে ভাবিল যে তাহাকে এই প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করে সেই তাহার দেবতা এবং তদনুরূপ দেবতা গঠনপূর্ব্বক তাহারই পূজা আরম্ভ করিল। তাই বলি—অবস্থার লোককে অনেকাংশে ভাল মন্দ করে। আর যদি তাহাই হইল তবে এই অবস্থাভেদে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হায় এই কি মনুষ্য বুদ্ধি! এই বিজ্ঞান এই পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও শিক্ষা ঈশ্বর পক্ষপাতী। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে আমরা অবস্থাভেদের কারণ দেখাইব যে, যে পূর্ব্ব জন্মে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে সে সেইরূপ জন্মিয়া সেই জন্ম হইতে কাটিয়া উঠিতে পারে ভালই নহে পুনরায় ভাল বা তদপেক্ষা হীনতর জন্ম পাইল। আবার চেষ্টা করুক, না পারিয়া উঠে আবার পড়ুক আবার জন্মাক এইরূপে যত দিন আত্মোন্নতি না করিতে পারে তত দিন পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করুক ও পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফল ভোগ করুক। একণে কথা উঠিতে পারে যে প্রথমবার জন্মগ্রহণ করিবার সময় অবস্থাভেদ হয় কেন? তাহাতে কি জগৎপিতা পক্ষপাতী দোষে দূষিত হন না? আমরা এই উত্তর দি যে প্রথম জন্মে সকলেই একভাবে জন্ম গ্রহণ করে, এক অবস্থায় এক মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং স্বইচ্ছা অনুসারে অন্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল বা মন্দ হয়। এখন হইতে কর্ম্মফল আরম্ভ হইল এবং আর বলিবার আবশ্যক রহিল না। তবে এই টুকু দরকার যে সর্ব্বজন্মেই স্বইচ্ছা চলিতেছে। এবং বহু জন্ম পর যে ফল হয় সে কেবল বহুদিন ব্যাপী স্বইচ্ছার কার্য্য ফল সমষ্টি। দেখা গেল যে পূর্ব্বজন্ম মানিলে অবস্থাভেদ বিষয়ক জটিল বুদ্ধির অগম্য প্রশ্নসকল অতি সহজে বুঝা যায়। অন্য কোন মতে এইরূপ হয় না।

অবস্থাভেদের ন্যায় আরও অনেক বিষয় পুনর্জন্ম মত দ্বারা বিশেষ বুঝা যায় এবং অন্য কোনরূপে তাহাদের পার্থিব অন্যান্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না। তন্মধ্যে দুই একটি না বলিয়া থাকা যায় না। এখন কথা শিশু জন্মিয়াই স্তন্য শোষণ করে কেন? কে তাহাকে শিখাইল? "ঈশ্বর শিখাইলেন" একথা বলিলে কোন উত্তর হইল না কারণ "ঈশ্বর কৃত" বলিয়া সমস্ত দ্রব্যই ছাড়িয়া দেওয়া যায়। কোন শাস্ত্রাদিরই প্রয়োজন হয় না। দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন কেন হয়? "—ঈশ্বর করেন। বৃষ্টির কারণ কি? ঈশ্বর। মেঘে বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসিল ঈশ্বর রাখিয়াছেন। এরূপ ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে সকল বিষয়ই অতি সহজ হয়। অতএব "ঈশ্বর শিখাইলেন" এটি ন্যায় সঙ্গত প্রত্যুত্তর নহে। কারণাবধারণ আবশ্যক। কারণ পাওয়া দুষ্কর। কেহ বলিবেন উহা দেহধর্ম্ম বা পাশব শক্তি বিশেষ (instinct) কিন্তু এটি কোন যুক্তি সিদ্ধ উত্তর নহে। নাম করণ মাত্র। আমাদের মতে এই শোষণ ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রাক্তন সংস্কার। অন্য জন্মান্তরে জীব যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে

যেরূপ জীবন ধারণ করিয়াছে; যে যে অভাব ভোগ করিতেছে সে সকল স্মরণ না থাকিলেও আত্মাতে তাহাদের এক প্রকার সংস্কার জন্মে, ও সেই সংস্কার আত্মার নিত্য সঙ্গী। জীব সর্ব্বজন্মেই শোষণ করিয়াছে। বৃক্ষ জন্ম শোষণ মাত্র করিত। সমস্ত জীব জন্মের প্রথমাবস্থায় মাতৃ স্তন্য শোষণ করিতে ও বর্দ্ধিত অবস্থায়ও দুই একটি ভিন্ন জীবকুল পানীয় শোষণ করে। সুতরাং শোষণ সংস্কার হইয়া পড়ে। এস্থলে দুইটি কথা উঠিতে পারে। প্রথম এই যে স্মরণ বিলোপেও সংস্কার সম্ভাবনা কি না? দ্বিতীয়তঃ প্রথম জন্মে শোষণ কে শিখাইল? সংস্কার কোথা হইতে আসিল? প্রথমটীর উত্তরে এই বলা যায় স্মরণ বিনা সংস্কার সম্ভব ও সংস্কারই স্মরণাভাবে জীবের সহায় এবং স্মরণ থাকিলে সংস্কারের কোন আবশ্যক করে না। আরও, "সংস্কার গুপ্ত স্মরণ মাত্র" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কার সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ আমরা দিন দিন দেখিতে পাই। নিদ্রিতাবস্থায় অনেক সময় গায়ে মশা কামড়াইলে আমরা তাড়াইয়া দিই। কেহ কোন অঙ্গে আঘাত করিলে সেই অঙ্গ সরাইয়া লই। কেন? প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়, সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই তাহা বলিয়া প্রতিক্রিয়া এইরূপেই বা হইবে কেন? সংস্কার বশতঃ নয়? পুনরায় দারুণ জ্বরাদিতে সময়ে সময়ে অতি বিচিত্র ঘটনা দেখা যায়। যে সকল ঘটনার বিন্দুবিসর্গও রোগীর স্মরণ নাই ও স্মরণ থাকিতে পারে না সেইসকল ঘটনা তাহার স্মৃতি পথে উজ্জ্বলভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি স্মরণ সংস্কারভাবে অন্তরে অবস্থিতি না করিত তাহা হইলে এই পুনরুদ্দীপন কেমনে সম্ভবে? আবার ভাবিয়া দেখুন সংস্কারের পূর্ণোদয়ের নামই জ্ঞান। ঠিক কোন সময়ে কিরূপে যে শিখিয়াছিলাম যে দুই আর দুই যে চার তাহা জানি না কিন্তু জ্ঞানটি আছে। অতএব ২+২=৪ এটি স্মরণের ফল হইতে পারে, গুপ্ত স্মরণ হইতে পারে, কিন্তু স্মরণ নহে। যখন প্রথমবারের কথাই মনে নাই তখন স্মরণ করিয়া রাখিব কি? সুতরাং ২+২=৪ এটি জ্ঞান, স্মরণ নহে। দেখুন স্মরণ, সংস্কার, জ্ঞান একই রূপের পদার্থ। জ্ঞান সংস্কারের পূর্ণ বিকাশমাত্র এবং স্মৃতির অভাবে জ্ঞান এবং জ্ঞানাভাবে সংস্কার থাকিতে পারে এবং থাকেও। প্রথম প্রশ্নটি আমরা উত্তর দিয়াছি কিন্তু জিনিষটা আরও সুগম্য করিবার নিমিত্ত বলিয়া রাখি যে জ্ঞান ও সম্পূর্ণ স্মরণ, উন্নত সম্পূর্ণ নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্ম; এবং সংস্কার মাত্রই মলিন আত্মার গুণ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রথম শোষণ। আমরা প্রথম জন্মে শোষণ কিরূপে শিখিলাম বা জানিলাম? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে আমাদের পুনর্জন্ম বিবরণ কিঞ্চিৎ বলা বিধেয়। প্রথম যখন আত্মা অতি মলিন ও কুঞ্চিতভাবে বিকাশার্থ ধরাধামে প্রেরিত হইল তখন সে হীন ক্ষুদ্র শৈবালাদি মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। শোষণের আবশ্যক নাই কৈশিক আকর্ষণ আহার যোগায়। দ্বিতীয় জন্মে একটু ভাল কিছু হইল। ক্রমে বৃক্ষ হইল। বীজাবস্থায় কৈশিক আকর্ষণ

তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে এক্ষণে বর্দ্ধিতাবস্থায় সে ক্রমে উক্ত শক্তিকে বিধিমতে উপযুক্ত স্থানে শিকড়প্রেরণাদি দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিল। দেখুন তবে ক্রমেও অতি অল্পে অল্পে জীব পোষণ শিখিবার উপক্রম মাত্র করিল। ক্রমে বৃক্ষ হইতে অতি ক্ষুদ্র জীব হইল ও ক্রমে বড় জীব হইল সুতরাং পোষণ শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ক্রমে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইল; সহসা উদ্ভাবন বা দানের প্রয়োজন হইল না। এখন পোষণ বলিবা কিছুই রহিল না। বাস্তবিক প্রথম জন্মে শৈবালাদি অবস্থায় আমরা পোষণ করি না।

যদিও আমরা অনেক স্থান লইয়াছি তথাপি আর দুইটি কথা বলিব। আমরা সকলেই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই সকল বিষয়কেই সাধারণ করিতে এত চেষ্টা করি কেন? একশত ব্যক্তিকে দেখিলাম যে তাহারা জন্মের তারিখে মরিয়াছে অমনি বলিলাম লোকে জন্মদিনে মরে। আমার পরিবারে সাত জন ক্রমান্বয়ে পরে পরে সাত বৎসরে মরিল আমি বলিলাম আমার সংসারে প্রতি বৎসর এক জন করিয়া মরে। এ ত হইল আমার মত মূর্খ লোকের কথা। বড় লোকেরা এই বিষয় কি করিয়াছেন একবার দেখা যাক্। অস্মদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা সাতটি গ্রহের সহিত সাতটি ধাতুর সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পিথাগোরসের শিষ্যগণ এই সংখ্যার বিলক্ষণ অনুযোগীতা দেখাইয়াছেন। জেনিসিসে সাত দিনের কথা আছে; সাত মাসে শিশুর দাঁত উঠে, সাত বৎসরে আবার পড়িয়া উঠে; মনুষ্যের উচ্চতা সাত ফিটের অধিক নয়। গ্রীসে সাত জন জ্ঞানী ছিল। পৃথিবীতে সাত আশ্চর্য্যজনক বস্তু আছে। থিবে সাতটি তোরণদ্বার ছিল, সাত জন যোদ্ধায় থিব জয় করেন। আমাদেরও সপ্ত সমুদ্র। সাতের এই সকল দেখিয়া অনেক বিষয়ে পণ্ডিতেরা সাত চালাইয়াছেন এবং তাহার ফল আজিও বর্ত্তমান। দেখুন ৭×২=১৪ বৎসর বিবাহকাল ৭×৩=২১ সাবালক হইবার সময়। নব দর্শন এই দুই (১৪ এবং ২১) অবহেলা করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে ৭ এর কিছু মাহাত্ম্য নাই। কিন্তু এখনও বিশ্বাস সকল মন হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। কেপ্‌লার ১১ বৎসর কাল সংখ্যা মূলক সাদৃশ্য আলোচনায় বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। শুধু এই নয় এবম্বিধ সাধারণ করিতে চেষ্টা সর্ব্বদা ও সকল মনুষ্যে অতি তীব্র ভাবে আছে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে এক্ষণে আমরা জানিতে চাই যে এই বৃত্তি এত বলবান্ হইল আমাদের হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল। দেখিয়া শুনিয়া হইতে পারে না কারণ ক্ষুদ্র বালকও একবার হাত পুড়িলে পুনরায় অগ্নি স্পর্শ করিতে ভয় করে। সে ত আর বহুদর্শিতায় শিখে নাই। সে শিখিল কেমন করিয়া? আমরা বলিতে চাই যে ইহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার। মনুষ্য জন্মের পূর্ব্বে বহু জন্মে আমরা বরাবর স্বভাবের একভাব (uniformity) দেখিয়াছি। সুতরাং সেইরূপ সংস্কার লইয়া জন্মাইয়াছি। আমাদের কথার প্রমাণ স্বরূপ আবার বলি নিউটনের ১ম নিয়মের কিয়দংশ আমাদের নিকট স্বতসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় আর

কিয়দংশ বুদ্ধি বিবেকের বহির্ভূত বলিয়া জ্ঞান হয়। দুই অংশই সমান কঠিন। দুইটিই সমান ও একই প্রমাণাপেক্ষ। দুইটিই সমান সাধারণ। নিউটন বলেন যে বলাভাবে বস্তু অনন্তকাল স্থিরভাবে থাকিবে অথবা একভাবে সরল রেখায় চলিবে। যে কোন ব্যক্তি প্রথমবার এই কথা শুনিবেন তিনিই প্রথম কথা জানা বিষয়ের ন্যায় গ্রহণ করিবেন ও দ্বিতীয় কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। এরূপ হয় কেন? পুনর্জন্ম এটি বেশ বুঝাইতে পারে। মনুষ্য জন্মের পূর্ব্বে অন্যান্য জন্মে ও অসভ্য মনুষ্য জন্মে কেহ কখন অনন্ত গতি দেখে নাই ■ সে বিষয়ে চিন্তা করে নাই সুতরাং অনন্ত গতির সাপক্ষে কোন সংস্কার [illegible] নাই বরং তাহার বিপক্ষে দৃঢ় কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা চক্ষের উপর দ্রব্যাদির স্থিরতা অর্থাৎ গতিহীনতা দেখিয়া অনন্ত স্থিরতা বিষয়ে সংস্কার দৃঢ় মূল হইয়াছে। সুতরাং আমরা সহজেই উক্ত নিয়মের একাংশ বিশ্বাস ও অপরাংশ অবিশ্বাস করি। বিবেচনা করুন অন্য কোনরূপে এই সকল বিষয়ের এমন সামঞ্জস্য হয় না। যদি বলা যায় যে শাস্ত্রের উন্নতির জন্য ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে সাধারণ করণেচ্ছা এত প্রবল করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা প্রথমতঃ অন্যের ন্যায় যদি বলি যে "ঈশ্বর দিয়াছেন" "ঈশ্বর করিয়াছেন" তাহাহইলে যথার্থ কারণ দেখান হয় না। ঈশ্বর সকলি করেন কিন্তু সাংসারিক কারণ সদাই উপস্থিত। সে কারণ নির্ণয় না করিতে পারিলে অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ করণেচ্ছা নিউটনের নিয়মের দ্বিতীয়াংশ (অর্থাৎ এক্ষণে আমরা যাহাকে দ্বিতীয়াংশ বলিয়াছি) সম্বন্ধে একবারে লোপ কিরূপে পাইল?

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন যে পুনর্জন্ম স্বীকার করিলে অনেকানেক দুর্ব্বোধ বিষয় সুগম হয় অর্থাৎ যে সকল বিষয় সাধারণ সাংসারিক নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহারা নিয়ম রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

গার্গি।*

ব্রহ্মচৈতন্য।

গার্গি আচার্য্যকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে গুরো! আপনারা নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহার আকার নাই; তাঁহাকে আমি কিরূপে ধ্যান করিব?"

আচার্য্য উত্তর করিলেন, "হে গার্গি! নিরাকার ব্রহ্ম বলিলে, ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হইল না। হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা দুই

* ব্রহ্মজিজ্ঞাসু স্ত্রী।

প্রকার আছে। যথা সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যান হয় না। যেহেতু নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে ধ্যান করা যায় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যান আছে, কারণ গুণ বিশিষ্ট ব্রহ্মের গুণোদ্ভূত কোন সত্তা দেখিয়া তাঁহাকে ধ্যান করা যাইতে পারে। শরীরী আত্মা সেই সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পরম শান্তি সুখ উপভোগ করেন।"

গার্গি কহিলেন, "হে গুরো! ব্রহ্ম কি, এবং নির্গুণ [redacted] সগুণ ব্রহ্মই বা কিরূপ? তাহা আমাকে বিজ্ঞাত করিয়া কৃতার্থ করুন।"

আচার্য্য উত্তর করিলেন, "হে গার্গি! পরব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ বা প্রাণ স্বরূপ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই যে ব্রহ্ম-চৈতন্য বা পূর্ণ জ্ঞানশক্তি বা মহাপ্রাণ বা পরমাত্মা, ইনি নিজে বা স্বতন্ত্র ভাবে আকার বা শরীর বিহীন, সুতরাং ব্রহ্ম-চৈতন্য যিনি, তিনি স্বয়ং নিরাকার; বস্তুতঃই যিনি জ্ঞানময়, চৈতন্যময় ও প্রাণময় মহাত্মা তাঁহার কোন জড় পদার্থের ন্যায় আকার নাই, সুতরাং এই শুদ্ধ রূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যকে কেহ স্বতন্ত্র ভাবে ধ্যান করিতে পারে না। তবে যখন এই ব্রহ্ম-চৈতন্য কোন শরীরী আত্মার বা জড় জগতের অভ্যন্তরে ব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করেন, তখনই লোকে তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে। এই [redacted] চৈতন্যের স্বয়ং ও স্বতন্ত্র ভাবকে বা অব্যক্ত ভাবকে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং [redacted] ভাবকে সগুণ ব্রহ্ম কহে।

"শাস্ত্রকারেরা কহেন, যখন এই জগৎ সৃষ্ট হয় নাই [redacted] যখন [redacted] চৈতন্য স্বতন্ত্র রূপে ও অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণপনা (সৃজন শক্তি) অপ্রকাশিত ছিল, বা ব্রহ্মতেই লুক্কায়িত ছিল, তখনই তিনি নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আখ্যাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, তাঁহার সৃজন শক্তি বিস্তার করাতে সগুণ ব্রহ্ম রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যে কেহ তাঁহাকে ধ্যান করেন, তিনি এই সৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্মের এই ব্যক্ত শক্তিকে ধ্যান করেন। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে মহাশক্তি বা প্রাণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নামই ব্রহ্ম চৈতন্য।

সাকার [redacted] জড়ের উপাসনা।

গার্গি কহিলেন, "হে গুরো ব্রহ্ম চৈতন্য কি তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যের বা ব্রহ্ম শক্তির ব্যক্ত এই ব্যক্ত জগৎ, তবে কি আমি এই ব্যক্ত জগৎকে ব্রহ্ম চৈতন্য বা ব্রহ্ম শক্তি বলিয়া চিন্তা করিব, এবং তাহা হইলেই কি ব্রহ্মের চৈতন্যময় রূপকে ধ্যান করা হইল?"

আচার্য্য উত্তর করিলেন, "না। সৃষ্টিকে চিন্তা করিলে ব্রহ্ম-চৈতন্যকে বা ব্রহ্ম শক্তিকে চিন্তা করা হইল না, যেহেতু সৃষ্টি ব্রহ্ম শক্তির নিদর্শন স্বরূপ। শক্তির নিদর্শন নিজে শক্তি নহে। সুতরাং সৃষ্টিকে বা কোন সৃষ্ট পদার্থকে চিন্তা করিলে সৃষ্ট বস্তুকেই চিন্তা করা হইল সৃষ্টিকর্ত্তাকে চিন্তা করা হইল না, এরূপ সৃষ্টবস্তুর উপাসনাকে জড়ের উপাসনা কহে। আর সৃষ্টিকে বা কোন সৃষ্ট পদার্থকে অবলম্বন করিয়া ইহার কারণকে চিন্তা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে বা ব্রহ্ম চৈতন্যকে চিন্তা করা

হইল। এই সৃষ্টির বা সৃষ্ট বস্তুর সহিত কারণকে চিন্তা করার নাম সাকার* উপাসনা। যাঁহারা অজ্ঞ ও স্থূলদর্শী এবং যাঁহারা সর্ব্বগুণময় নিরাকার ব্রহ্ম চৈতন্যকে চিন্তা করিতে পারেন না, তাঁহারা সেই ব্রহ্ম শক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহারই সৃষ্টি বা সৃষ্ট পদার্থকে চিন্তা করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা সৃষ্টি নিদর্শনের অভ্যন্তর দিয়া, স্বতন্ত্র ভাবে সেই মহাশক্তির বা মহা চৈতন্যময়ের পরিচয় পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাকেই ধ্যান করেন।"

গার্গি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গুরো! রূপ ব্যতীত কোন নির্দ্দিষ্ট গুণকে কি চিন্তা করা যায়?"

আচার্য্য উত্তর করিলেন, "হে গার্গি! যেমন কোন জড়পদার্থের বাহ্যাবয়ব ব্যতীত রূপ হয় না এবং কোন রূপকে চিন্তা করা যায় না, তদ্রূপ কোন বস্তুর বা জড়পদার্থের সত্তাব্যতীত গুণও হয় না এবং কোন গুণকেও চিন্তা করা যায় না। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাকোষের অভ্যন্তরে সর্ব্ব গুণাবয়ব ব্রহ্মচৈতন্যের সকল গুণই নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত মঙ্গলভাব, দয়া, শান্তি ও ন্যায় প্রভৃতি সমস্ত গুণেরই উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, জ্ঞানবান ব্যক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মের গুণময় মূর্ত্তি একাধারে ধ্যান করেন।

গার্গি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গুরো! আপনি কহিলেন যে, সৃষ্টিকে বা সৃষ্ট বস্তুকে চিন্তা করিলে ব্রহ্মচৈতন্যকে চিন্তা করা হয় না। কিন্তু শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ববস্তুতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তবে সৃষ্ট বস্তুকে চিন্তা করিলে, ব্রহ্মচৈতন্যকে চিন্তা করা হয় না কেন?"

আচার্য্য। যেহেতু সৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মচৈতন্য নহে, একথা ত আমি পূর্ব্বেই বলিলাম। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু জড়পদার্থ, এবং ব্রহ্মচৈতন্য, আদি প্রাণ, আত্মা, বা আদি শক্তি। যেমন মনুষ্যের বাহ্য শরীর জড় পদার্থ এবং এই শরীরস্থ আত্মা বা প্রাণ বা চৈতন্য, ইহার শক্তিরূপে শরীরের সকল স্থানেই সর্ব্বব্যাপী ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; (চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত যে কোন স্থান স্পর্শ কর না কেন, স্পর্শ করিবা মাত্রই ইহার আভ্যন্তরিক একটী চৈতন্যের বা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়), তদ্রূপ এই জড়জগতের যে কোন পদার্থ দৃষ্টি কর না কেন, ইহার অভ্যন্তরে এক, মহান ও আদি শক্তি, সর্ব্বব্যাপিনীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; কিন্তু যদ্রূপ শরীরী আত্মা বা প্রাণ শরীর, হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ শরীর ও আত্মা উভয়েই ভিন্ন বস্তু, তদ্রূপ এই জড় জগৎও পরমাত্মা উভয়েই ভিন্ন বস্তু ও স্বতন্ত্র; সুতরাং জড়জগৎকে চিন্তা করিলে ইহার আভ্যন্তরিক সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে চিন্তা করা হয় না।

গার্গি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গুরো! পুরাণ নির্দ্দিষ্ট কল্পিত দেব দেবীর মূর্ত্তিতে ত গুণবিশিষ্ট ভগবানের গুণসমূহ সুস্পষ্টরূপ নিহিত আছে, সেই সকল কল্পিত দেবদেবীর

* আকারের সহিত উপাসনা।

মূর্ত্তি চিন্তা করিলে কি সর্ব্বগুণাকর ব্রহ্মকে ধ্যান করা হয় না ?”

আচার্য্য উত্তর করিলেন, “হে গার্গি! মানব কল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে সেই অনন্ত গুণাকর ভগবানের ভাব দর্শন করা অপেক্ষা ব্রহ্মশক্তির বিকাশরূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভগবানের মহাভাব গ্রহণ করা শ্রেষ্ঠ-পন্থা। যেহেতু মনুষ্যের সঙ্কীর্ণ কল্পনা-প্রসূত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে, মানবেরই কল্পনা শক্তি অনুযায়িক ভগবানের ভাব সঙ্কীর্ণ রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু জগদীশ্বরের মহাশক্তি প্রসূত এই বিস্তীর্ণ জগৎরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহারই মহাশক্তির অনন্ত ভাবসমূহ বিস্তীর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; সুতরাং মানবকল্পনাপ্রসূত ঈশ্বরের সঙ্কীর্ণভাব চিন্তা করিলে মানবাত্মা সহজেই সঙ্কীর্ণ ভাবাপন্ন হইয়া আত্মোন্নতির পথ অবরোধ করিয়া ফেলে, কিন্তু ভগবানের [redacted] শক্তি প্রসূত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অনন্ত [redacted] বিস্তীর্ণ মূর্ত্তি হইতে তাঁহারই অনন্তভাব চিন্তা করিলে, মানবাত্মা সহজেই আত্মোন্নতি করিতে সক্ষম হয় [redacted] দিন দিন তাঁহারই মহাভাব চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্য হইয়া সমাধি অবস্থা লাভ করিতে পারে। যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ এবং যাঁহাদিগের অন্তর্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই অর্থাৎ গুণ-বিশিষ্ট মহেশ্বরের গুণসমূহ অন্তর্চক্ষুতে দেখিতে পান না, তাঁহাদিগের পক্ষে বহিচক্ষু দ্বারা মানব কল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের শক্তি ও অপরাপর গুণসমূহ চিন্তা করিলে আশার অর্দ্ধেক ফলও হইয়া থাকে। যদ্রূপ দুই চক্ষুবিহীন [redacted] হস্ত স্পর্শদ্বারা হস্তীর আকার দর্শন করেন, তদ্রূপ অন্তচক্ষু বিহীন সাধক মানব কল্পনানির্দ্দিষ্ট ভগবানের গুণসমূহ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে দেখিয়া থাকেন [redacted] তাহাই ধ্যান করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

ভারতের ভাবী আশা।

কোন [redacted] জাতির পতন হইলে আর সে জাতির উত্থান [redacted] না, একথা অনেকের মুখেই শুনা যায়। এমন কি প্রাচীন ইতি-হাসকে আনিয়া সাক্ষী মানিবার চেষ্টা পান। কিন্তু একথা কতদূর সত্য কোন [redacted] জাতি পতিত হইয়া আবার উত্থিত হইতে পারে কি না এবিষয়ে প্রাচীন জাতীর অবস্থা রীতিমত চিন্তার সহিত আলোচনা করিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। বাস্তবিক জাতির পতন হইলেই আবার পুনরুত্থান হয় না একথা বলা বড় দুরূহ। ইতিহাস যতই আলোচনা করা যায় ততই মহাঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। হটাৎ এবিষয়ে কিছু বলা যায় না। ইতি-

তাসজ্ঞ পণ্ডিত প্রবর সার উইলিয়ম হান্টা-রের এই কথাটী অতি উপদেশপূর্ণ। ' To any one acquainted with the revolution of races, it must seem mere impatience to ever despair of a people. (Hunter's Orrisa vol 1 page 315) বাঙ্গালী-জাতির ভবিষ্যত আশা ভরসা কিছুই নাই একথা অনেকের মুখেই শুনা যায। যদি শিক্ষা, জ্ঞানের বিস্তার, ও মানসিক উৎকর্ষ জাতির উন্নতির প্রধান কারণনিচয় হয় তবে কিরূপে স্বীকার করি বাঙ্গালী জাতি উন্নতি সোপানে আর আরোহণ করিবে না? হইতে পারে আমাদিগের পূর্ব্বাবস্থা অতীব শোচনীয় কিন্তু কে বলিল যে আমাদের ভবিষ্যত, পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় মন্দ থাকিবে। এ জগতে এরূপ ও দেখা যায পিতা অধার্ম্মিক ও মূর্খ অথচ সন্তান ধার্ম্মিক ও বিদ্বান। অতএব কি সূত্রে কি ঘটে ইহা বলা দুরূহ। একেবারে কোন বিষয় নৈরাশ্য হওয়া কিছু নহে। কোন জাতি কি এক সময়ে পতিত হইয়া পুনরুত্থিত হইতে পারে না? যিনি যাহাই বলুন যদি আমরা একবার চিন্তাপূর্ব্বক এবিষয়ে আলোচনা করি দেশ-মধ্যে কি কাণ্ড চলিতেছে ইংরাজীশিক্ষায় ও ইউরোপীয়দিগের সহবাসে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তাহা হইলে আমরা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক, রাজ নৈতিক ও নৈতিক বিপ্লবের সহিত মিলিত হইব। ভয়ানক পরিবর্ত্তন। কোন পথ দিয়া আসিয়াছি আমরা কোন পথে আছি কোথা হইতে ছাড়িলাম বিশেষ স্থির চিত্তে অনুধাবন ব্যতীত কিছুই নিরাকরণ করা যায না। দেশমধ্যে সম্পূর্ণ এক নূতন ভাব দেখা দিয়াছে। আমাদিগের জীবনের পথ নানা বিধ হইযাছে। আকাঙ্ক্ষা বহুল পরিমাণে বাড়িযাছে ও তাহার সহিত আমাদিগের আশা-লতা, শাখা প্রশাখায হৃদযকুঞ্জকে আবৃত করিযা ফেলিয়াছে। আগ্নেয় গিরির ন্যায রাজনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক প্রভৃতির অগ্নিশিখা (Eruptions) উত্থিত হইতেছে। আমাদিগকে এখন নূতন অবস্থায নূতন ভাবে আনিযা ফেলিতেছে। মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিযা নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ আমরা নব নব ভাবে নব নব আশায় ও নব নব আকাঙ্ক্ষায ভূষিত হইতেছি। বাস্তবিক দেশমধ্যে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন চলিতেছে সামান্য দৃষ্টি দান করিলেই তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। উন্নত জাতির অনুসরণ দ্বারা পতিত জাতির ক্রমশঃ উন্নতির সহায়তা করে। নানা দেশের দেবতুল্য মহাত্মারা, জ্ঞানবিস্তারকেরা ও মানব জাতির হিতসাধকেরা আমাদিগের সংসার সমুদ্রের জীবন-উদ্দেশের ও উন্নতির পথ প্রদর্শক হইয়াছেন। আমাদিগের জাতি সংঘটনের নক্সাও যেন তাঁহাদিগের উক্তিমত—তাঁহাদিগের পরামর্শ মত ও তাঁহাদিগের উপদেশ মত [illegible] হইতেছে। উক্ত মহাত্মাদিগের জীবনের কার্য্য দেখিযা কেনা প্রশংসা করিবে? তাঁহাদিগের অসাধারণ পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা—দেশের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ—প্রশংসনীয স্বার্থ ত্যাগ

প্রভৃতি গুণগুলি সন্দর্শনে কাহার হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে? প্রত্যেক কার্য্যেই দেশহিত ব্রত প্রচার করিবার প্রয়াস ও তাহা অনুকরণ করিবার অনুরোধ ও আয়াশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ ঘটনা আমাদিগের নেত্র পথে স্বতঃই উপনীত হয়। সময় স্রোত এখন আমাদিগের কূলে। চাষিদিগের অবস্থা অতীব প্রীতিপ্রদ ও আশাজনক। শান্তি দেশমধ্যে বিরাজিত। লোকের এখন চিন্তা করিবার জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান শিক্ষার সময় উপস্থিত। দ্বেষ, হিংসা ও বৈরভাব তিরোহিত হইবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান পার্সি আরমাণী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় পরস্পর আর সে প্রকার হিংসা—সে প্রকার জাতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা বড় পরস্পরের সহিত করিতে দেখা যায় না। ধর্ম্মের অনুশীলন, স্বাধীন মত ও চিন্তা, জ্ঞানের প্রাধান্য ও আদর ক্রমশই বাড়িতেছে।

অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের মধ্যে যেন এক মহা কোলাহল উপস্থিত। নানা দেশের প্রগাঢ় মনিষীগণের ভাব ভারত ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া যেন এক নবযুগ সৃষ্টি করিতেছে। ভারত সমাজের [illegible] সম্প্রদায়ের লোক পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া নবযুগের ভাবানুযায়িক নূতন সমাজ গঠন করিতে যেন সকলেই প্রয়াসী। এই সেদিন বোম্বাই কলিকাতায় ও মান্দ্রাজে সকল সম্প্রদায়ের মহাসমিতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

আমরা এখন এই প্রকার অবস্থার মধ্যে ঘুরিতেছি। সমাজ মধ্যে এই প্রকার বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। যেন এক সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি। যেমন একটী মহারোগ উপস্থিত হইবার সময় সকল ব্যক্তির বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য কিম্বা মহারোগ হইতে উঠিয়া ঠিক যে অবস্থায় পড়ে (convalascene) সকলের যেমন সেই অবস্থায় সতর্কতায় চলা কর্ত্তব্য সেই মত আমাদিগের ও ঠিক এই সময় সাবধানে সভ্যতার মুখে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ এই সময়টিকে (Transition Period) বলেন। কিন্তু বোধ হয় ইহা আমাদিগের (convalascene) সময়, অর্থাৎ রোগ উত্তীর্ণের যথার্থ সময় বলিলে অন্যায় বলা হয় না।

সভ্যতা এখানে নানা কারণে যে সকল কারণে রোগে পতিত হয় তাহাই ঘটিয়াছিল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে সভ্যতা কি? এই কথাটীর অর্থ ব্যাখ্যা [illegible] এত দূর গুরুতর ও এরূপ নানা বিষয়ের সহিত মিশ্রিত যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ দেওয়া সুকঠিন। তবে এক কথায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব এখানে যতদূর আবশ্যক ও বাক্যের যে প্রকার অর্থ লইলে অশুভ অন্যায়রূপ বলা হয় না সেই প্রকার অর্থ বলিতে আমরা চেষ্টা পাইব।

সভ্যতা অর্থে আমরা এই বুঝি যে আমাদিগের জীবনকে প্রকৃত উৎকৃষ্টভাবে আনয়ন করা—সমাজকে পুষ্ট করা (Developed) ও মনুষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা।

আমাদিগের সমাজ মধ্যে এইগুলির চিহ্ন দেখা দিতেছে কি না অর্থাৎ আমাদের সমাজ ক্রমশ পুষ্ট (Developed) হইতেছে

কি না। আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় হইতেছে কি না সেইগুলিরই আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবত হইবে। এইরূপ আলোচনায় বহুতর উপকার পাওয়া যায়। যদিও আমরা চেষ্টা করিয়া এরূপ হইতে পারে যে যথার্থ সত্যে উপনীত হইতে পারিতেছি না কিন্তু তথাপি এরূপ আলোচনায় অনেকটা পথ সোজা হইয়া যাইতে পারে। সমাজ অর্থই বা আমরা কি বুঝিব? কথাটা কিছু কঠিন। সকল সময়ে লোকে ইহার এক অর্থ বুঝে না। অতি প্রাচীন কালের লোকেরা 'সমাজ' অর্থে কি বুঝিতেন?—আর এখনকার লোকেই বা 'সমাজ' বলিলে কি ভাবেন? অবার এ কথাও শুনিতে পাই (whole human society) সমগ্র মানব সমাজ। কথা হইতেছে মনুষ্যের জ্ঞানের বিকাশ হইলে 'সমাজ' চিন্তা আর সঙ্কীর্ণভাবে (Narrowness) থাকে না। হইতে পারে মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত কিন্তু এক সমাজভুক্ত। আবার এরূপও দেখা যায় সেই এক এক দলের মধ্যেই একটী একটী ক্ষুদ্র সমাজের উৎপত্তি। যাহা হউক সমাজ অর্থে এরূপ বলিলে অন্যায় ব্যাখ্যা হয় না "যে সকল লোকে এক স্বার্থ (Community of Interest) একভাব (Community of Ideas) ও যাহাদিগের একরূপ সংস্কার তাহারাই এক সমাজ ভুক্ত। একত্রে বাস হইলেই এক-সমাজভুক্ত হয় না। বনে ব্যাঘ্র ভল্লুক একত্রে বাস করে তাহারা কি এক সমাজ-ভুক্ত? এই ভারতবর্ষে হিন্দুর দেশে ইঙ্গরাজও বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের একরূপ স্বার্থ (Community of Interest) একভাব (Community of Ideas) ও একরূপ সংস্কার না হইলে এক সমাজভুক্ত হইতে পারে না। ফরাশি পণ্ডিতেরা সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—

A similar sentiment and doctrine whatever may be its nature or object is the first condition of the social state; it is in the midst of truth only or in what they take for truth that men become united and that society takes birth. And in this sense a modern philosopher (M. L. Abbe de Lamennais) was right in saying that there is no society except between intellects; that society only subsists upon points and within limits where the union of intellects is accomplished; that where intellects have nothing in common there is no society;—(Guizot's History of civilization. vol II Page 20.)

অর্থাৎ আমাদিগের জ্ঞান যতই বাড়িবে সমাজ সংস্কার ততই বিস্তার হইবে ও পরস্পর সহানুভূতি ততই বাড়িবে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিঃ

প্রতিষ্ঠা ও আত্ম প্রসাদ।

গুটিপোকা যেরূপ গুটিসৃজন করে, গুণও সেইরূপ প্রতিষ্ঠা সৃজন করে। প্রতিষ্ঠা গুণকে অপেক্ষা করে, গুণ কখনও প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করে না। প্রতিষ্ঠা ছায়ার মত। ছায়া যেরূপ বস্তুর প্রতিবিম্ব হইলেও বহিরালোকের বশবর্ত্তিনী হইয়া কখনও দীর্ঘ, কখনও হ্রস্ব, কখনও ঋজু, কখনও তির্য্যগ্‌ভাব অবলম্বন করে, প্রতিষ্ঠাও সেইরূপ গুণের একপ্রকার প্রতিবিম্ব হইলেও লোকের জ্ঞান ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করতঃ বহুরূপীর মত বিবিধভাব অবলম্বন করে। আর ছায়া যেরূপ অলীক, প্রতিষ্ঠাও ঠিক সেইরূপ অলীক। চঞ্চলের সহিত সখ্য সদর্প গৃহবাস; এই জন্য প্রকৃত গুণীপুরুষ প্রতিষ্ঠার প্রতি আস্থা রাখেন না; প্রত্যুত উহাকে ভয় করেন। যিনি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল, অন্যান্য ভিখারীর ন্যায় তিনি আপনাতে অভাব নিরীক্ষণ করেন। তাহার মনঃ তাঁহার সুখ্যাতি করে না। প্রতিষ্ঠা লোলুপ ব্যক্তিকে অত উজ্জ্বল দেখায়, অত মহৎ দেখা যায় কিন্তু জানিও উহার অপেক্ষা ভিখারী আর কেহই নাই; উহা অপেক্ষা ক্রীতদাস আর নাই। তাঁহার নিজের চক্ষুঃ নাই, পরের অক্ষিতে আপনাকে দর্শন করে। তাঁহার স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, লোকে যাহা বলে সে তাহা করে। প্রতিষ্ঠাকে কখনও অন্বেষণ করা উচিত নহে; বরং প্রতিষ্ঠাকে সাশঙ্কভাবে গ্রহণ করা উচিত। যিনি নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ত্তব্যের সেবা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাকে সাসূয়ভাবে নিরীক্ষণ করেন; কারণ উহাকে দাস্যের বেতনস্বরূপ দেখায়। প্রতিষ্ঠা একটী ঘোর চাটুকার; উহা অভিমান জন্মায়, একান্ত মৃদুপুরুষকেও স্ফীত করে। প্রতিষ্ঠা অধিকাংশলোককেই নষ্ট করে। এইজন্যই উক্ত আছে যে সম্পদে যেরূপ মানুষের পরীক্ষা হয়, বিপদে সেরূপ হয় না। আর দেখ প্রতিষ্ঠা কি অলীক বস্তু। লোকে আমার প্রশংসা করে, তাহারা আমার কি জানে? চর্ম্মমাংসভেদ করিয়া আমার হৃদয় পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিবার তাহাদের শক্তি নাই। আমি অতি ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ আমি গঙ্গাস্নান করি, দরিদ্রদিগকে ধনদান করি, মন্দির সংস্থাপন করি, অনাথ প্রতিপালন করি, কিন্তু কে জানে আমি কি ঘোর মাংসলোলুপ পশু, আমার হৃদয়ে কি ঈর্ষা? হইতে পারে, যিনি আজ ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, ধার্ম্মিক হওয়া দূরে থাকুক তিনি ঘোর নারকী। আর যে সকলের নিকট ঘৃণিত, সকলের দ্বারা পরিহৃত সেই সৃষ্টির প্রধান জীব। জগতের বড়লোকের, কথা সংসার অতি অল্পই শুনিতে পায়। কবি সত্যই বলিয়াছেন প্রকৃত মহত্ত্বের আদর জগতে

হয় না; কারণ প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিবার লোক অতি অল্প। মহামতি বেকনের কথা পরম সত্য, কৃত্রিমতার, সাংসারিকতার, কুটিলতার ভাঁজাল না থাকিলে, শুভ্র সরল মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। উচ্চদরের মহত্ত্ব যেরূপ বিরল, উচ্চদরের মহত্ত্বের স্তাবকও অতি বিরল; আর মাঝারিদরের মহত্ত্ব, যাহাতে দীপ্তিবৈচিত্র্য আছে, প্রগল্‌ভ চাকচিক্য আছে তাহাই উপাসনা-ভাজন হয়। প্রতিষ্ঠা পরের মুখ হইতে জন্মায়। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বাহ্যিক বেশ, বাহ্যিক বাক্যই উহার আশ্রয়। সুতরাং যথায় বাহ্যিক চাকচিক্যের অভাব, সেখানে উহা স্তবের বিষয় দেখিতে পায় না [illegible] যেখানে বাহ্যিকতার আড়ম্বর সেইখানে উপাসনার বিষয় দেখিতে পায়। অবাহ্যিকতারও বাহ্যিকতা না থাকিলে প্রশংসা হয় না। পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে মানুষের মন ধাবিত হয়; যাহা কিছু নূতন, নূতন বেশ, নূতন কথা, নূতন রীতি, নূতন ব্যবহার, সব পুরাতন প্রিয় মানবের নিকট আতঙ্কের জিনিষ। পূর্ব্বক্ষুণ্ণ বর্ত্ম পরিহার মাত্রকেই মানুষ ভয় করে, নিন্দা করে; সুতরাং প্রতিষ্ঠাও পুরাতনের বন্ধু; নবীনের শত্রু। উহার দৃষ্টি ক্ষীণ, ধারণাশক্তি অল্প, কেবল আড়ম্বর অধিক। উহা [illegible] বুঝে না [illegible] একবার বুঝিলে আর ছাড়ে না। সুতরাং গড্ডালিকাপ্রবাহবৎ প্রতিষ্ঠা মানুষের রুচির অধীন। যেমন আমরা অন্যান্য বিষয়ে রুচিসঙ্গত [illegible] সাগ্রহভাবে গ্রহণ করি, উহার তাত্ত্বিক দোষ গুণ পরীক্ষার বিলম্ব করি না, সেইরূপ সুখ্যাতি অখ্যাতি রটনা বিষয়ে ও রুচির অনুযায়ী কার্য্য দেখিবামাত্র আহ্লাদে অধীর হই ও মুক্তকণ্ঠে স্তব করিতে থাকি। কিন্তু রুচির ন্যায় তরল আর কিছুই নাই। উহার দাস্য অপেক্ষা ঘৃণিত বৃত্তি হইতে পারে না। শিয়রে বহ্নি করিয়া থাকা রুচির উপাসনা অপেক্ষা লঘু কার্য্য। রুচির উপাসনা করিতে গিয়া মানুষ কলের জন্তু হইয়া পড়ে বাহ্যিকতার দাস হইয়া পড়ে। যে পরিচালক কেন্দ্র অন্তরীণ হওয়া উচিত তাহা বহিস্থন হয়। সুতরাং জীবন রাজ্যে এক প্রকার অরাজক হইয়া উঠে। যে দক্ষ গৃহস্থ হয় সে নিজের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে পরের কথায় মাতে না; সেই রূপ জীবন যাত্রায় দক্ষ পথিক নিজের সদসৎ-জ্ঞানের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে। লোকে বলে দশ মুখে ধর্ম্ম। পৃথিবীর অর্দ্ধেক সত্য এইরূপ প্রবাদের গর্ভে নিহিত। অতএব লোকে যাহা বলে তাহা ঘৃণা করা উচিত নহে; তাহাকে শিক্ষক রূপে গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি সকল মানুষের কথা তৃণ তুল্য বিবেচনা করে, সে দারুণ অভিমানী ও দারুণ অসত্যাবৃত। অভিমান [illegible] সত্যের কাকোলূক সম্বন্ধ। অভিমান এক খানি রঙ্গ করা চসমা; উহা আত্মার যকৃদ্দোষ। বস্তু মাত্রের উহা বর্ণ বিপর্য্যয় করে; সুতরাং এতাদৃশ অভিমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। তাই বলিয়া যে পর প্রত্যয়নের বুদ্ধি হইতে হইবে তাহা নহে। বহু মানবের রুচির দাস হইবে তাহা নহে; প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইবে তাহা নহে। কিন্তু নিজ সদসজ্জ্ঞানের সহিত দশ জনের মত-

বোধ সমন্বয় করিবে। আমরা সসীম একান্ত ক্ষুদ্র। বহুত্ব, সমাজ বহুতাই আমাদের বল। ভাষা বল, ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, সকলই বহু ব্যক্তির, একটী বিপুল সমাজের রচনা। একের জ্ঞান ক্ষীণ; উহা বহুর জ্ঞানে সবল হয়। অতএব দশ জন যাহা বলে তাহা আমাদিগের অন্বেষণের বস্তু, আদরের বস্তু। যতক্ষণ বহু লোকের সহিত আমাদের মতের সমন্বয় না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিবে। যদি মিলাইতে না পার, কি করিবে? আত্মহত্যা করিও না। স্বীয় সদসদ্জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে ও জ্ঞানময় বিশ্বপতির নিকট জ্ঞানালোকের জন্য ভিক্ষা করিবে। আপনাকে আপনি প্রবঞ্চনা করিও না। আত্মার নিকট আপনি জুয়াচোর হইও না। দশ জনের সহিত প্রশংসা অপেক্ষা দশ [redacted] সহিত নিন্দা করা ঘোরতর বিষয়। ধরিতে গেলে আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের নিন্দার কোন অধিকার নাই। আমরা আমাদিগের নিকট অপরিচিত নহি। একটি সামান্য ঘটনা এদিক ওদিক হইলে আমাদের জীবনের কি মহান্তর ঘটিত। অনেকেরই জীবনে বোধ [redacted] এরূপ বহু মুহূর্ত্ত ঘটিয়াছে যাহাতে জীবনের অণুমাত্র বিপর্য্যয় হইলে, আমাদের জীবনের একান্তিক বিপর্য্যয় ঘটিত। যে ক্ষুদ্র জীবের জীবন এই রূপ নিক্তির কাঁটা প্রশ্ন করি তাহার কি অধিকার আছে লোককে নিন্দা করিবার? ভ্রাতৃভাবই আমাদের উপাস্য। আমরা সকলে সমদুঃখী সমপ্রকৃতিক অতএব আমাদিগের পরস্পর সোদরের ন্যায় জ্ঞান করা উচিত। যখন দেখিবে দশজন লোক একজনকে নিন্দা করিতেছে, তখন নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হইও। ভ্রাতার ন্যায় কোমল দৃষ্টিতে তাহার চরিত্র নিরীক্ষণ করিও। বন্ধুহীনের সহিত বন্ধুত্ব, চরিত্রের প্রকৃত গৌরবের সূচক। নিন্দা করিবার লোক অনেক আছে, ভালবাসিবার লোক, অপরাধী হইলেও স্নেহ করিবার লোক জগতে বিরল। দোষকে কঠিন নেত্রে দর্শন করিও কিন্তু দেখিও দোষীর প্রতি তোমার হৃদয় যেন কঠিন না হয়। আর লোকে যখন তোমার নিন্দা করিবে স্বীয় চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। দোষী হও, দোষ সংশোধন করিয়া লইবে। আর যদি বিশেষ পরীক্ষার পরেও আপনাতে অপরাধ দেখিতে না পাও, তবে অবিচলিতভাবে, বরং আহ্লাদের সহিত কুৎসা বার্ত্তা সহ্য করিবে। বেকন বলিয়াছেন কণ্টক যদি তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করে, তাহাতে তোমার কণ্টকের প্রতি কোপ হইবার কারণ কি? লোকে না জানিয়া শুনিয়া যদি কুৎসা রটনা করে, তবে ঐ নিন্দা অসারগর্ভ জ্ঞানে অবহেলা করিবে। গরলের পরিবর্ত্তে গরল বিতরণ অসাধু ব্যবহার। অতএব নিন্দাবাদ শুনিয়া ক্রুদ্ধ বা অমর্যান্বিত হইবে না। বরঞ্চ যাহাতে লোকের অজ্ঞান দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্টা থাকিবে। নিন্দাবাদে অচল থাকা, হৃষ্ট থাকা মহাপুরুষের লক্ষণ। অজ্ঞানকৃত দোষ যেমন অপরাপর ব্যবহারে মার্জ্জনীয়, সেইরূপ নিন্দাবাদেও উহাতে আপনার জন্য

ক্ষোভের বিষয় নাই, কিন্তু গ্লানিকারক দিগের জন্য দুঃখের বিষয় আছে। যেরূপ প্রতিষ্ঠা এক অভিমান সৃজন করে, নিন্দা বিপর্যস্ত প্রকৃতিক হইলেও ঠিক সেইরূপ এক অভেদ্য আত্মাভিমান রচনা করে। নিন্দায় কখন নির্বিণ্ণ বা উদ্ধত হইবে না। বাত্যাবিপর্য্যবর্ত্তের ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও নিন্দা উভয়কে সমান অনাস্থার সহিত দর্শন করিবে। জ্ঞানী পুরুষ আত্মপ্রসাদও আত্ম-গ্লানিকেই পথ প্রদর্শক করেন। স্বীয় সদ-সদ্ জ্ঞান তাঁহার প্রশংসা করিলে আপনাকে শ্লাঘ্য বোধ করেন ও গ্লানি করিলে ম্রিয়মাণ হয়েন। সুখের জন্মভূমি মন। বহু জন নিন্দা করিলেও যদি তোমার মন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে তাহাহইলে তুমি সুখী। আর জগদ্ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা কর্ত্তৃক সহস্রাননে কীর্ত্তিত হইয়াও যদি তোমার হৃদয়ের অন্ত-স্তম প্রকোষ্ঠাবস্থিত সাক্ষী মুনিটি তোমার প্রতি কলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তবে তুমি দুঃখী।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

সত্য।

"নম্বপ্রিয়ং দুর্ব্বিসহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতং।
নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান্‌দ্রষ্টুমক্ষম।"

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধে ১৩অধ্যায়ে ১০ম শ্লোক।

যাঁহারা পরের দুঃখ দেখিতে অক্ষম এ প্রকার সকরুণ ব্যক্তি যদি অপরের কোন দুর্ব্বিসহ অপ্রিয় আপনা হইতে উপস্থিত হয় তাহা বলিবেন না।

"সত্যং ভূতহিতংপ্রোক্তং নযথার্থাভি ভাষণং।"

(যাজ্ঞবাল্ক উত্তর খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে ৫২ শ্লোক।)

যাহা প্রাণি সকলের হিতকর তদুক্তিই সত্য। যথার্থ বাদকে সত্য বলে না।

উপরে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল ইহা হইতে সত্যের প্রচলিত অর্থ হইতে বিস্তর প্রভেদ। প্রচলিত অর্থে যাহা মিথ্যা নহে তাহাকেই সত্য বলে, আমরা এই প্রবন্ধে উহাকে অমিথ্যা বলিব, যোগী যাজ্ঞবল্ক উহাকে "যথার্থ" অর্থাৎ কেবল অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া অভিহিত করিলেন, উহা সত্যের নিকৃষ্ট অর্থ। আমাদের মতে সত্যের প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট অর্থ কি এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব।

আমরা শৈশবে অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে শিখিয়াছি "সদা সত্যকথা কহিবে"। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে ভয় হয়, সদা সত্যকথা বলিবার আবশ্যকতা কি? "সর্ব্বদা সোজা পথ দিয়া চলিবে, গলি ঘুঁজি দিয়া চলিও না"। উপদেশটী ভাল, কিন্তু

সেই সঙ্গে বলিয়া দেওয়া উচিত কোথা যাইবার জন্য এই সোজাপথে যাইবার উপদেশ।" বিদ্যালয়ে যাইবার সময় মাতা বলিলেন, বা'বা, সোজা পথ দিয়া পাঠশালায় যাইবে।" প্রভু ভৃত্যকে কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন সোজাপথে যাইও। সোজাপথে যাইলে গন্তব্য স্থানে শীঘ্র যাওয়া যায়, পথে বিঘ্ন বিপত্তির কম সম্ভাবনা, পথভ্রম মোটেই হইবার আশঙ্কা নাই। তাই সোজাপথে যাইবার আদেশ বা উপদেশ। অন্যে যদি গন্তব্য স্থানের প্রতি নির্লক্ষ্য হইয়া কেহ তোমাকে বলেন যে তুমি সর্ব্বদা সোজাপথে চলিবে, তুমিও উপদেশ মত সোজাপথ দেখিলে আর চলিতে আরম্ভ করিলে, তাহা হইলে তোমাকেও বলিব পাগল আর তোমার উপদেষ্টাকেও বলিব বাতুল। সত্যকথা ও সেইরূপ। সত্যকথা বলা একটা প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র। কিন্তু কিসের উপায় সে উদ্দেশ্যটা প্রথম হইতে স্থির করা চাই। মনুষ্যজীবনের একটা না একটা মহান্ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যটী সংসারাকাশের ধ্রুবতারার মত ঠিক থাকিবে। আমরা যাহাকরি সমস্তই সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের উপায় হওয়া চাই। যাহাতে সহজে, অল্প সময়ে সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় তাহাই অবলম্বনীয়। মনুষ্য ভাল কি মন্দ তাহা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। যদি উদ্দেশ্য মহান্ হয় তাহা হইলে সে লোক মহাত্মা আর যাহার উদ্দেশ্যটা মন্দ সে লোক নীচ। হিন্দুজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষ। এক্ষণে যদি এটা স্থির হইল যে মুক্তি এ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তবে এখন মুক্তি কি উপায়ে হয় তাহা জানা আবশ্যক। জ্ঞানের সহিত যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মুক্তি হয় বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার যোগকেই জ্ঞান বলিয়া জানিবে, শাস্ত্রে এরূপ উপদেশ ও আছে। সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।" জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ, যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি। যম দশবিধ,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, পরিমিতাহার ও শৌচ। এতক্ষণে মুক্তির উপায় স্বরূপ আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত সত্যে আসিয়া উপনীত হইলাম। শাস্ত্রে সত্যের প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট অর্থ কি তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহা প্রাণিসমূহের হিতকর তাহাই সত্য, সুতরাং সত্য অমিথ্যা হইতে অনেক প্রভেদ। তবে অনেক সময় এরূপ ঘটে যে অমিথ্যা-দ্বারা সত্যসাধন হয় না, সেইজন্য সাধারণতঃ সত্য ও অমিথ্যা একই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাম যে সত্যপরায়ণ ছিলেন বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় না যে রাম কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না, বরং ইহাই বুঝায় যে রাম প্রাণির মঙ্গলময় কার্য্য করিতেন। ঈশ্বর সত্য স্বরূপ অর্থে ঈশ্বর, মিথ্যাবাদী নহেন বলিলে চলিবে কেন? ঈশ্বর মঙ্গলময়, "সত্যং শিবং সুন্দরং" বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ একথার ইংরাজী অর্থ

God is true নহে, God is good বলিতে হইবে। True কথাটার ইতিহাস ও তাই। পূর্ব্বে যাহাকে Troth = Faith অর্থাৎ ধর্ম্ম বলিত, এখন তাহার এই বিকৃত ও সংকীর্ণ অর্থ হইয়াছে। যাহা সত্যের ভাব তাহাই সত্য। সৎ লোকের যাহা ধর্ম্ম তাহাই সত্য। প্রাণির হিতসাধন সত্যের প্রধান ধর্ম্ম, তাহাই সত্য।

ওদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে বলে কি? যাহারা যত অসভ্য আদিম অবস্থাপন্ন তাহারা তত কম মিথ্যা কহে। আমরা দেখি কি? আমাদের অপেক্ষা সাঁওতাল গারো প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা কম মিথ্যাবাদী, আবার আর একস্তর নিম্নে নামিলে কি দেখি জন্তরা মোটেই মিথ্যা জানে না। তাহাদের যে বৃত্তির যখন উদ্রেক হয় তাহা গোপন করে না। মহা বিভ্রাটে পড়িলাম। তবে কি এই সত্য অর্থাৎ অমিথ্যা মনুষত্ববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় নাকি? এবড় বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার একমাত্র এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, যে মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য লোপ পায় না, সত্যের অর্থের পরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে যাহাকে সত্য অর্থাৎ অমিথ্যা বলিতাম, মনুষ্যত্বের বিকাশে সেই সত্য অর্থে প্রাণির মঙ্গল বুঝাইতেছে। আমার কন্যাটী বড় সত্যপ্রিয় বলিলে যাহা বুঝাইবে বিদ্যাসাগর বা তর্কচূড়ামণি মহাশয় সত্যপ্রিয় বলিলে তাহা বুঝায় না। সত্যের এইরূপ অর্থ বোধ হওয়া অনেক সময় আবশ্যক হয়, নচেৎ অনেক উপদেশের সারবত্তা বুঝাযায় না।

শ্রীশিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার।

(বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা।)

পূর্ব্বকালে ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর দেশে অনন্ত বর্ম্ম নামে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ বাস করিতেন। তিনি এক জন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিন্দু দিগের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র নামক একজন অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন সংস্কৃত কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে বৃহৎ কথা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র নামক এক জন কবির নাম শুনিতে পাই। অনন্ত বর্ম্ম দেবের সমকালবর্ত্তী ক্ষেমেন্দ্র ও "বৃহৎ কথা" রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র এক ব্যক্তি কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। "বৃহৎ কথা" গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে উহা গদ্যে লিখিত। সোমদেব ভট্ট এই গদ্য গ্রন্থ হইতে "কথা সরিৎ সাগর" নামক যে কবিতাময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই এ দেশে প্রচলিত আছে।

আমাদের ক্ষেমেন্দ্রের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী

ন্যক্ক নামে এক বন্ধু ছিলেন। কাব্য রচনায় ক্ষেমেন্দ্রের যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইলে ন্যক্ক বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ দেবের এবং তাহার সহচর বর্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য কীর্ত্তি সকল বর্ণনা করিয়া জাতক ও অবদান নামে বহু সংখ্যক গল্প প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মনীষীগণ এই সকল গল্প একত্রিত করিয়া বহু সংখ্যক সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহামতি হজ্সন্ সাহেব নেপাল হইতে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয় ও এদেশীয় পণ্ডিত সমাজে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উহাতে অনেক প্রকার ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হয়। উহার রচনা প্রণালী অতি কর্কশ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ। ন্যক্কের সময় এরূপ সংগ্রহ গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু তাহাদিগের ভাষার কাঠিন্য, লালিত্যশূন্যতা প্রভৃতি কারণে সে গুলি লোক শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া ন্যক্কের ধারণা হইয়াছিল। তিনি ক্ষেমেন্দ্রের রচনার লালিত্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অসাধারণ কবিত্ব দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন যদি ক্ষেমেন্দ্র দ্বারা জাতক ও অবদান গুলিকে কাব্যাকারে লিখাইয়া লওয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে উহা পণ্ডিত সমাজে আদরণীয় হইবে ও লোক শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এই রূপ মনে করিয়াই তিনি ক্ষেমেন্দ্রকে অবদান রচনার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন সুতরাং তিনি প্রথমে এই কার্য্যে সম্মত হন নাই। কিন্তু হৃদয়বান্ধবের অনুরোধ লোকে কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে? অনেক তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ত বৌদ্ধদিগের অবদানাবলী অবগত নহেন তিনি কেমন করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিবেন? ন্যক্ক তখন তাঁহাকে এক একটি করিয়া অবদান বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এবং ক্ষেমেন্দ্র সেই অবদান গুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাকারে লিখিয়া দিতে লাগিলেন। এই রূপ তিন খানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা হইলে ক্ষেমেন্দ্র কহিলেন আর পারা যায় না, আমি যে শাস্ত্র জানি না, শুদ্ধ তোমার নিকট শুনিয়া সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপে কাব্য লেখা যাইতে পারে? তাহার পর আবার, ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। পরের জন্য তিনি দীর্ঘ কাব্য রচনার পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কেন? তিনি বৌদ্ধ কাব্য রচনার আশা পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে ক্ষেমেন্দ্র বিরত হইলে এক দিন ভগবান বুদ্ধ স্বপ্নযোগে ক্ষেমেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই পুণ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। এবং এই পুণ্যে পরিণামে তাঁহার যে সকল পারলৌকিক উন্নতি লাভ হইবে তাহা বর্ণনা করিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর ক্ষেমেন্দ্র দেখিলেন সৌগত ধর্ম্মাবলম্বী সৌগতবিদ্যাবারিধি,

বীর্য্যভদ্র নামক আচার্য্য তাঁহাকে জিন শাসন শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনটী মাত্র অবদান লিখিত হইয়াছিল এক্ষণে ভগবানের প্রসাদে বীর্য্যভদ্রের সাহায্যে পণ্ডিত মণ্ডলীর উৎসাহে এক এক করিয়া একশত সাতটি অবদান লিখিত হইল। এই এক শত সাতটি অবদান লিখিতে এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল যে সপ্তোত্তর শততম অবদান শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ক্ষেমেন্দ্র জ্ঞান বজ্রের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টি রূপ শৈলকে ভেদ করতঃ অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একশত আটটি অবদান হইলে মাঙ্গলিক সংখ্যা পূর্ণ হয়। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র আর জগতে নাই। তিনি যে পুণ্য কার্য্য আরব্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা কে শেষ করিবে? সেই ভাষায়, সেই ছন্দে, সেই অলৌকিক কাব্য রসে, সেই নব নব ভাব মালায় বিভূষিত করিয়া কে আর একটি অবদান রচনা করিয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যা পূর্ণ করিবে? কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র কাল কবলে পতিত হইলেও কাশ্মীরের কবিসিংহাসন শূন্য হয় নাই। নরেন্দ্র নামক কাশ্মীরাধিপতির জয়াপীড় নামক মন্ত্রীর বংশ এখনও কবি শূন্য হয় নাই। যে বংশে ভোগীন্দ্র ও সিন্ধু অবতীর্ণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন সে বংশ অদ্যাপি কবি শূন্য হয় নাই। ক্ষেমেন্দ্রের দীর্ঘ কাব্য রচনা কালে তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র নিজেই একজন প্রধান কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার পুণ্য কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতে তাঁহার মন সরিল না। তিনি জীমূত বাহন অবদান নামে একটি সুদীর্ঘ অবদান রচনা করতঃ অষ্টোত্তরশত সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন। যে কারণে পিতৃদেব গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন এবং বৈদিক সময়ের পর ভারতীয় গ্রন্থকার মধ্যে যে অনুক্রমণিকা প্রণয়ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পিতৃদেবের বিরচিত গ্রন্থের সেইরূপ এক খানি অনুক্রমণিকা প্রণয়ন করিলেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দৃষ্ট হইল যে বৌদ্ধ দিগের মধ্যে এরূপ গ্রন্থ আর কখন রচিত হয় নাই। ন্যক্ষ নিজেই বলিয়াছেন আচার্য্য গোপ দত্ত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ যে সকল অবদান মালা রচনা করিয়াছেন তাহার কোথাও পদ্য কোথায় গদ্য। গদ্য পদ্য লিখিবার কিছু মাত্র স্থিরতা নাই, যেখানে গদ্যে লেখা উচিত, হয় ত সে স্থলে পদ্যে লেখা হইয়াছে. আর যেখানে পদ্যে লেখা উচিত সেখানে গদ্যে লেখা হইয়াছে। অবদান গুলি সাজাইবার কিছু মাত্র নিয়ম নাই, যে অবদানের পর যে অবদান লিখিত হইলে সুন্দর হইত সেটী হয়ত দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকল অবদানই এক প্রণালীতে রচিত হওয়ায় অধিকক্ষণ সে গ্রন্থ পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ হয়। ভাব স্থানে স্থানে এত গভীর যে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ অবগত না থাকিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভাষা রচনা প্রণালী অত্যন্ত কর্কশ এবং বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুনরুক্তি দোষে একান্ত দূষিত। এই সকল গ্রন্থের পরিবর্ত্তে যখন সোমেন্দ্রের গ্রন্থ প্রচলিত হইল তখন বোধ হইল বৌদ্ধ সাহিত্য গগণে সমুজ্জ্বল কিরণাবলী মণ্ডিত সূর্য্য

দেবের আবির্ভাব হইল। এই অভিনব গ্রন্থে ভাষা এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল যে গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষা রূপ একটি ব্যবধান আছে এরূপ অনুভবই হয় না। উহার ছন্দ পাঠ কালে কখন বা কালিদাসের ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখন বা বাল্মিকীর ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখন বা ভবভূতির ছন্দ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ইহার শ্রুতিমধুর ছন্দ পাঠে হৃদয় আর্দ্র হইয়া মধুরতর ধর্ম্মবীজ ধারণার্থ প্রকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি রূপে পরিণত হয়। অবদান গুলি এরূপ সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছে যে প্রথমটি পাঠ করিলে দ্বিতীয়টি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়, দ্বিতীয়টি পাঠ করিলে তৃতীয়টি পাঠ না করিয়া থাকা যায় না এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ বার বার পাঠ করিলেও তৃপ্তি লাভ হয় না। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পরম সৌগত মণ্ডলী মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত অবদানকল্পলতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মন ভগবান বুদ্ধের প্রেমে আপ্লুত ও নির্ব্বাণ লাভ লালসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

অল্প দিন মধ্যেই গ্রন্থ চারিদিকে প্রচারিত হইল। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক মঠেই উহা লিখিত হইল। ক্রমে তিব্বত প্রভৃতি দেশেও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার প্রচার হইল। তিব্বতীয় ভাষায় উহার অনুবাদিত হইল।* তিব্বত হইতে উহা দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু যে গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য হিন্দু বৌদ্ধে, ধনী দরিদ্রে, গৃহস্থ ভিক্ষুকে মিলিত হইয়াছিল, যে গ্রন্থের উৎসাহ দাতা কবি, শিক্ষা দাতা এমন কি প্রথম লেখকের নাম পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ ভক্তি সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; যাহা এসিয়ার সমস্ত মধ্য অংশে আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় নিত্য অধীত ও গীত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষবাসী কেহই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। এ স্থলে বলা যাইতে পারে বৌদ্ধদিগের কোন্ গ্রন্থই বা ভারতবর্ষের লোক জানিত যে অবদান কল্পলতার নাম না জানায় তাহাদিগকে দোষ দিতে হইবে?

ভারতবর্ষের সকল লোক জানিত না সত্য কিন্তু হিমানীবেষ্টিতশিখরাবলী পরিবৃত নেপাল রাজ্যে অনেকেই বৌদ্ধ এবং তাহারা গ্রন্থাবলীর আদর জানুক আর নাই জানুক বৌদ্ধ গ্রন্থ গুলিকে তাহারা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল জগতকে সেই সংবাদ প্রচার করিবার জন্যই যেন নেপাল দেশীয় বৌদ্ধমঠ গুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া আপন বক্ষঃস্থলে জরাজীর্ণ তালপত্র লিখিত গ্রন্থগুলি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। যেন উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহারা এই রত্নগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে সভ্য প্রচারাভিলাষী ইংরাজ মনীষীগণ প্রার্থনা করিবা মাত্র সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাদের হস্তে

* লাসা নগরীর মহামান্য শাক্য ভদ্রের আজ্ঞায় পণ্ডিত লক্ষীকর ও লামা শোং তোন্ দয়ের শান্তি নথ নামক বিহারে ১২৭১ খৃঃ অব্দে ইহার অনুবাদ করেন।

সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। নেপাল রেসিডেন্ট শ্রীমান হজ্‌সন সাহেব ভারতের এই নিভৃত কোণে অপ্রচলিত ধর্ম্মের অপ্রচলিত বহু সংখ্যক গ্রন্থাবলী দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রাণপণে সেই গুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর শ্রীমান রাইট সাহেবও সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যদি এই দুই মহা পুরুষ গ্রন্থ সংগ্রহে ব্রতী না হইতেন তাহাহইলে অনেক গ্রন্থ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইত একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যখন শ্রীমান রাইট সাহেব নেপালে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন একটী মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ আবশ্যক হয়। নেপালে এখন হিন্দু রাজা। তিনি সেই মন্দির মধ্যে যে সকল বৌদ্ধ পুস্তক পাইলেন তাহা একেবারে ফেলাইয়া দিলেন। রাইট সেইগুলি সংগ্রহ করিলেন। শ্রীমান বেণ্ডল সাহেবের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহার মধ্যে একখানি গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৮৫৯ সালে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা পরমেশ্বরতন্ত্র নামক বৌদ্ধদিগের একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ। এমন মহামূল্য গ্রন্থ ভারতবাসীর মূর্খতা প্রযুক্ত নষ্ট হইতেছিল কেবল একজন ইংরাজ রাজপুরুষের চেষ্টায় রক্ষিত হইল।

হজ্‌সন্ ও রাইট অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক পুস্তক লেখাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ক্ষেমেন্দ্র কৃত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা পাওয়া গেলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হজসন্ সাহেব যেখানি পাইলেন তাহা ৫১পল্লব হইতে আরম্ভ। রাইট—সাহেব যে দুখানি পাইলেন তাহার একখানি পরীক্ষায় ৫১পল্লব হইতে আরম্ভ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নেপালাধিপতি অনন্ত মল্লদেবের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১৩০২ শতাব্দীতে মঞ্জুভদ্র সুধী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। যখন লেখা হইয়াছিল তখন গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে উহার ১৭৪পৃষ্ঠা কোথায় গিয়াছে তাহার এপর্য্যন্ত ঠিকানা হয় নাই। সে পুথি খানি ১৭৫পৃষ্ঠা হইতে এবং একচল্লিশ পল্লবের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ। পূর্ব্বে যে দুখানি পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে পরীক্ষাদ্বারা জানা যায় যে সে দুখানি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে এই পুথিখানিরই নকল। একখানির শেষে লিখিত আছে এতৎ ক্ষেমেন্দ্র কৃত অবদান শতকগ্রন্থস্য পরার্ধমেবাযং পূর্ব্বার্দ্ধঃ কুত্রচিৎ ন প্রাপ্তং শুভম্।

এতদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে ক্ষেমেন্দ্রকৃত অপূর্ব্ব গ্রন্থের পূর্বার্দ্ধ নেপালদেশেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজগণ বিশেষ যত্নপুরঃসর সিংহল, ব্রহ্ম শ্যাম ক্যাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশে যত বৌদ্ধগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার তালিকা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কোথায় অবদান কল্পলতার পূর্ব্বার্দ্ধের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা ইংরাজগণ পাবেন নাই, যাহা ফরাসীগণ পাবেন নাই, যাহা উদ্যমশীল জর্ম্মাণ জাতিতে পারে নাই একজন বাঙ্গালীর যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে সেই কর্ম্ম সমাহিত হইয়াছে।

বাবু শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত ভ্রমণকালে

ডালর লামার রাজধানী লাসানগর হইতে বহুসংখ্যক তিব্বত অক্ষরে লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র মুদ্রিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। লাসা নগরে অবস্থিতিকালে তিনি দেখিয়াছিলেন আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, প্রতিগৃহে পঠিত, গীত ও সর্ব্বত্র অভিনীত হয় তিব্বতদেশে সেইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রতি গৃহে পঠিত, গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। আমরা যেমন প্রতিকথায় রামায়ণ ও মহাভারতের দোহাই দিয়া চলি, তিব্বতবাসীরাও সেই উক্ত গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকে। গ্রন্থ খানির নাম বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, গ্রন্থকারের নাম ক্ষেমেন্দ্র। এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন ডালক নামক মুদ্রা যন্ত্রে খোদিত কাষ্ঠ খণ্ড সমূহে এই গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়াছিল।* এবং কাষ্ঠ খণ্ড সকল অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান আছে। তখন তিনি অনেক যত্ন সহকারে কাষ্ঠ যন্ত্রে মুদ্রিত এক খানি তিব্বত অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন।

গত বৎসর তিনি যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যমহোদয়গণকে তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদ সহিত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। সভ্যগণ সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে দেখিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। যাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ভার আছে প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদের মধ্যে এক জন। তিনি বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা নাম শুনিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসকে উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ পাওয়া গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস রোমান অক্ষরে লিখিত সমগ্র পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। পরীক্ষায় দৃষ্ট হইল গ্রন্থের যে অংশ ১৩০২ খৃষ্টাব্দের পর বিলুপ্ত হইয়াছে, যে অংশ এ পর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই প্রথমাবধি উক্ত পঞ্চাশ পল্লব শরৎ বাবুর গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিল না। সোমেন্দ্র পিতৃ কৃত গ্রন্থের শেষ ভাগে যে পদ্যময় সূচীপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সহিত পল্লব গুলি মিলাইয়া দেখিলেন সমস্তই মিলিয়া গেল। তখন প্রবন্ধ লেখক সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণকে এই বহুকাল বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার সংবাদ প্রদান করিলেন শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসের উপর তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। ভারতের এক খানি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* ডালর লামা সুমতি বাগীশ্বর ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক ও ইহার অনুবাদ কাষ্ঠ যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। পোতাল নামক রাজপ্রসাদে এই কাষ্ঠ যন্ত্র সমস্তে সংরক্ষিত হইয়াছে দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যারিষ্টার বাবু।

ব্যারিষ্টার মহাশয় রামতনু বাবু অতি শীঘ্রই লালুবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকাল হয় নাই। লালুবাবু প্রথমে ব্যারিষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে রামতনু বাবুকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বাবুটী কে?—এঁকে কখন দেখি নাই।" রামতনু বাবু উত্তর করিতে যাইতেছিলেন "ব্যারিষ্টার বাবু।" কিন্তু ব্যারিষ্টার মহাশয় সে প্রশ্নের উত্তর করিতে দিলেন না। তিনি একেবারেই লালুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি যাঁহাকে আসামী করিয়াছ তিনি এখন কোথায়?

লালু। "আপনার তাহাতে আবশ্যক কি?"

ব্যা। আবশ্যক না থাকিলে আর জিজ্ঞাসা করিতেছি?

লালু। "আপনাকে বলিতে আমি বাধ্য নহি। আপনারা উহাকে পুলিস হইতে ছিনিয়া লইতে আসিয়াছেন বুঝিয়াছি" এই বলিয়া লালুবাবু সজোরে চিৎকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। লালু বাবু তাহাকে বলিলেন "বাঁধ্ শালাদের।"

চৌকিদার ইতঃস্তত করিতে লাগিল কি করিবে ভাবিতে লাগিল। একলা দুই জনকে কিরূপ করিয়া বাঁধিবে। কি করে—কখন কাপুরুষ হইতে পারে না বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইল। ব্যারিষ্টার মহাশয় তাহাকে এক ধমক দিলেন ও সে কাহার কথায় বাঁধিতে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। চৌকিদার লালু বাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। লালু বাবুর তখন 'ইউনিফরম ড্রেস' ছিল না। লালু বাবুও চুপ। ভাবে লালু বুঝিল এক জন উকিল।

ক্রমে রামতনু বাবুর হরিশ্চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়িল। রামতনু সকাতরে ব্যারিষ্টার মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ঐ দেখুন মহাশয়! কি অত্যাচার! হরিশ্চন্দ্রকে পুতিয়া ফেলিয়াছে। ব্যারিষ্টার মহাশয় তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দুইজন চৌকিদার হরিশ্চন্দ্রকে ক্রমাগত মাটী চাপা দিতেছে। হরিশ্চন্দ্র সংজ্ঞাহীন।

ব্যারিষ্টার মহাশয় ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি আরক্ত লোচনে সব ইন্‌সপেক্টর লালুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন আইনে একজনের প্রতি এরূপ ব্যব-

হার কর? কেন বা ইঁহাকে জামিনে ছাড় নাই?"

লালু। "বলেন কি মহাশয়! আপনি এক জন আইনজ্ঞ হইয়া খুনীকে জামিনে ছাড়িতে বলিতেছেন?"

ব্যা। "প্রথমে উঁহাকে মাটী হইতে উত্তোলন কর তাঁহার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।"

লালু বাবু হরিশ্চন্দ্রকে মাটী হইতে তুলিতে আজ্ঞা দিলেন। চৌকিদারেরা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। ব্যারিষ্টার মহাশয় হরিশ্চন্দ্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। লালু বাবুও কিছু ভীত হইয়া এক জনকে শীঘ্র জল আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্যারিষ্টার মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "সব-ইনেস্পেক্টর মহাশয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুমি যাঁহাকে মিছামিছি আসামী করিয়াছ তাঁহার যদ্যপি শরীরে কোন ব্যাঘাত হয় তাহাহইলে ইহার প্রতিশোধ লইতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তোমার এতদূর অত্যাচার যে তুমি আমাকেই বাঁধিতে যাইতেছিলে। এখন আমি দেখিতেছি তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন বল ইহাকে জামিনে ছাড়িবে কি না?" লালু বাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না শেষ বলিলেন "আজ্ঞা আমি তা কিরূপ করিয়া পারি? আর পল্লী গ্রামের ভাব আপনি জানেন না তাই আপনি আমার উপর অত চটিয়াছেন। এখানে সহজে কেহ দোষ স্বীকার করে না। বদমায়েসের জায়গা। বদমায়েসী না করিলে এখানে কে দোষী কে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করা অতি দুরূহ।"

ব্যারিষ্টার মহাশয় আর তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মুখে জল দিতে দিতে হরিশ্চন্দ্রের একটু সংজ্ঞা হইল এক খানি ডুলি করিয়া একবারে হরিশ্চন্দ্রকে জাহানাবাদে চালান করা হইল। মোকদ্দমা এক জন ডেঃ মা নিকট হইবে স্থির হইল সেখানকার ডেঃ মাজিষ্ট্রেটটি অতি ভদ্র। ব্যারিষ্টার মহাশয় লালুবাবুর অত্যাচারের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ডেঃ মাঃ মহাশয় হরিশ্চন্দ্রের দশা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

রামতনু বাবু ঘটনাটি সমস্ত বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না বলিলেন কাছারীতে শুনিব।

কাছারী বাড়ী।

কাছারী বাড়ীতে আজ মহা ভিড়। হরিশ্চন্দ্রের আজ মোকদ্দমা—দেশ থেকে অনেক লোক হরিশ্চন্দ্রের কি হয় দেখিতে আসিয়াছে। অত ভিড় হইবার কারণ শুধু হরিশ্চন্দ্র নহে। ব্যারিষ্টার বাবু ভিড়ের একটি মস্ত কারণ। কাণাকাণি হইতেছে যে আজি লালুর বীষ দাঁত ভাঙ্গা যাইবে। কেহ কেহ আবার বলিতেছে লালু কমিসনরের পোষ্য পুত্র হয় ত এই হিড়িকে পদ বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। এইরূপ নানা লোক নানা কথা বলিতেছে। ক্রমে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মহাশয় যথা সময়ে এজলাসে আসিয়া বসিলেন। সপিনা প্রার্থনাকারী দিগের সপিনা সর্ব্ব প্রথম দেওয়া হইল। ক্রমে তাহার পর যাহারা সপিনা বাহির করিতে আসিয়াছিল তাহারাও ভিড় দেখিয়া ভিড়ের সহিত জমিয়া গেল। ভিড়ের কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে অথচ কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিতেছে না। যাহারা জানে তাহাদিগের ও দিকে কাণ নাই কখন মকর্দ্দমা হয় এই ভাবনায় ব্যস্ত। ক্রমে ক্রমে হরিশ্চন্দ্রের ডাক হইল। হরিশ্চন্দ্র মাজিষ্ট্রেট সম্মুখে নীত হইল। হরিশ্চন্দ্র আপনাকে নির্দ্দোষী কবুল করিলেন। তাহার পর লালু বাবুর উকীল (বলা বাহুল্য লালু বাবু বেগতিক দেখিয়া এক জন উকিল দিয়াছিলেন) হরিশ্চন্দ্র কোন

অপরাধে অপরাধি তাহা বেশ করিয়া মাজি-ষ্ট্রেট মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন। বুঝাইবার সময় আসামীর সহিত ফরিয়াদির কি সম্পর্ক ■ ভবেনের পিতার আসামির সহিত বা কি সম্পর্ক তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর ব্যারিষ্টার মহাশয় লালুবাবুর কায়েম ও লালু বাবুর দুই জন সাক্ষীর এজাহার যথাক্রমে গ্রহণ করা হইল। মিথ্যা সাজান সাক্ষ কতক্ষণ এক জন পারদর্শী ব্যারিষ্টারের নিকট টিকিবে? মাজিষ্ট্রেট মহাশয় অল্পক্ষণ মধ্যেই কেস্ ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন ও লালু বাবুর বিরুদ্ধে সুপারিণ্টেণ্ড মহাশয়ের পুলিসের রিপোর্ট কলমে রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্রমে লোকের ভিড় কমিতে লাগিল। সকলেই ব্যারিষ্টার মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা করিতে করিতে বাড়ী যাইল। লালু বিমর্ষ মুখে ফাঁড়িতে প্রত্যাগত হইলেন ও মনে মনে বলিতে লাগিলেন আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে।

হরিশ্চন্দ্র প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী পৌঁছিবামাত্রই সকলে হরিতলায় হরিলুট দিল। শৈলজার "মা" সমস্ত দিন জলস্পর্শও করেন নাই। সমস্ত দিন হরিতলায় মাথাখুঁড়িয়া কপালে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে। এখন একটু সুস্থির হইয়া খানদুই বাতাসা লইয়া একটু জল পান করিলেন।

বেলা অবসান। বর কনে যাইবার সময় হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সকলে শৈলজা ও যোগেশকে যে যাহা দিতে পারিল তাহাই দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। শৈলজার পিতা ধান দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "দেখ মা! কখন যেন কাহারও নিকট ভিক্ষা করিও না। প্রাণান্তেও করিও না ইহা অপেক্ষা হেয় ঘৃণিত জিনিষ এ জগতে আর নাই। যোগেশকে বলিলেন পরিশ্রমী হইও, সদা ধর্ম্মপথে থাকিও। তাহার পর শৈলজার "মা" আশীর্ব্বাদ করিয়া শেষ বলিলেন কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করিও না।

বর কনে ক্রমে ডুলিতে উঠিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। শৈলজা কাঁদিতে লাগিল সুরবালা বলিল 'অত কাঁদিতেছ কেন মা?' শৈলজা বলিল "আমার মন কেমন করিতেছে, এই বলিয়া পিতার দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। শৈলজার পিতার তাহাতে চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল পড়িল। সুরবালা শৈলজার চক্ষু মুছাইয়া চুপি চুপি বলিল ;—

"যত সুখ মোর কপালে সব টুক নিয়ে,
যত দুঃখ তোর কপালে সব মোরে দিয়ে
চোক্ষের জল শেষ করে চির হাসি নিয়ে
ঘর কর শশুরবাড়ী চির-এয়ো হয়ে।"

তাহার পর আবার চুপি চুপি কি বলিল শেষ বলিল মনে থাকিবে ত? শৈলজা ঘাড় নাড়িল। সুরবালা আবার বলিল,—

"ননদিনী পরম গুরু শাশুড়ি তার পর।
এইটে যদি মনে থাকে সুখে কর্ব্বে ঘর॥
ননদিনী তুষ্ট রইলে শাশুড়ি তুষ্ট রন।
তা নইলে মহা কষ্ট ব্যাসদেব কন॥

নীরবালা সুরবালার নিকটে ছিল। সে সুরবালার উপদেশ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সুরবালাকে বলিল "ও সব মিছে। তোমার ত ননদ নাই তোমার ও কথা বলা সাজে না।" সুরবালা বলিল "কেন? আমি শুঁড়িদের বাড়ী দেখিয়াছি আর ওত আমাদের কথা নয় ও ব্যাসদেবের কথা মিথ্যা হইবার নয়।"

তাহার পর নীরবালা শৈলজাকে তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকে নমস্কার করিতে বলিল। শৈলজা প্রথমে পিতাকে নমস্কার করিল ও আর একবার পিতার মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিল। সে দৃষ্টি তাহার পিতা সহ্য করিতে পারিলেন না। মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর অন্যান্য সকলকে নমস্কার করিয়া বর কনে বিদায় গ্রহণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুঃখ নিশা ফুলশয্যা।

প্রভাত এখনও হয় নাই। রাত্র চারিটা। প্রত্যুষ বলিলেও বলা যায়। শৈলজার মাতাঠাকুরাণী নিদ্রা যাইতেছিলেন। হটাৎ ঘুমাইতে ঘুমাইতে ভয় সূচক চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ঘুমের ঘোর তখনও ভাঙ্গে নাই। সেই ঘুমের ঘোরেই বিছানার চারি দিকে কি খুঁজিতে লাগিলেন। আরো ভয় হইল। আর বিছানায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বিছানা হইতে উঠিলেন। প্রদীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন গৃহ শূন্য। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন এখনও তাহাই দেখিতেছেন। একবার গৃহের বাহিরে আসিলেন দেখিলেন ভোর হইয়াছে। একটু মন সুস্থির হইল। মনে করিলেন তাঁহার স্বামী বৈবাহিক মহাশয়ের বাড়ী গিয়া থাকিবেন কিম্বা ফুলশয্যার সামগ্রী আহরণের জন্য বাহিরে গিয়া থাকিবেন। স্বপ্ন মিথ্যা। আবার ভাবিতেছেন তবে আমার মন এরূপ হইল কেন শৈলজা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় তাঁহার দিকে সজল নয়নে অতবার চাহিল কেন? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

ক্রমে সকাল হইল। বিষণ্ণ মনে গৃহাদির কার্য্য সমাপন করিয়া। পরে রন্ধনগৃহে রন্ধন করিতে আসিলেন। কিন্তু মন কিছুতেই বুঝিতেছে না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। শূন্য গৃহ শূন্য গৃহই রহিল। একটা দুইটা তিনটা বাজিল। হরিশ্চন্দ্র গৃহে ফিরিলেন না।

শৈলজার মা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে দু একজন লোক ও আসিয়া জুটিল। শৈলজার মার স্বপ্নের কথা শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে কেহ কেহ বলিতে লাগিল "ইহাও কি হইতে পারে?" কেহ বলিল "স্বপ্ন আবার ঠিক হয়?" সুরবালা ও আসিয়াছিল সে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে যোগেশদের বাড়ী যাইল। যোগেশের পিতা এ সংবাদে স্তম্ভিত হইল ও বলিল "ইহার আভাস আমি 'জনায়েই' পাইয়াছিলাম। তখন আমি অত বুঝিতে পারিনাই।" শৈলজার মন খারাব হইয়া ছিল পিতার এ সম্বাদে সে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশিরা মনে মনে বলিতে লাগিল "এ সকল লালুর কারসাজি প্রাণে না মারিলে হয় সে সকলই করিতে পারে।" যোগেশের মাতা ভাবিতে লাগিলেন এখন ভালয় ভালয় ফুলশয্যা হইয়া যাইলে হয়।" যোগেশের ভগ্নী কাহারও কাহারও কাছে বলিলেন ফুলশয্যাটী ফাঁকিদিবার জন্য সে পোড়ার মুখো দু এক দিনের জন্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।" এইরূপ নানা লোক নানা কথা বলিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। যোগেশের পিতা যে সকল লোককে হরিশ্চন্দ্রের জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহারা সকলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ক্রমে সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল ক্রমে সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। জাগরিত কেবল শৈলজা ও যোগেশ। শৈলজা কাঁদিতেছে। যোগেশ আপন কাপড়ে তাহার চক্ষুর জল মুছাইতেছে ও আপনিও কাঁদিতেছে। পরিশেষে যোগেশ চক্ষু মুছিয়া আপনি খুঁজিতে যাইবে বলিয়া বসিল ও চাদর গ্রহণ করিল। শৈলজাও বিছানা হইতে উঠিয়া যোগেশের নিকট হইতে চাদর খানি কাড়িয়া লইয়া বলিল "না আজ নয় কাল সকালে খুঁজিতে যাইও।"

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল সম্পাদিত।

অশ্রু-কণা।

শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী প্রণীত। মূল্য আট আনা ৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা পিপেল্‌স লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। পৃথিবী সুখান্বেষী। সুখের জন্য মানব পৃথিবীতে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। দুঃখ কেহ চাহে না তাই গিরীন্দ্র মোহিনী ভূমিকায় লিখিয়াছেন "সংসার সুখের অভিলাষী, শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে?" কবিতা বালার এ দুঃখ গীতি ভাল লাগিবে না তাঁহার বোধ হইতেছে। তিনি কবিতা সুন্দরীকেও তাই তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু কবিতা বালা কিছুতেই শুনিতেছেন না। সে তথাপি তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। রচয়িতা বলিতেছেন

"কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর!
* * * * *
* * * * *
বিদায়—বিদায়, বালা।
কবি সনে কর' খেলা।
হেতা, অশ্রু জলে শিক্ত হবে পরাণ তোমার!
কবিতা দাঁড়ায়ে কেন আর?"

এই করুণ রসাত্মক গীতি কাব্যের ভিতর প্রবেশ করিলেই বেশ বোধ হইবে করুণাময়ী কবিতা সুন্দরী গিরীন্দ্র মোহিনীর অশ্রুকণার সহিত তাঁহার অশ্রুকণা মিশাইয়াছেন এই গীতের কোমল সুমিষ্ট সুরের সহিত তাঁহারও সুর মিশ্রিত। তাহা না হইলে এত সুন্দর হইবে কি রূপে? এমন সুন্দর গান কেনা শুনিতে চায়? ইহা শুনিয়া কে না অশ্রু বর্ষণ করিবে?

এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই মৃত স্বামীর উদ্দেশে। কবিতা গুলির অধিকাংশ গুলিই হিন্দু বিধবার অশ্রুবিন্দু এই জন্যই ইহার নাম অশ্রু-কণা। 'সংসার সুখের অভিলাষী'। এ অশ্রু-কণা আর কাহাকে উপহার দিবেন? যাঁহার জন্য এ 'অশ্রু-কণা' তিনিই ইহার উপহারের যোগ্য পাত্র। হিন্দু রমণীর ইহজগতে স্বামীই পরম গুরু। উপহার পরম গুরুর চরণে ভিন্ন আর কাহারও চরণে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে না। উৎসর্গ পত্রে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া প্রণেতা লিখিতেছেন

"যা ছিল আমার, দেছি;
মোর যা' তোমারি সব।
সবি পুরাতন' সখা,
আছে অশ্রু-কণা নব।
এ নয় সে অশ্রু-রেখা
মানাস্তে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না,
দেখা হ'লে ফুল বনে।
সে অশ্রু এ নয়, সখা,
দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা
হাসির কমল থরে।
এ শোকাশ্রু।
নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু!
বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু।
হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু!
জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।
কোথা আছ নাহি জানি,

জানি না হৃদয় তব।
যা ছিল, সকলি দেছি,
লও এ শোকাশ্রু নব।

অশ্রু-কণার ন্যায় অমূল্য রত্ন এ জগতে অতি দুর্লভ। ফুল বল আর প্রেমই বল এ রত্নের তুল্য মূল্য এই ভুবেব কেহই নহে। পুষ্পে কীট আছে কিন্তু অশ্রু-কণা নির্ম্মল ও পবিত্রোজ্জ্বল। ইহার তুল্য নির্ম্মল পদার্থ আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর প্রেম—যে প্রেমে অশ্রু-কণা নাই সে প্রেম প্রেমই নহে। তাই বলি অশ্রু-কণার ন্যায় নির্ম্মল সুন্দর অমূল্য বস্তু ইহ জগতে দুর্লভ। কবিও এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন;—

"পেয়েছি মনের মত রতন আমার
সুকোমল পূতোজ্জ্বল, নিধি অশ্রুধার।
আয় অশ্রু প্রেম দে'বে মানস-আসনে
বসায়ে, সাজাই তাঁরে মুকুতা-ভূষণে।"

সেই নির্ম্মল পূতোজ্জ্বল অশ্রু-কণায় আজি এক জন বিধবা স্বামীর চরণ পূজা করিতেছেন। এ সুন্দর দৃশ্য এ সুন্দর ছবি কি আর এখন দেখিতে পাওয়া যায়? না একূপ সুন্দর ভাব কোন ইংরাজি পুস্তকে পাওয়া যায়?

বিধবা নহিলে বিধবার মর্ম্ম বেদনা বুঝে না। পুরুষ ত বুঝিবেই না। কবিবর নবীন চন্দ্র সেন যথার্থই বলিয়াছেন 'যাহার পায়ে কাঁটা ফুটে—যাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয় সেই ইহার যাতনা বুঝিতে পারে; আর অপরের কেবল লৌকিক রোদন মাত্র"। পুরুষ জাতির কঠিন প্রাণ। সে বিধবার মর্ম্ম বেদনার ব্যথি নহে। যদি কখন কাহাকেও ব্যথিত হইতে দেখ তাহা-হইলে জানিও সে "কেবল মাত্র লৌকিক রোদন।" আর এক জন বিধবা সে কোন রমণীর একূপ অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই বলিবে "আহা! স্বামীর কোলে মরিল না কেন? যদি তাহা না হইল স্বামীর মৃত্যুর সহগামীনী হইল না কেন?" কাহারও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কি উক্ত অভাগার বন্ধুর মুখ হইতে কি একূপ একটিও কথা শুনিতে পাও? না উক্ত অভাগার মুখ হইতে রচয়িত্রীর ন্যায় একূপ কথা শুনিতে পাও;—

"কতদিন দেহ হেন, হ'য়ে দিন হীন,
বহিবে জীবনভার লুটায়ে ধুলায়?
কতদিন হৃদি এই ভগন কুটীরে,
রুদ্ধকণ্ঠে ব'সে ব'সে গাবে গান হায়!
সমাপন কবে হবে এই দুখ-গান?
কবে রে মুদিব আমি সজল নয়ান?
কি দেখিতে, নেত্রে আর সলিল ভরিয়া
জগত-পথের ধারে রয়েছি-পড়িয়া?
কে মোর মুছাবে অশ্রু বসন-অঞ্চলে?
নিজে মুছে হেতা হ'তে ধীরে যাই চলে।
যেতে যেতে চলে যেতে চাহেনাত কেহ!
কেন এ করুণ দৃষ্টি পরিশ্রান্ত দেহ?"

এ কাতরোক্তি সাধ্বীসতী রমনীর নিকট হইতেই পাইবে। সাধু সচ্চরিত্র পুরুষের নিকট হইতে পাইবে না। পুরুষ হিয়া কঠিন। ইহার অধিক আর কিছু এখানে বলা ভাল দেখায় না। প্রেমিক সুকবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রেম ও ফুলের একস্থানে লিখিয়াছেন — "দিনান্তেও তাহার জন্য এক বিন্দু অশ্রু পড়ে কি না।"

মানুষ মরিয়া কোথায় যায় এ প্রশ্ন স্বতঃই শোকাতুরার মনে উদয় হয়। মরিয়া যাইলে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে তাপী মরিতে পারে ও আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে শত শত উক্তরূপ ঘটনা ঘটিত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল একূপ যে উহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই। উহা গূঢ় রহস্যে নিহিত। রচয়িত্রী শোকাতুরা স্বামীর জন্য পাগলিনী। তাঁহার হৃদয়ে এ ভাবত উঠিবেই।

"কোথায় গিয়েছে, কোথায় রয়েছে,
পাব কি আবার, হায়!
দেহান্তে কি আছে কে মোরে বলিবে!
দেহান্তে পাব কি তায়!
যদি নাহি পাই, দেহান্ত না চাই,

তাহার কেন এ দুঃখ।
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ।
তার প্রেম-আশ, তাহার আবাস,
তাহার আমি—এবাদ,
তাহার দেহ, তাহার বিরহ,
ত্যজিতে নাহিক সাধ।
পাব কি না পাব, কোথায় যাইব ?
চাহিনা মরণ পাব।
তাহার ভাবনা তাহার কামনা,
এ অতি সুখ আমার।"

আবার বলিতেছেনঃ—

জীবনের বিভাবরী
দীর্ঘশ্বাসে শেষকরি
চেয়ে আছি হায় সেই প্রভাত আশায়,
আশাতৃণ-গাছিধরি,
বিরহ পাথার তরি
যেই উপকূল স্মরি, পাইব কি তায় ?
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!
এদীর্ঘ জীবন পথে
একেলা কি হবে যেতে ?
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কভু তার।
কে বলে দেবেগো মোরে,
পাব কত দিন পরে ?
নিকটে কি আছে দূরে কোথা সে আমার'
অনন্ত নেপথ্য-মাঝে
সে যেন কোথায় আছে
মাঝে মাঝে ডাকিতেছে আয় আয় আয়।
আকুল পরাণ, হায়
ঘরে না রহিতে চায়।
সদা যাই-যাই গায়, উদাস হিয়ায়।
এমন বিষণ্ণ চিতে,
চাহিয়া চাহিয়া পথে,
দারুণ চাতক ব্রতে কত রব হায়।
মধুর বাজিছে বাঁশি,
হাসিছে কুসুমরাশি,
বিশদ জোছনা নিশি সবি শূন্য তায়!
রয়েছে কুসুম ঢালা,
গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ জ্বালা, শুকাইয়া যায়।
আশার শিশির-বারি
সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি, যাবে কি বৃথায় ?
সে কি মোর ফুলহার দেবে না গলায়।
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়।
কোথা আছ,—কোথা তুমি কতদূরে হায়!
জীবনের বিভাবরি ফুরাইয়া যায়।
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

মরিয়া যাইয়া যদি স্বামী প্রাপ্য অনিশ্চিত তবে মরিবার আর প্রয়োজন কি ? তাহা অপেক্ষা তাঁহার বাঁচিয়া থাকায় সুখ আছে। কেবল এখন তাঁহার প্রার্থনা যে প্রাণ পূর্ব্বে যা ছিল এখন সে প্রাণ আর চাহেন না। তাহা কি কখন হইতে পারে ?

জীবন হইতে যদি চলে গেল ঘুম ঘোর,
কেন নাহি যায় চলে প্রাণের স্বপন মোর।
যাক্ যাক্—দূরে যাক্ প্রাণের সাধের আশ
ভাঙা ঘরে চাঁদ-আলো, অভাগ্যের উপহাস।
ডাকুক শিবার দল মণ্ডলী করিয়া ঘোর,
জীবন্তে মৃতের সম হউক হৃদয় মোর।
সঞ্জীবনী মন্ত্র মত আয়রে মরণ আয়!
প্রত্যক্ষ মিলন মত পদ্ম-হস্ত দেরে গায়।
মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চলে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণি, খুলে নেগো, স্নেহের শিকল তোর।
দেগো ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-তরুতে মোর।
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা, আমা হ'তে সমাধান।
ও শুভ্র তোমার বুকে কালিমার বিন্দু হ'য়ে,
থাকিতে পারি না আর, এ ভার জীবন ল'য়ে।

স্বামীর প্রতি যাঁহার এরূপ অটল ভক্তি যাঁহার এত দূর মিলনেচ্ছা তিনি পর-

লোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইবেনই। তবে ধরণী তাঁহার স্নেহের শিকল খুলিয়া লইতে পারিতেছে না তাঁহাকে উড়িয়া যাইতে দিতে চাহিতেছে না। ধরণী তাঁহার প্রত্যাশী। তাঁহাহইতে তাহার অনেক কার্য্য সংসাধিত হইবে। পুরুষে তাহা করিতে পারিতেছে না জানিয়া তাঁহাকে এত কষ্ট দিতেছে। তাহার ছোট ছোট মেয়ে গুলিকে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, আর কে এরূপ করিয়া উপদেশ দিবে? শিকল কাটিয়া ছাড়িয়া দিলে আর কাহাকে তাহাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিতে বলিবে? কেই বা ধর্ম্মের জলন্ত উপদেশ দিবে? শিশুমতি বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক আদৌ নাই। আমাদিগের অনুরোধ তিনি উক্তরূপ পুস্তক রচনায় ও রমণীকুলের হিত-সাধনে জীবন যাপন করুণ।

স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ অচল ভ[ক্তি] তাহা তাঁহার অন্যান্য কবিতার ন্যায় 'প্রেমা[ঞ্জলিতে]' বেশ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তিনি ইষ্টদেবের পূজায় বসিয়াছেন। কোথায় প্রেমাঞ্জলি দিয়া বিভুর পূজা করিবেন না তাঁহার স্বামী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। অমরবৃন্দের ন্যায় তিনিও যেন যজ্ঞ ভাগ নিতে উপস্থিত। গিরিন্দ্রমোহিনী লিখিতেছেন —

'এস, নাথ সব ত্যজি, এস প্রিয়তম,
পূজিব তোমায় আমি ইষ্টদেব সম।
* * * * *
এ মূর্ত্তি অন্তর করি হৃদয় হইতে
হে বিভু, তোমায় আমি নারিব পূজিতে!
পারি না ভাবিতে, প্রভু, তোমার চরণ।
অধিকৃত করি নাথ, হৃদি সিংহাসন।
হে নাথ, অনাথ নাথ, ক্ষম পাপিনীরে;
তব আগে প্রেমাঞ্জলি দিই প্রাণেশ্বরে।

যে কেহই এতাদৃশ শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে—যাহারি হৃদয়ান্তর অগ্নি শিখায় জ্বলিতেছে সেই ঈশ্বর নিরষ্ঠ বলিয়াছে—সেই মিলের চ্যালা হইয়াছে। কিন্তু রচয়িত্রীর ভাব অন্য রূপ। তিনি এত শোকাতুরা হইয়াও ঈশ্বর চরণ ছাড়েন নাই। তাঁহার হৃদয়ভার ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। প্রজ্বলিত অগ্নিতে যে রূপ বারি নিক্ষেপ করিলে ততোধিক জ্বলিয়া উঠে গিরীন্দ্র মোহিনীর ও শোক তেমতি আরো ধর্ম্মাগ্নিতে প্রজ্বলিত। তিনি এতাদৃশ মহাশোকেও কিরূপ অচল ও অটল তাহা দেখুন,—

লইয়া আনন্দ-ঊষা দেছ দুখ-বিভাবরী,
জানিনা জানিনা নাথ কি হেতু এ মনে করি।
শুভ বা অশুভ হোক,
সবে তবে ছায়া লোক।
সতত তোমারে যেন হৃদয় গগনে হেরি,
ও মুখ চাহিয়া তব,
যা দিবে সহিব সব—
ঝটিকা, বজ্রপাত, তোমারি চরণ ধরি।
তুমি যদি চাও, বিধি!
ভাঙিতে এ নারী হৃদি,
ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি॥
না জানি কি সুধামাখা ওই তব পা দুখানি।
যত দুখ পাই ভবে, করি তত টানাটানি।

২

লও, লও প্রণিপাত,
এই ভিক্ষা দাও নাথ,
যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা ভার।
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হতে চলে গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও, নাথ, লও কাছে।
সেই-ক্ষীণ দেহখানি, শীতল শান্তির ছায়,
বিরাম শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায়।
এ দুঃখ-আতপ-জ্বালা।
এ খেদ-কন্টক-মালা।
এ অশান্তি-নিত্য-ছলা, এ অশ্রু এ হাহাকার
পশেনা শ্রবণে যেন, পরশে না হৃদি তার।

ইহা ব্যতিত "আবাহন" শীর্ষক কবিতায় তিনি কিরূপ ঈশ্বরানুরক্ত তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। রচয়িত্রীকে

বিশেষরূপে সাহিত্য সংসারে পরিচিত করিবার জন্য (যদিও তিনি অপরিচিতা নহেন) তাঁহার এতগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার লেখা হইতেই তাঁহাকে পরিচয় দিবার জন্য যে সকল কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে সে গুলিতে হয়ত তাঁহার লেখার বিশেষ পরিচয় দিতে পারি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিতা গুলি সকলই সুন্দর ও মধুর। এরূপ হইতে পারে ভাল কবিতা গুলিই উদ্ধৃত না হইয়া নিরেস কবিতা গুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে। এ রূপ পুস্তকের এরূপ হইয়াই থাকে। তবে এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে " অশ্রুকণা " কি রূপ পুস্তক আর বোধ হয় কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। তবে যাঁহারা একথা বলেন " মধ্যবিত শ্রেণীর কবি এমন কি অকবি ও এরূপ অবস্থায় পড়িলে সুকবি হয়েন " তাঁহাদিগের উত্তর দিবার জন্য উক্ত পুস্তকের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক অক্ষয়বাবু রচয়িত্রীর পূর্ব্বের লিখিত কতকগুলি কবিতা ইহার সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এরূপ করিয়া তিনি ভালও করিয়াছেন—মন্দও করিয়াছেন। ভাল করিয়াছেন এই আজি আমরা উক্ত শ্রেণীর সমালোচক দিগকে " ছাই ' 'পাড়া গাঁ' ' বর্ষা ' সরসী-জলে শশী ' ' মানভঞ্জন ' ' চন্দ্রা বলী ' ' মথুরাধামে ' পথে কে চলেছে গাই ' গ্রাম্য-ছবি ' ' গার্হস্থ্য-চিত্র ' রুচি পরিচায়ক ' শোণনা ' প্রভৃতি কবিতা পড়িতে অনুরোধ করিতে পারিতেছি। মন্দ করিয়াছেন এই ইহাতে অশ্রুকণার জ্যোতী কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আর একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

বয়ঃসন্ধি

আজ্ হতে খেলতে আমি
আর যাব না, বকুল ফুল।
বিপিন বড় মুখের পানে
চেয়ে থাকে ঢুলু ঢুল।
কে জানে ভাই লজ্জা করে,
খেল্‌তে কেমন লুকোচুরি।
চায় যদি কেউ আমার পানে,
সেথায় কেমন রইতে নারি।

বয়ঃসন্ধি নবোঢ়া প্রভৃতি গুটিকতক যদিও খুব স্বাভাবিক তথাপি পড়িলেই বেশ বোধ হইবে যে উক্ত কবিতাগুলি তাঁহার সিমন্তিনী অবস্থায় অর্থাৎ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালীন লিখিত। এগুলি আমাদিগের মতে ' অশ্রু-কণায় ' না স্থান দিয়া তাঁহারা আর কোন কবিতা পুস্তকে দিলিই ভাল হইত। কারণ মানব অবস্থা ভেদ বতা অবস্থান্তর হইয়া থাকে। যাহাই উক্ত অশ্রু-কণা রচয়িত্রী একজন যে প্রথম শ্রেণীর কবি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কবিতায় যে সকল গুণ থাকা কর্ত্তব্য " অশ্রু-কণায় " যে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান তাহার আর সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও ইহার জিনিষ তুলনায় একখানি বৃহৎ পুস্তক, কারণ ইহাতে কাঁথার শেলাই নাই। উপসংহারে অক্ষয় বাবুর এই পুস্তক সম্পাদনের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই।

বিভা।

[১১।১২ সংখ্যা সন ১২৯৪ সাল ১ম খণ্ড]

গৃহবাসীর পত্র।

(১ম)

ভাই যোগীন।

* * * * * *

এক্ষণে পত্র লিই নাই কেন শুন। যখন কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত হইবাই আমাকে পত্র লিখিলে, প্রাণ প্রিয় সম্বোধনে পরম প্রেমে ববফের কুচি মাবিবা আপনাকে ছাঁৎ কবিবা তুলিলে, যখন তোমাব প্রেমিক মনের মত সাজান গোছান কথা গুলি কাগজখানা-রোহী, আহুরে ছেলের মত হেলা দোলা, নাচা কোঁদা, তোমাব হ্যাকা ন্যাকা কথা গুলি আমাব হৃদয় উঠানে হাডুডুডু খেলবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল, তখন আমার মনের ভিতর এক নভুতো ন ভবিষ্যতি ব্যাপার হচ্ছিল।

আমি এক দিন পাড়ায় বারোয়ারী দেখতে গিছলেম।

ভাল কথা ছোট লোকের সঙ্গে মেশা দোষটী আমার গেল না। এত করে বুঝাইলে, এত তিরস্কার দিলে, আমার সঙ্গে মিশিবে না বলিয়া ভয় দেখাইলে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ই বল আর যাই বল, যে ছোট লোক মেশা দোষটী আমার গেল না। কখন যে যাইবে তাহাও বোধ হয় না। কেন যে যাইবে না এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না, জিজ্ঞাসা করিলেই বা কে উত্তর দেয়। তবে এই মাত্র বলিতে পারি এটা আমার অভ্যাস। 'স্বভাব যায় না মলে' একথা ত আজন্ম কাল শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমি দেখি অভ্যাস কতক পরিমাণে স্বভাবকে পরাভবে সমর্থ হয়। এ রোগটী অভ্যাস বশে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগটীর জন্য শুদ্ধ তোমার কেন, কত লোকের যে ঘৃণার পাত্র হয়েছি তাহা আর কি বলিব। মানিলাম তোমার ঘৃণা বাহ্যিক, কিন্তু অন্য সকলের আন্তরিক। এই ঘৃণার ভ্রূভঙ্গী রূপ করুণ বাণ, উচ্চহাস্য

রূপ বরুণ বাণে দ্বিখণ্ডিত করিয়া জয়োল্লাসে নাচিতে নাচিতে, আমার সেই চির পরিচিত ছোট লোক বন্ধুর কাছে যাই, আর তাদের সঙ্গে মিশিয়া প্রাণ ভরা আনন্দ উপভোগ করি।

তুমি অবশ্যই দেখিয়া থাকিবে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি কেমন মাটীর পুতুল গড়িয়া থাকে। ইহাও দেখিয়াছ এই পুতুল গড়িতে তাদের কত যত্ন ও আগ্রহ। কিন্তু এত যত্নে গঠিত পুতুল গুলি, বালক বালিকার এত আদরের ধনপুতুল গুলিকে কখন চিনিয়াছিলে কি? আমিত নাই এতাবৎ কাল সুকঠিন চেষ্টায়ও তাহার নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি সেই ক্ষুদ্র বিশ্বকর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, "তুমি কি গড়িতেছ"? অমনি সেই ক্ষুদ্র কারিকরের পার্শ্বস্থিত অপর একটি বালক, ও সম্মুখস্থিত একটি বালিকা যুগপৎ বলিয়া উঠিবে "বাবা জগন্নাথ গড়িতেছে চিনিতে পারিতেছ না"? অমনি কুমর মশায়ের চতুঃপার্শ্বস্থিত বালক বালিকা তোমাকে অপদস্থ করিবার জন্য সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, "জগন্নাথ ঠাকুরকে চিনে না দেখ"। তুমি যথেষ্ট উত্তর পাইয়াছ, কুমর ম'শায়ের আর উত্তর না দিলেও চলে। তোমার চক্ষে, আমার চক্ষে, জ্ঞানবান ধীশক্তি সম্পন্ন সকলের চক্ষে, বাবাজগন্নাথ কেবল মাত্র কাদার তাল রূপে আবির্ভূত হইবেন। সহস্র আকাঙ্ক্ষায় তোমার সমক্ষে নুলো হাত দুটি বাহির করিবেন না, মুখে কালী মাখিবেন না, ভাঁটার মত গোল গোল চক্ষু দুটি দিয়া সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যাবেক্ষণ করিবেন না। কিন্তু তাদের বুঝাও দেখি তাদের জগন্নাথ জগন্নাথ নয়, বলীবর্দ্দের ন্যায় অবিশ্রান্ত চীৎকার কর, তাহারা ইহার এক কপর্দ্দকও বিশ্বাস করিবেক না। তাহারা সেই ঢিপির ভিতরে হাত দেখিবে, চোখ দেখিবে জগন্নাথ বলিয়া পূজা করিবে, নাচিবে হাসিবে, পাথর কুচির লুচি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, খোলাম কুচীর পয়সায় দক্ষিণা দিবেক। মূর্খ বালক হস্ত গঠিত জগন্নাথের কিছুই দোষ দেখিতে পায় না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি তাহাদের চক্ষে তাদৃশ ভাল লাগিবেক না।

তোমাদের ন্যায় বড় লোক গুলির ঘৃণার পাত্র আমার সহচর এই ছোট লোক গুলির দোষ নির্ব্বাচনে আমিও সেই ছোট ছোট শিশুদের ন্যায় ভাবা গঙ্গারাম হইয়াছি। দোষ না দেখিলে ত কাহাকেও পরিত্যাগ করা যায় না। সুতরাং তাহাদের সঙ্গ ছাড়া আমার এক প্রকার দুঃসাধ্য।

সঙ্গ ছাড়িব কি, তাহাদের একটি মহৎ গুণ আছে। তাহাদের অন্য অন্য গুণ গুলি ভুলিতে পারি কিন্তু সেই গুণটি বিস্মৃতি সাগরে ভাসাইতে মনে নিদারুণ কষ্ট বোধ হয়, কলুষিত মন আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকে। সে গুণটি নিঃস্বার্থ উপকার। সে গুণটি দৈহিক মানসিক ঔপহাসিক সহায়তায় সন্তর্পণ। আর সে গুণটি ত নয় যেন বাগবাজারের রসগোল্লা. ভাঙ্গ আর হাত ভরা রস। উপরে কিছু দেখতে পাও আর না পাও, একটু খানি ভিতরে ঘেসিয়া চাপিয়া ধরিলেই দেখিতে পাইবে যে সে গুণের অভ্যন্তরস্থ সুমধুর রস তোমার অন্তরের চাবি

ধারে ছিটকাইয়া লাগিয়াছে। আমরা বামুণ মানুষ। অনাচমনীয় মিষ্টান্ন রূপী শালগ্রামের চিরসেবক। অতএব যাই বল আমি ছোট লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। হরিবোল হরি'। বলব না বলব না করে' সব বলে ফেলেছি। বলে ফেলেছি যখন তখন আর একটু বলি। নিঃস্বার্থ পরোপকার আবার দুরকম আছে। এ কথা কখন শুনেছ কি? যদি না শুনে থাক তবে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দেখ যেন চিঠি খানি পড়তে পড়তে ছেলেকে কোলে বসাইয়া আদর করো না। একটুও হৃদয়ঙ্গম হবে না। কচি ছেলের মুখ খানি পিতা মাতার মানসিক বৃত্তির ক্লোরফরম। আমার এই ক্ষুরধার সদৃশ সুতীক্ষ্ণ চিরান চিরান কথা গুলি তোমার হৃদয়ে আচড় মারিতে থাকিবে, পুত্র মুখ দর্শনে সে আচড় আর অনুভব করিতে পারিবে না। সুতরাং আমার কথা গুলি আর কোন কাজেও আসিবে না।

এই সমগ্র ভূমণ্ডলের ভিতর এমন অনেক বড় লোক আছেন, যাঁরা আমার ন্যায় কত শত হতভাগাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়া থাকেন; কত শত সদাশয় ব্যক্তি অনাথ দরিদ্রকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া পতনোন্মুখ জীবনের উদ্ধার সাধনে নূতন জীবনে ব্রতী করিয়াছেন। অবশ্য একথা বলিতে হইবে না যে অধিকাংশ সময়ে এই সমুদয় সহায়তা দান নিঃস্বার্থ। হরি! হরিশ! আমার ন্যায় লোককে যে সাহায্য প্রদান করে সে কি উপকারের আশা করে? উপকারের আশা—ধন্যবাদের জায়গায়ই টানাটানি। আমি জানি ক্ষমতানুযায়ী পরোপকার করা মনুষ্যের একটী অবশ্য প্রতিপালনীয় ধর্ম্ম। তাতে আবার ধন্যবাদ কি? মাঝে থেকে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। শ্মশ্রু-ধারী একজন লোককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়! দাড়ী রাখিয়াছেন কেন?" লোকটী উত্তর দিলেন "দাড়ী আবার রাখিয়াছি কি? ফেলি কেন তাই বল।" পরোপকারে আবার ধন্যবাদ কেন? না করাই ত নীতিবিগর্হিত কর্ম্ম। অন্ততঃ আমার এইরূপ ধারণা। তবে এ ধারণাটা কত দিন থাকিবে বলিতে পারি না। জগতের গৃহিণী স্বরূপা গণ্ডগোলকারিণী গোলরূপিণী মুদ্রাদেবী নিকটে আসিয়া উপদেশচ্ছলে থেকে থেকে যখন ঝঙ্কার মেরে উঠবেন, তখন কি হয় বলতে পারি না।

যাই হোক কি বলছিলেম?—হাঁ। অনেকস্থলে এই সমস্ত উপকার নিঃস্বার্থ। কেহ দয়ার অনুরোধে কেহ বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে কেহ বা নামের অনুরোধে আবার কেহ কেহ বা পিতৃকুত উইলের অনুরোধে উপকার করিয়া থাকেন। ইঁহার মধ্যে কেহ বচ প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা করেন না—কেহ বা এ প্রত্যাশা হৃদয়ে আনিতে লজ্জা বোধ করেন। সুতরাং তাঁহাদের উপকার নিঃস্বার্থ। আর একটা উপকার আমার এই ছোট লোক বন্ধুগণের। আমার কাছে তাহারা কোন উপকারের প্রত্যাশা করে না, উপকারের প্রত্যাশা করিতে জানে না। আমা হতে তাদের কখনও উপকার হয় নাই, হইবে কি না সন্দেহ। তুমি

জিজ্ঞাসা করিতে পার " এ দুইটী উপকারের পার্থক্য কি ?" পার্থক্য আছে। অনেকেই সে পার্থক্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। তুমিও যদি প্রশ্ন কর তা হলে বুঝিব তুমিও পার না। আমি কিন্তু অনেক কষ্টে ঠাওর করেছি।

অনেকেই জানে সদ্ভাবের উপকার নামে একটিমাত্র পুত্র আছে। আমি কিন্তু সেদিন জানিলাম সেই বিশ্বপ্রেমিকা জননীর ঐ নামে দুইটী যমজ সন্তান। দুইটীকে দেখিতে ঠিক এক, শরীরের গঠন ও মুখের ভাব দুয়েরই এক রকম। সহস্র চেষ্টায় ও দুইয়ের কিঞ্চিৎমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইবে না। আমিও বোধ হয় ঠিক করিতে পারিতাম না কিন্তু সেদিন প্রশ্ন করিতে করিতে সব জানিতে পারিলাম। এই দুইটির মধ্যে একটী মাতৃপার্শ্বগত অপরটী মাতৃহারা। জন্মের সময় হইতেই সে হারাইয়া গিয়াছে। বড়টী মাকে চেনে, মাও তাকে চেনে। ছোটটী মাকে আদৌ চিনে না, মায়ের নাম পর্য্যন্তও জানে না আপনার নামও বলিতে পারে না। আমি তার নাম বলিয়া দিতে সে একেবারে অবাক্। বড়টী একটু বিজ্ঞের মত, ছোটটী পাগলাটে। বড়টি বড় লোকের বাড়ী থাকে ছোটটি আমার পরিচিত ছোট লোকদিগের গৃহে নিত্যই বিরাজমান। বুঝিতেই পারিতেছ ; ছোটটির উপর আপনাআপনি কেমন একটি ভালবাসা আসিয়া পড়ে, সে ভালবাসা অপরের প্রতি প্রয়োগ করিতে মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করে।

সে সব কথা যাক, বলছিলেম কি ?— একবার পাড়ায় যাত্রা শুনতে গিয়াছিলাম, সেখানে একজন যাত্রাওয়ালা গান গাইতে গাইতে বলেছিল "মনরে আমার কলের গাড়ী" শুনে অবধি আমি ভেবে আকুল। কিছুতে মনের সঙ্গে কলের গাড়ীর সামঞ্জস্য কর্ত্তে পারি না, অন্য সব দিকে মিললেও একদিকে দুইয়ের বড় তফাৎ। কলের গাড়ির গতি একদিকে কিন্তু মন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎবেগে প্রধাবিত হয়। এখন আমার মন ঠিক যেন একটী চা-বাগানের কুলী। সেই সুবিস্তীর্ণ চাবাগানের ম্যানেজার তোমার বাবু; আর তুমি তার মাহিনা থেকো,—কমিসন খেকো আড়কাটী। তুমি আমার মনটীকে নানাবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ করে ভুলাইয়ে সঙ্গে করে লয়ে গেছ। তোমার পাঁচটা মন ভুলান কথা মাসে মাসে পত্রলিখিত। তোমার সেই গায় হাত বুলান পাঁচ রকম বাক্যবিন্যাস আমার মনের পাঁচ টাকা মাহিনার সামিল হয়ে পড়েছে। বাগানের এখানে বাগানের ওখানে সহস্র দৃশ্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও একাকী সহস্রজন কোলাহলের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নির্জ্জন, প্রচণ্ড নিদাঘের দিবা দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, ভয়ঙ্কর শীতের নিশীথের নিশায়, আমার সেই "কি আছি কি হব" না ভাবা পাগল পারা মন তোমার প্রভুর নিষ্ঠুরতা ও তোমার চাতুরী চিন্তা করছে, আর সেই নিরস নিষ্ফল তরুর গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে জল টানিতেছে। মনের সহধর্ম্মিণী ইচ্ছা আর তাহার কাছে থাকিতে পায় না। তোমার বাবু বলপ্রয়োগে নিজের কাছে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। যথার্থ কথা বলতে

কি, স্বদেশবাসী তুমি আমার এক রকম কি, বিদেশবাসী তুমি আমার আর এক রকম কি স্বদেশের তুমি আমার মনের একটী প্রধান অবলম্বন, বিদেশে তুমি, তাহার পক্ষে শ্রীমন্তের কালীদহ। তাহা বাগ করিও না; আমার উপমা দেওয়া রোগটা কিছু গুরুতর। তোমার সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া বড় ঠকেছি। ব্রহ্মরাজ অকিঞ্চিৎকর ধনের লোভে বম্বে বর্ম্মা ট্রেডীং কোম্পানীকে সেগুণ বন জমা দিয়া যেরূপ ঠকিয়াছে, আমিও সেইরূপ ঠকিয়াছি। সুখে থাকতে আমাকে ভূতে পাইয়াছে। বৃথা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইতে যাইয়া আমার মন এখন তোমার নিকটে এক অকিঞ্চিৎকর স্থানে বন্দী। সে বন্দীত্ব কতকাল থাকিবেক তুমি বলিতে পার। আমি কিন্তু বুঝিয়াছি চিরকাল।

এমন যে তোমাতে অনুরক্ত আমি, তাকে কি কখন এমন করে চিঠি লেখে? "তোমাকে ভুলে গিছি" এ নিদারুণ বাক্য কেমন করে প্রয়োগ করে? কেন চিঠি দিইনি শুন।

তুমি ত অম্লানবদনে হেসে খেলে বাঙ্গালা ভাষায় প্রাণের কথা বার করে আমাকে হেসে খেলে পত্র লিখে থাক। আমি এখন মহা বিপদ্‌গ্রস্ত। বাঙ্গালা লিখিতে শিখি নাই—বাঙ্গালা পড়িতে শিখি নাই। আজন্মকাল ইংরাজী পড়িলাম। ইংরাজী মূর্ত্তিমান ভীম সাজিয়া দেশীয় লোকাচার রূপ কৌরবের ধ্বংসসাধনে উঠে পড়ে লাগিলাম। জগতে কিছুই গ্রাহ্য করি না। 'কারলাইল'রূপ অক্ষয় কবচ আমার হাতে, 'মিল' 'কোমত' আমার গদার কার্য্য করে, আমি আবার জগতে কারে গ্রাহ্য করিব? এই গদাঘাতে 'কুসংস্কার' রূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, বক্তৃতারূপিণী ঢেঁকী সহযোগে বালুকাকারে পরিণত করতঃ বাঙ্গালা ভাষায় যে একটী অন্তর্বিশুষ্কা স্রোতস্বতী আছে সেইটী বুজাইয়া ফেলিব। মনে কতই আশা, কতই উৎসাহ, কিন্তু হায়! সে আশা—সে উৎসাহ এখন কোথায়? সেই ভীম—যে ভীম তোমাকে দুইবার ইংরাজীতে পত্র লিখিয়া অনন্ত ভাষায় তোমাকে হৃদয় নিহিত তেজ দেখাইয়াছিল সেই ভীম তোমার হস্তলিখিত পত্ররূপী সুচিরনিদ্রিত বাবণাঙ্গুজের জলভরা পাকা টুকটুকে মাথার ঝুলীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে।

দেখেছ ত আমার চিঠির ইংরাজী কথাগুলি কেমন সভ্য। কেমন জামাজোড়া বিভূষিত, কেমন স্থির, কেমন গম্ভীর! সভ্যতানুমোদিত কেমন তাদের মৃদুমধুরহাস্য! পড়া শেষের সময় অবশ্যই বোধ হইয়াছিল যেন সকলে তোমার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু যে দিন তোমার চিঠি এল, সেইদিন থেকেই মহামারী ব্যাপার। তোমার কথাগুলি, এখানে আসবামাত্রেই নেচে কুঁদে হেসে খেলে আমায় একেবারে জ্বালাতন করে তুললে, কেহ বা এসেই হাত ধরলে, কেহ গায়ে ঢলে পড়ল, কেহ কাঁধের উপর উঠিয়া বসিল। আমার প্রাণের সঙ্গে তাদের কত কথাই হয়ে গেল, আমি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলেম না। আমার প্রাণের সঙ্গে যেন তাদের বহুকালের আলাপ।

তোমার পত্র পেয়ে আমি আবার জবাব দিতে বস্‌লেম্‌। কিন্তু কি হল! বাহির হও না যে বাপু! এত যত্নে এত চেষ্টায় নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। প্রয়োজনের সময় উপকারকের সঙ্গাগতা করিতেছ না কেন?

তোমার কথাগুলির এখানে আগমনের সময় হইতে তাহারা আর বাহির হইতে চায় না। তাহারা কি জানি কিসের লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। সাধুসন্দর্শনে ভণ্ডগণ যেমন মুখ লুকায়, ইহারাও যেন সেইপ্রকার মুখ লুকাইয়াছে। সাধ্য সাধনা করিয়া, পাঁচ রকম বুঝাইয়া সুঝাইয়া কাজ চালাইয়া লইব ভাবিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখি, তাহারা হৃদয়ে আর নাই। অন্তঃপুর দ্বারাবলম্বনে কোথায় পলাইয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ একটা নিভৃত কক্ষে তোমার প্রেরিত কথাগুলির ন্যায় কাহারা বসিয়া আছে। তাহাদের দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আমার চেনা-চেনা। যেন বালক কালে তাহারা আমার দৌত্যগিরি করিত। অনুসন্ধানে জানিলাম তাহারাই আমার সমগ্র হৃদয়রাজ্যের আদিম অধিবাসী। আমার যথেচ্ছাচারিতায় ভীত হইয়া বহুকাল হইতেই এই নিভৃত কক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এখন দেখি অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা তোমাকে আক্রমণ করিবার জন্য বাহির হইতে চায়। জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া দেখিয়া, মনে বড় কষ্ট হইল। চারিদিক হইতে সুগভীর মনোকষ্ট আসিয়া, আমাকে ঘেরে ফেল্‌লে। নিরুপায় দেখিয়া চিন্তা দেবীর শরণাপন্ন হইলাম।

আমার নানাপ্রকার উৎকট রোগের মধ্যে একটী প্রধান রোগ দিবাস্বপ্ন। এই হতভাগা রোগটা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া অবধি জীবনটা স্বপ্নময় হয়ে গেছে। বিশেষতঃ চিন্তার সময় এই রোগটার প্রকোপ বেশী। লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, চিন্তা ও নিদ্রা দুইজনে দুইটী পাহাড়ে সতীন। চিন্তার গায়ে মাথা দিয়া শুলে নিদ্রা আর সে দেশে আসে না। কিন্তু আমার বেলায়ও ঠিক তাই, তবে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। আমার কাছে এই দুইজনের মধ্যে নিদ্রা অধিকতর প্রবলা। সমস্ত রজনীর মধ্যে চিন্তার সহিত বাক্যালাপ করিবার জোই নাই। নিদ্রা পথ থেকে আমায় ধরে আনেন। দিনমানে যদি একবার আদরবার তাকে ডাকি, অমনি হিংসাপূর্ণ হৃদয়া পোড়ারমুখী নিদ্রা, তার পাছু পাছু আসিয়া উপস্থিত হয়, এসেই ইন্দ্রিয়গণের ভেতর একটা মহা কোলাহল বাঁধাইয়া দেয়। এবং সেই কোলাহলে আপনি যোগ দিয়ে চিন্তার জীবন্ত শ্রাদ্ধ কর্‌বে, আমার ঘাড়ে চেপে বসেন। তোমার চিঠি পেয়েই আমার এই রোগে ধর্‌লে।

দেখিলাম আমি এক ভয়ঙ্কর বনের সম্মুখে পড়েছি। সে বনের কুল কিনারা নাই। অন্ততঃ প্রথম দর্শনেই আমার এইরূপ বোধ হইল। সে অরণ্যানীর তলদেশে কি আছে দেখিবার জন্য, সূর্য্যরশ্মি আজ শত বৎসর ধরে যে চেষ্টা কচ্চেন কিন্তু গগনস্পর্শী কতকগুলি মহাতরুর সহিত বাহির

হইতে সমস্ত দিন পরামর্শ করিয়া বেগতিক বুঝিয়া চলিয়া যান। তবে প্রবেশ দ্বারটী বড় সুন্দর। পরম সুন্দর বৃক্ষতোরণের নিম্নভাগ দিয়া পরম সুন্দর একটী প্রশস্ত পথ অন্ধকারে যাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। কি জানি কাহার প্ররোচনায় সেই পথ অবলম্বনে, সেই প্রকাণ্ড বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সর্ব্বনাশ! শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! ভূপতিত বৃক্ষপত্রের সর সর শব্দ। কোন নরপিশিতাশী বুভুক্ষু ভীষণ শ্বাপদ এই হতভাগ্য পুঁটীমাছের প্রাণ সংহারে অন্ধকারে ওৎ মারিয়া বসিল নাত। ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, এমন সময়ে অন্ধকারের মধ্য হইতে বিশালবক্ষ প্রশস্তললাট, দীর্ঘবাহু, দীর্ঘশ্মশ্রুধারী এক মহাপুরুষ বাহির হইলেন। কাহাকে কি ভাবিয়াছিলাম মনে করিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। অন্তরের তৃপ্তি সাধনার্থ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন সেই মহাপুরুষ মধুর গম্ভীরস্বরে আমাকে নমস্কার করিতে বারণ করিলেন। আমিও চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনিও ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার দক্ষিণ হস্তে কতকগুলি ফল ও বামহস্তে গুটীকতক চারাগাছ। নিকটে আসিয়া তিনি কহিলেন "আপনাকে দেখিলে নবাগত বলিয়া বোধ হয়। আপনিও কি হেথায় বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "এখানে আর কেহও থাকেন নাকি?"

মহা। এখানে অসংখ্য লোক বিচরণ করিতেছেন।

আমি। "এখানেও লোক স্বেচ্ছায় আইসে, তাহাদের সাহসত বড় কম নয়?"

মহা। 'সাহস বৈকি। কিন্তু এই অন্যায় সাহসের ফল, বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জন।

আমি। এ অরণ্যের নাম কি?

মহা। 'পাশ্চাত্য ভাষা।

আমি। 'এমন অন্ধকার কেন?"

মহা। "পাশ্চাত্যপ্রদেশে এই অরণ্যের অধিশ্বরীর আর একটী পরম মনোরম সুবিস্তৃত উদ্যান আছে। সেই উদ্যান দিবসে বসন্ত সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। সমস্ত অর্থ সেই উদ্যান সাজাইতে ব্যয়িত হয়। এখানে আলো দিবার পয়সা কুলিয়ে উঠেনা। তবে সুবিধের মধ্যে অভ্যাস বশতঃ অনেকেরই এখন অন্ধকারে নজর চলে। অধিকাংশেরই কিন্তু যাবজ্জীবন অন্ধকারে জীবন কাটাইতে হয়।

আমি। 'আপনি কিনিমিত্ত আসিয়াছিলেন।'

মহা। ইহার ভিতর অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আছে। তাহার ফল [illegible] চারা অন্যত্র রোপণ করিলে অনেক উপকার হইবে ভাবিয়া এই সমস্ত লইয়া যাইতেছি, এই অরণ্যের পার্শ্বেই মাতৃভাষা নামে একটী অতি বিস্তৃত প্রান্তর আছে; অনেক কাল হইতেই সে স্থান আবাদ হয় নাই। যে অল্প মাত্র স্থানে [illegible] আবাদ হয় তাহা সমস্ত

দুঃখের সহিত তুলনায় কিছুই নয়। অনেক দিনের পর আবাদ করিলে সেস্থানে উর্ব্বরতায় জগতের সমস্ত স্থানকে পরাভব করিবে ভাবিয়া, আমিও আর কতকগুলি লোক এই স্থান হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া সেথায় রোপণ করিয়া থাকি। আমরা এই উপায়ে পুরাতন বৃক্ষের নবজীবন প্রদান করিয়া অনেক সামান্য লোকের উপভোগ্য করিতেছি। অবশ্য ইহাও বলিয়া রাখি আমরা সকলেই ঠেকিয়া শিখিয়াছি। অন্ধকারে ভ্রমণ করা মহা বিপদ বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

আমি। আমি এস্থানে থাকিতে চাইনা, চলুন আপনার সঙ্গে যাই।

দূরে মনুষ্যের কণ্ঠ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। আমরা নীরবে শুনিতে লাগিলাম শব্দ হইল।—ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়াছে সর্ব্ব শরীরের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিলাম মাগো। রাস্তায় চলিয়াছি তোমার নামে মুগ্ধ হইয়া, তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া, তোমার চরণ চিন্তা করিতে করিতে রাস্তায় চলিয়াছি এমন সময়ে এক অজাগর সর্প আমাকে দেখিয়াই ফোঁস করিয়া উঠিল। আমিও অমনি বাবারে' বলিয়া দশহাত পিছাইয়া পড়িলাম। কই মা, বিজাতীয় ভাষা! এহেন বিপদকালে তুমি তোমার বিমাতৃভক্ত তনয়ের দশাননে আবির্ভূত হইয়া ফাদার, মাদার ডাক ছাড়াইলেনা। জ্ঞান হইয়া অবধি তোমার রাজ্যে বাস করিতেছি, তোমার কাননের ফলে উদর পূরণ করিতেছি। এক্ষণে ঔষধের সময়ে সেই রাজ্যে যাইতে হইল, যে রাজ্যকে এতকাল ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। সে রাজ্যের সেই স্নেহময়ী ঈশ্বরী, আমার অবিমৃষ্যকারিতায় কিঞ্চিন্মাত্রও অসন্তুষ্ট না হইয়া আমার অবজ্ঞায় বিন্দু মাত্রও দুঃখিত না হইয়া এখানে আসিয়া ব্যাধির উপশমার্থে ঔষধ দিয়া গেলেন। গায়ে হাত বুলাইয়া মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রাণে মধু ঢালিয়া গেলেন। তোমা হইতেই কই কোনও কাজ হইল না। মা এক্ষণে উপায়।"

আবার পতিত বৃক্ষপত্রের সর সর শব্দ। ক্ষণেক পরেই "কি মা দড়ী কলসী। জননি! তোমার উপর নির্ভর করিয়া শেষের উপায় দড়ী কলসী।"

গা কাঁপিয়া গেল আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

সহচর বলিলেন আর না এস্থান হইতে পলায়নই শ্রেয়স্কর।

পলায়ন আরম্ভ করিলাম। অন্ধকারে পায়ের উপর কণ্টকের ন্যায় কি যেন একটা পদার্থ ফুটিয়া গেল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল চাহিয়া দেখি আমি তোমাকে পত্র লিখিবার জন্য কলম হাতে করিয়া বসিয়া আছি। রক্তশোষক প্রকাণ্ড মশকরূপী মায়াবী মহিষাসুর চরণরাজ্যে কর সংগ্রহ করিতেছে। দর্শনমাত্রেই কার্য্যসমাধা হইয়াছে বলিবার জন্য ভেরী বাজাইতে বাজাইতে কড়িকাটের আড়ালে উঠিয়া গেল।

পত্র না লিখিবার কারণ এই পত্র লিখিতেছি; কিন্তু দড়ী কলসী আমার দুই কানের কাছে নহবৎ বাজাইতেছে।

তোমারই শ্রীকালঃ—

মানিনী।

(সখীর প্রতি রাধিকা)।

শ্যামের বরণে, নীলিমা চিকণে,
মাখায়ে যতনে আমার দেহ।
তেমতি উজলি, আঁখি ছলছলি,
জলদে বিজলী সাজায়ে দেহ।
সাজ দূতি রাই, আমি লো সাজাই,
তোমায় আমার বরণ রঙে।
কর অভিমান ভাঙ্গি আমি মান,
শ্যামের সুঠাম তেমতি ঢঙে।

২

তেমতি পরাও পীত ধড়া বাসে,
নীলাম্বর মোর ফেলিয়া দূরে।
তেমতি করিয়া, চরণ পাড়িয়া,
সাধিলো তোমায় শ্যামের সুরে।
এই নীলাম্বর, সহচরি ধর,
পর লো সাজিয়া মানিনী রাই।
তোমার চরণে, শ্যামের ধরণে,
ধরিয়া পরম পীরিতি পাই।

৩

কবরী বাঁধিয়া চূড়া দাও শিরে,
শিখিপাখা বাঁধ বামেতে হেলা।
তেমতি হেলিয়া, আঁখিতে ছলিয়া,
করি গো সাধের শ্যামের খেলা।
বসো তুমি রাই, স্বরে স্বরে গাই,
যেমন মাধাই গেয়েছে তানে।
তেমতি ভুলাই, সাজিয়া কানাই,
ভাঙ্গি আমি মান কাঁদিয়া গানে।

৪

আনিয়া মুরলী রাখ মোর কাছে,
দুহাতে সাধি লো যুড়িয়া কর।
ধরি হেলে দুলে, চরণ যুগলে,
যেমতি করেছে নাটুয়া বর।
নীলাম্বরে ধনি, বসি নিতম্বিনী,
ফটাও নলিনী ও রাঙা পায়।
ফিরে ঘুরে ধনি, বসো সরি সরি,
যেন না কিশোরী সে পায় পায়।

৫

দেখিবারে রাই, যত বার চাই,
নয়নে মিলাই নয়ন তোর।
হাসিয়া হাসিয়া মধুর ভাষিয়া,
হেরি লো চকোর চাঁদিমা মোর।
ততবার তুমি, বদন ঝাঁপিয়া,
বসো লো ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠাঁই।
ততবার আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া,
হাসিয়া ভাষিয়া সাধিলো রাই।

৬

বাধে বাধে বলি, ভাবে গলাগলি,
বারে বারে ছলি ভিখারী মত।
মানিনীর মান, বাড়াই দ্বিগুণ,
অপমান জ্ঞান হইয়া হত।
বদন ফিরাই বসো অধোমুখে,
সাধি মনোদুখে মজিয়া সই।
নয়নে নয়ন, ভোলে দরশন,
অমনি পলক ফিরায়ো সই।

৭

তেমতি করিয়া, নয়ন ভরিয়া,
যতবার আমি দেখিতে চাব।
যতবার রাই, কল্প লতিকা,
বলিয়া ছলিয়া ঘেঁসিয়া যাব।

ততবার যেও জলেতে ডুবিয়া,
মানেতে মজিয়া মরিয়া যায়।
ততবার আমি এ পাশ ওপাশ,
হয়ে রাধাদাস সাধিব পায়।

৮

কাঁদিবার ছলে, রাধা রাধা বলে,
মজায়ে সকলে গাইব গান।
ডুবাইতে মান, গলাতে পাষাণ,
সেই সুধাদানে ভুষিব প্রাণ।
তবু তুমি রাই বদন ফিরাই,
হাসিবে বালাই টিপিয়া বেশ।
আড়ে আড়ে চাই, কালারে মজাই,
বদন সবাই বসনে ঢেক।

৯

থেকে থেকে কালা, পেয়ে পেয়ে জ্বালা,
শুনাবে মনের বেদনা যত।
যতই কহিবে, নিঠুর তোমায়,
নিঠুর মানেরে কবিতে হত।
ততই তোমার, সে নিঠুর ভাষে,
সে নিঠুর মানে বাড়িবে সুখ।
মনে মনে মান, তরঙ্গ তুফান,
উঠিবে বাড়িয়া ভরিয়া বুক।

১০

সাধিব আমি লো, সাধিবে সখীরা,
সাধিবে সমীর সুরভি দানে।
উড়ায়ে বসন, করি পরশন,
তুষিবে পবন মধুর গানে।
সাধিবে কোকিল, ভ্রমর নিখিল,
শ্যামের নিখিল সখারা যত।
শুনি সেই সাধে, ডুবিবে লো রাধে,
মানের প্রমাদে মজিয়া তত।

১১

রাবেক আমারে সাজাও সুন্দরি,
শ্যামের বরণে চিকণ কাল।
রাবেক তোমারে সাজাই সুন্দরী,
রাধার বরণে রূপের আলো।
তেমতি করিয়া, মানেতে মজিয়া,
বসো লো সাজিয়া, মানিনী রাই।
তেমতি করিয়া, আমি লো কালিয়া,
চরণ ধরিয়া, সাধিতে যাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

মৃচ্ছকটিক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নাম করণ

নাম করণ—কাব্য বা নাটকের নাম করণ সম্বন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কোন বিশেষ নিয়ম লক্ষিত হয় না। কোন বিদেশীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে সেরূপ কোন নিয়ম আছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত কবিগণ কোন স্থলে গ্রন্থের অন্তর্গত প্রাণভূত অংশ, কোন স্থলে বিষয়, আর কোন স্থলে

বা নায়ক নায়িকার নাম, যেখানে, যাহাকে গ্রন্থের মর্ম্মার্থ অবগতির জন্য সুকর উপায় বিবেচনা করিয়াছেন; সেই খানে তাহাই অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থের নাম করণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত একই কবির ভিন্ন ভিন্ন কাব্য বা নাট্য গ্রন্থের বিভিন্ন রীতিতে নাম-করণ করিতে দেখা যায়। এই জন্যই কালিদাসের একখানি নাট্য গ্রন্থের নাম "অভিজ্ঞান শকুন্তল', আর একখানি নাট্য গ্রন্থের নাম "মালবিকাগ্নিমিত্র"। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' যেমন নায়ক নায়িকার নাম মাত্র সঙ্ঘটিত, সেইরূপ 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' কে 'দুষ্মন্ত শকুন্তল' এইরূপ নামে অভিহিত করিলে ও কোন ক্ষতি হইত কি না অর্থাৎ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ সমান ভাবে অবগত হওয়া যাইত কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব অবশ্যই না। কারণ অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রাণ, নায়ক নায়িকার চরিত্রের লোকোত্তর চমৎকারী কার্য্য বিশেষ নয়। ইহার প্রাণ অভিজ্ঞান, অভিজ্ঞানই ইহার নাট্যত্বের প্রধান হেতু, এবং অভিজ্ঞানই, ইহার রচয়িতার লোকোত্তর কবিত্ব বা কল্পনা শক্তির পরিচায়ক। মহর্ষি বেদব্যাস শকুন্তলার চরিত লইয়া যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন, বোধ হয় পৃথিবীতে সেরূপ কাব্য অতি অল্প। অভিজ্ঞান অংশ পরিত্যাগ করিলে কালিদাসের শকুন্তলোপাখ্যান তাহার ছায়ার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে কিনা সন্দেহের কথা। যিনি অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন কালিদাস কাব্যের বীজ বপনের সঙ্গে নায়ক নায়িকার শুভদৃষ্টির সময় একটি অঙ্গুরীয়ক বাহির করিলেন। যখন সখীদিগের কথায় শকুন্তলার ক্রোধানল একবারে প্রজ্বলিত, অতিথি সৎকারের কর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইয়া, সখীদিগের অনুরোধ অবহেলা করিয়া যখন তিনি উটজগমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন অনুসূয়া একটা সামান্য বৃক্ষ সেচনের দাবী করিয়া তাঁহাকে আটকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু সে দাবী অতি সামান্য, দুটা গাছের গোড়ায় জল দিলেই চুকিয়া যাইত, শকুন্তলা ক্রোধভরে উটজে চলিয়া যাইতেন, আর ঐখানেই বোধ হয় অঙ্কুরোদ্গম হইতে না হইতেই কাব্যের বীজ নষ্ট হইয়া যাইত। এই ঘোর বিভ্রাটের সময় কবি একটী অঙ্গুরীয়ক বাহির করিলেন। অমনি সকল বিভ্রাট বিদূরিত হইল। শকুন্তলার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, কাব্যে প্রাণের সঞ্চার হইল এবং ঐখান হইতেই অভিনয়ের সূত্র পাত হইল। কেননা ক্রোধবেগে শকুন্তলা উটজে গমনোদ্যম অনুসূয়া কর্ত্তৃক তাহার অবরোধ, রাজার অঙ্গুরীয়ক প্রদান এবং অঙ্গুরীয়ক দর্শন জন্য শকুন্তলার মানসিক পরিবর্ত্তন এগুলি অভিনয় দর্শন ভিন্ন ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

এই অঙ্গুরীয়কটিই অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের জীবন সর্ব্বস্ব, সংক্ষেপে বলিতে হইলে কালিদাসের জীবন সর্ব্বস্ব অভিজ্ঞান শকুন্তল, এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলের জীবন সর্ব্বস্ব অভিজ্ঞান। তাই বলি 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' এই নামটিই গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বোধের একমাত্র সহজ উপায়।

কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া

আর পাঠকদিগের ধৈর্য্যভঙ্গ করিতে ইচ্ছা নাই। যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে গ্রন্থের নাম-করণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বিশেষ নিয়ম না থাকিলেও সংস্কৃত কবিগণ বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবির ন্যায় স্বীয় গ্রন্থের যথেচ্ছ অর্থ বিহীন একটা নাম দিয়া যান নাই। যে নাম দ্বারা অতি সহজে গ্রন্থের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া যাইতে পারে সেই নামেই তাঁহারা গ্রন্থকে প্রখ্যাপিত করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের নামটি কিরূপ দেখা যাউক। মৃচ্ছকটিক এই নামটি মৃত্ এবং শকট এই দুই পদের যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে মৃত্ শব্দের অর্থ মাটি এবং শকট শব্দের অর্থ গাড়ী। মাটীর গাড়ীকে আশ্রয় বা অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ রচিত, তাহার নাম মৃচ্ছকটিক। কেহ কেহ বলিতে পারেন—আমরা গতবার যে ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছি তাহাতেত এইরূপ বুঝিয়াছি যে শকট বা প্রবহণের বিপর্য্যয়ই মৃচ্ছকটিক গ্রন্থের প্রাণ বা নাট্যত্বের হেতু। ইহার সৌন্দর্য্যই বল, চমৎকারিত্বই বল, আর নাট্যত্বই বল সবই সেই শকট বিপর্য্যয় হইতে আবদ্ধ। এরূপ স্থলে কেবল শকটিক নাম না রাখিয়া মৃচ্ছকটিক নাম রাখা হইল কেন? মৃচ্ছকটিক বলিতে মাটীর শকটকে আশ্রয় বা অধিকার করিয়া যাহা রচিত, অর্থাৎ মাটীর শকট যাহার বীজ বা প্রাণ। কিন্তু গ্রন্থে মাটীর শকটের যেরূপ উপন্যাস করা হইয়াছে তাহাতেত সেরূপ কিছুই বোধ হয় না। যে দিবস রজনী যোগে বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে অভিসার করিয়াছিলেন, সেই দিবস বৈকালবেলা চারুদত্তের শিশু-পুত্র রোহসেন কোন ধনী প্রতিবেশী পুত্রকে সোণার গাড়ী লইয়া খেলিতে দেখিয়া 'সোণার গাড়ী লইয়া খেলিব' এইরূপ আবদার করে। চারুদত্তের সময় সেরূপ ছিল না। তখন বালক ভুলাইবার জন্য বহু চেষ্টায় একখানি মাটীর গাড়ী দেওয়া হয়, বালক তাতে ভুলেনা।* রাত্রে কোন রকমে ঘুমাইয়া ছিল, সকালে উঠেই আবার সেই আবদার।

বালক বালিকা আবদার করিলে নূতন লোক কিম্বা কোন আত্মীয় কুটুম্ব উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে ভুলাইবার জন্য দাস দাসীরা প্রায়শঃই তাঁহাদিগের নিকট লইয়া যায়। এস্থলে তাহাই হইল। দাসী রোহসেনকে লইয়া বসন্তসেনার নিকট উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা বালকের আবদার লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দাসী ঐ মাটির গাড়ীর কথা বলিল। তাহা শুনিয়া বসন্তসেনা আপানার গায়ের অলঙ্কার গুলি বালকের হাতে দিয়া বলিলেন লও এই গুলি লইয়া তুমিও সোনার গাঁড়ী ক্রয় করিও। বালক অলঙ্কার গুলি পাইয়া মাটীর গাড়ীর কথা ভুলিল, কেবল বালক-সুলভ আশঙ্কার বশে একবার বলিল, 'আমি উহা লইব না তুই কাঁদবি যে।' এইত গেল মাটির গাড়ীর কথা। গ্রন্থের পূর্ব্বে বা পরে আর কোন স্থানেই উহার নাম গন্ধ নাই। কেবল বালকের ক্রন্দন দেখিয়া বসন্তসেনা প্রশ্ন করিলে দাসী তাহার উত্তরে মাটীর গাড়ীর কথা বলিল। ঐ কথার যেখানে উৎপত্তি, সেই খানেই নিবৃত্তি, স্থায়িত্ব কিছুই-

নাই, এমন অস্থায়ী [illegible] একটা গ্রন্থের প্রাণ স্বরূপ কিরূপে হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে আমরা বলিব তাহাই বটে, স্থূল দৃষ্টিতে এইরূপই বোধ হয় বটে কিন্তু বুদ্ধি একটু স্থির করিয়া, দৃষ্টিকে একটু সূক্ষ্ম করিয়া অভ্যন্তর দর্শন করিলে দেখিতে পাইবে মাটীর গাড়ীখানি কতগুলি অলঙ্কারে পরিণত। ঐ অলঙ্কার গুলি আবার সেই বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কার। অভিজ্ঞান শকুন্তলে কালিদাস যেমন একটি অঙ্গুরীয়ক লইয়া তাহারই নানাবিধ অবস্থার সহিত নাটকের প্রথম হইতে শেষ অবধি অদ্ভুত বৈচিত্র সম্পাদন করিয়াছেন, শূদ্রক কবিও ঐ অলঙ্কার গুলি লইয়া ঠিক সেই রূপ করিয়াছেন।

যেমন সখীদিগের কথায় শকুন্তলা ক্রোধভরে অতিথি সেবার শেষ করিয়া, কথার শেষ করিয়া, কাজে কাজেই নাটকের বীজ শুষ্ক করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কবি একটি অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া নাটকের জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি চারুদত্তের বাড়ী হইতে বসন্তসেনা ভদ্রতা-ব্যবহারে বাধ্য হইয়া সব শেষ করিয়া যাইবার সময় কবি কতকগুলি অলঙ্কার বাহির করিয়া নাটকের জীবন সঞ্চার করিলেন। যদি সে দিবস বসন্তসেনা নিজের অলঙ্কার গুলি গচ্ছিত না করিয়া চলিয়া যাইতেন তাহা হইলে বীজ বপনের সহিত মৃচ্ছকটিকের শেষ করিতে হইত। কেননা বসন্তসেনার গমনের সহিতই সকল কথারই শেষ হইয়া যাইত। তাই বলি অলঙ্কার গুলির গচ্ছানতেই মৃচ্ছকটিকের জীবন সঞ্চার হইল। পরে দেখ—অলঙ্কার গুলি গচ্ছিয়া রাখিয়া বসন্তসেনা নিজ গৃহে চলিয়া গেল। মৈত্রেয় এবং চেটের মধ্যে ঐ অলঙ্কার গুলি রক্ষা করিবার পালা হইল। দিনের বেলা চেট রক্ষা করিবে, রাত্রে মৈত্রেয়। এই নিয়মে কিছু দিন যায়। হটাৎ একদিন রাত্রে একজন চোর চারুদত্তের গৃহে সিঁদ দিয়া সেই অলঙ্কার গুলি চুরি করিয়া লইয়া গেল।

চোরের নাম সার্ব্বলিক। জাতি ব্রাহ্মণ। সে বসন্তসেনার দাসী মদনিকার উপর আসক্ত। এরূপ আসক্ত যে মদনিকার বেশ্যার গৃহে দাসীভাব ঘুচাইয়া তাহাকে কুলবধূর দান করিতে উদ্যত। মদনিকা বসন্তসেনার ক্রীত দাসী হইয়া ও বয়স্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে মনের কথা অবাধে চলিত এবং উভয়ে উভয়ের অন্তরঙ্গ ছিল। তথাপি মদনিকা ক্রীত দাসী, বসন্তসেনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা বটে কিন্তু তাহার প্রিয়—স্বাধীনতা।

সেকালে এইরূপ রীতি ছিল যে কোন স্ত্রী বা পুরুষের দাস্য মোচন করিতে হইলে তাহার প্রভুকে অভীপ্সিত ধন দিতে হইত। সার্ব্বলিক মদনিকাকে স্বাধীন করিবার প্রস্তাব করিলে মদনিকা তাহাকে অর্থের কথা বলে। সার্ব্বলিক ব্রাহ্মণ জাতির বদমায়েস। বালক কালে বিদ্যাভ্যাস না হইলেও সাহস অসীম, সকল কার্য্যেই দক্ষতা, কৌশল এবং নৈপুণ্য ও প্রচুর। সার্ব্বলিকের অসাধ্য কার্য্য জগতে কিছুই নাই। মদনিকা যখন বলিল, প্রচুর অর্থ ভিন্ন তাহার মোচন হইবে না সার্ব্বলিক বলিল "আচ্ছা সে

জন্য কিছু চিন্তা নাই আমি অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত চলিলাম তুমি স্থির হও।”

এই কথায় স্ত্রীলোককেত বুঝাইল। অর্থ সংগ্রহ হইবে কিরূপে, যাকিছু পৈতৃক অর্থ ছিল তাহাত বিলাসিতা চরিতার্থ করিতে ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে উপায় কি? উপায় চৌর্য্য, তদ্ভিন্ন আর কি। ভিক্ষা ছি। সে অতি ঘৃণিত কার্য্য, লোকে কতবার প্রত্যাখ্যান করিবে, কতবার মুখ বাঁকাইবে, কতবার অবজ্ঞাপূর্ব্বক সম্বোধন করিবে তাহার পর এক মুটা দিবে তাহাতে যদিও কোন রূপে পেটের জ্বালার নিবৃত্তি হইতে পারে কিন্তু মদনিকার মোচন অসম্ভব। তবে চাকরি—সেত কুক্কুর বৃত্তি। সর্ব্বদা পরের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, পরের মনস্তুষ্টির জন্য নিজের সত্তার অবধি লোপ করিতে হয়, তাহাতেও বড় জোর প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজী হইতে পারিলে অক্লেশে উদরেরই পূর্ত্তি হয়। ইহাতে মদনিকার মোচনত কখনই হইতে পারেনা, অতএব চৌর্য্য ভিন্ন আর উপায় কি? চুরি করবিতো কর সেই দরিদ্র চারু দত্তের ঘরে বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কার। সেই অলঙ্কার গুলি চুরি করিয়া সার্ব্বলিক মদনিকাকে মোচন করিতে বসন্ত সেনার গৃহে উপস্থিত। বসন্তসেনা প্রথমে জানিতে পারিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। পরে ধৈর্য্য সহকারে মদনিকাকে বিনামূল্যে মোচন করিয়া সার্ব্বলিকের সহধর্ম্মিণী করিয়া দিলেনও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

এদিকে অলঙ্কারগুলি চুরি হইয়াছে শুনিয়া চারুদত্তের স্ত্রী ধূতাদেবী, গচ্ছিতাপহারী এই অপযশ হইতে স্বামীকে রক্ষার নিমিত্ত পিতৃদত্ত একমাত্র সম্বল অমূল্য রত্নমালা মৈত্রেয়ের হস্তে চারুদত্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। চারুদত্ত মৈত্রেয় দ্বারা ঐ রত্নমালা বসন্ত সেনার নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে তোমার গচ্ছিত ধন আমি দ্যূত ক্রীড়ায় হারিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে এই রত্ন মালা প্রেরণ করিলাম। বসন্তসেনা পূর্ব্বেই গচ্ছিত অলঙ্কারের বিষয় কেবল অবগত হইয়াছিলেন এমন নয়, সে গুলি তাঁহার হস্ত গত হইয়াছিল। কাজেই তিনি আর কিছু না বলিয়া হাসিতে হাসিতে রত্নমালা গ্রহণ করিয়া বলিলেন মৈত্রেয় সেই দ্যূতকরকে বলিও অদ্য রাত্রে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ-সুলভ বুদ্ধিতে বিবেচনা করিল, রত্নমালা পেয়েও সন্তুষ্ট নয় আর কিছু চায়। বসন্তসেনা ভাবিলেন এই একটা দেখা করিবার সুযোগ, সেই অপহৃত অলঙ্কার গুলি ধারণ করিয়া গিয়া চারুদত্তকে সকল প্রকার শঙ্কা হইতে মুক্ত করিব। বসন্তসেনা সেই অলঙ্কার গুলি ধারণ করিয়াই অভিসার করিয়াছিলেন। বালকের কান্নায় সেগুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে বোধ হয় পাঠক জানিতে পারিলেন মৃচ্ছকটিক এবং অলঙ্কার একই জিনিষ। ভাবিয়া দেখিলে প্রবহণ বিপর্য্যয়ের মূলেও ইহাকে দেখিতে পাইবে। প্রবহণ বিপর্য্যয়ের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল বসন্তসেনার মনের বেগ। বসন্তসেনা যদি ধীরে সুস্থে আসিয়া শকট বাহককে জিজ্ঞাসা করিয়া গাড়ীতে উঠিতেন, তাহাহইলে প্রবহণ বিপর্য্যয় হইত কি না সন্দেহ সুতরাং

ঐখানেই নাটকের শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার মনের বেগ অধিক, চারুদত্তের দর্শন জন্যত আছেই, তাহা অপেক্ষাও ধূতাদেবী অলঙ্কারের কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করিবেন। সম্ভবত সেই অলঙ্কারগুলির মধ্যে রত্নাবলী ছড়াটী লুকাইয়া ফিরিয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে ও শুধু শুধু তাঁহার নিকট হইতে অত মূল্যের অলঙ্কার গ্রহণ করা যে চারুদত্ত-পত্নীর অনুমোদিত হইবে না, ইহা একাবারে স্থির সিদ্ধান্ত। কাজেই যত শীঘ্র পারা যায় ঐ স্থান ত্যাগ করিতে তাঁহার একটা মনের বেগ হইয়াছিল। সেই জন্য সম্মুখে যে শকট দেখিলেন, জিজ্ঞাসা বাদ না করিয়াই তাহাতেই উঠিলেন। অলঙ্কার কেবল এই অবধি করিয়া ক্ষান্ত নয় ইহার আরও কার্য্য আছে।

চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতীক্ষা করিয়া বসন্তসেনাকে না আসিতে দেখিয়া জীর্ণোদ্যান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শুনিলেন বসন্তসেনা অলঙ্কার গুলি দান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অবশ্যই নিজ বাটীতেই ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি কাল ব্যাজ না করিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বাটীতে অলঙ্কার গুলি দিয়া আসিতে বলিলেন।

চারুদত্ত যখন বসন্তসেনা হত্যাপরাধে শকার কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া রাজদ্বারে নীত হইয়াছেন মৈত্রেয় তখন পথে অলঙ্কারের পুটুলি বগলে করিয়া যাইতেছেন। পথেই চারুদত্তের বিপদের কথা শুনিলেন। বসন্তসেনার বাটীতে না গিয়া রাজদ্বারে চলিলেন। সেখানে শকারের সহিত মুখোমুখি হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, যেমন হাত তুলিলেন অমনি বগল হইতে অলঙ্কারের পুটুলি সভার মধ্যেই পতিত হইল। চারুদত্তের দোষ প্রমাণ হইতে আর বাকী রহিল না। অলঙ্কারের খেলা বড় আশ্চর্য্য। গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ অবধি অলঙ্কার গুলি বিচিত্র লীলা দেখাইল। অলঙ্কারই নাটকের প্রাণ এবং নাটকের নাটকত্বের হেতু। কিন্তু অলঙ্কারই মাটীর গাড়ীতে পরিণত অথবা মাটীর গাড়ীর সহিত অলঙ্কারের এত মাখামাখি যে উভয়কেই এক বলিলেই হয়। এই জন্যই কবি গ্রন্থের নাম 'মৃচ্ছকটিক' রাখিয়াছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যদি তাহাই হয় তবে মৃচ্ছকটিক এরূপ নাম অপেক্ষা 'আলঙ্কারিক' এই নামটি রাখিলেও নাম দ্বারা গ্রন্থের মর্ম্ম আরও সহজে অবগত হওয়া যাইতে পারিত। আমরা বলি তা নয়। কেবল 'আলঙ্কারিক' শব্দটি কিছু সন্দিগ্ধ। ইহা সচরাচর অলঙ্কারজ্ঞ পণ্ডিতকে বুঝাইয়া থাকে। ইহার সহিত একটা বিশেষ বিশেষণের যোগ না করিলে ঠিক মর্ম্মার্থ বোধ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। সেরূপ বিশেষণ যোগ করিলে নামটি অতি দীর্ঘ ও শ্রুতিকটু হইত। সুকুমার মতি কাব্য অধ্যয়ন কারীর নিকট তাদৃশ নাম বিশেষ অপ্রিয় হইতে পারে এই আশঙ্কায় গ্রন্থকার একটু গৌণপথ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ 'মৃচ্ছকটি' কথাটি গ্রন্থে অস্থায়ী ভাবে উপন্যস্ত হইলেও ইহা দ্বারা একটি স্থায়ী করুণ রসের প্রকাশ হইতেছে। যে ব্যক্তি কোন দিন কোটি কোটি

অর্থের অধিপতি ছিল তাহার একদিন এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে পুত্রের খেলিবার জন্য মাটীর গাড়ীও দুর্লভ। এদিকে ঐ মৃচ্ছকটের সহিত বসন্তসেনার অলঙ্কারের মাখামাখি থাকায় সেই করুণরস আবার গ্রন্থ মধ্যে প্রধান ভাবে বর্ণনীয় আদিম রসের পরিপোষক। এই সকল কথা, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে 'মৃচ্ছকটিক' এই নামটি যে ইহার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

তারে কি বাসিব ভাল ?

১

সখিরে! আমারে কি বুঝাইবি বল।
আমি কি বুঝিনা হায়, তাহারে না পাওয়া যায়,
যে ধন কাটিয়া যায় আপনি অঞ্চল ?
বুঝি না কি তার তরে, যে মরে সে মিছা মরে
যে ফেলে সে মিছা ফেলে নয়নের জল ?
গলায় মারিয়া ছুরি, যে যায় আপনি চুরি,
তার লেগে ভেবে মরি কে হেন পাগল ?
সখিরে! আমারে কি বুঝাইবি বল ?

২

সখিরে আমারে কি বুঝাইবি বল ?
আমিত আপনি বুঝি, আমি তারে নাহি খুঁজি
যে পাখী কাটিয়া গেছে আপনি শিকল।
কঠিনা পাষাণী শারী, কঠিনা পাষাণী নারী,
মরমে মমতা নাই চখে নাই জল।
এতদিন ভাঙ্গা বুকে, এতই কি ছিল দুখে,
রয়েছে প্রাণের কণা বিঁধে পদতল ?
ঘৃণা লজ্জা আশে পাশে, সে বুঝি না ভালবাসে
নিশ্বাসে পুড়িয়া গেছে হৃদয় কোমল!
যাক্ সে চলিয়া যাক্, চিরকাল সুখে থাক্,
ভুলেও ভাবিনা তারে, ভাবিয়া কি ফল।
সে যথা ভুলেছে তথা ভুলেছি সকল!

৩

সখিরে তবু কেন ফেলি আঁখি জল ?
নিশ্বাসে নিশ্বাসে হেন, পরাণ কাঁপিছে কেন,
ভাঙ্গিছে চুরিছে যেন পাঁজর সকল।
তবু হেন হাহাকরে, কাঁদি কেন বারেবারে,
প্রাণের ভিতরে কেন জলে দাবানল।
শুনিবি! শুনিবি সই ? আয় তবে আয় কই,
কইসে প্রাণের কথা ব্যথা অবিরল।
সে গেছে যদিও হায়, প্রেম তার নাহি যায়..
পরাণে বাঁধিয়া আছে পাষাণ শৃঙ্খল।

৪

সখিরে! প্রেম নাকি নিতান্ত কোমল ?
তুইও ত বলিতি আগে, প্রেমেতে ভর নাহি লাগে,
না ছুইতে ছিঁড়ে যায় কুসুমের দল!
যারা প্রেম করিয়াছে, তারাও ত বলিয়াছে,
ভাঙ্গে সে আঁখির ঠারে ঠুন্‌কো কেবল!
কত জনে হেসে খেলে, পথে ঘাটে ভেঙ্গে ফেলে,
প্রেম কি প্রাণের ব্যথা ?—কথার কৌশল!
সখিরে! এমনি নাকি বুঝাইতি বল ?—

৫

কিন্তু—
সখিরে! আমার কি কপালের ফল,

স্নেহ তার, প্রেম তার, নহেরে কুসুম হার,
লৌহময় বজ্রময় পাষাণ শৃঙ্খল।
ছিঁড়িতে নাহিক পারি, কি কঠিন প্রেম তারি,
মিছা টানাটানি করি বুকে নাই বল।
যতন করি যে এত, কিছুতে গলেনা সেত,
দিন রাত্ এত ঢালি নয়নের জল।
বৃথাই এ জল ঢালা, নিবেনা প্রাণের জ্বালা,
নিবেনা সে পোড়া প্রেম অশান্তি অনল।
এদীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝড়ে, একটু নাহিক নড়ে,
চাপিয়া বসেছে বুকে যথা হিমাচল।
বৃথা করি তোলপাড়, বৃথা করি হাহাকার,
বেঁধেছে সাগর বুকে পাষাণ শৃঙ্খল।
হায় কি কঠিনা নারী, কি কঠিন প্রেম তারি,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি বুকে নাই বল,
হায়রে নারীর প্রেম লোহার শিকল।

৬

সখিরে। কেন ফেলি নয়নের জল।
বঝিলি কি এতক্ষণে, তারে না করিয়া মনে,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল।
ভাঙ্গিতে সে বেড়ী হায়, পরাণ ভাঙ্গিয়ে যায়
এত করাঘাত করি কাটে হৃদিতল!
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ভার, এ বিলাপ হাহাকার,
প্রাণ করে ছট্ ফট—পাগল পাগল,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল,
সখিরে! বুঝিলি কি না বল!

৭

সখিরে! বুঝিলি কিনা বল।
প্রেম যার ঘৃণা করি, ছিছিছি লজ্জায় মরি,
তারে কি বাসিব ভাল হয়েছি পাগল?
তাহারে করিতে মনে, ঘৃণা-লজ্জা অভিমানে,
নয়ন ঢাকিয়া ফেলি চাপি করতল!
শুনিতে তাহার কথা, প্রাণে বড় লাগে ব্যথা
হৃদয় ভরিয়া যেন উঠে হলাহল।
সে যদি থাকিত কাছে, তবে কিরে প্রাণ বাঁচে
কবে যে জ্বলিত বুকে চিতার অনল।
সে যেরে এদেশে নাই, ভালই হয়েছে তাই,
সে আমার মহাশত্রু—মহা অমঙ্গল!
তারে কি বাসিব ভাল—হয়েছি পাগল?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও আলোচনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

জ্যামিতিও (geometry) হিন্দুদিগের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রোফেসর ওয়ালেস্ (professor Wallace) পূর্ব্বোক্ত প্রোফেসর প্লেফায়ারের হিন্দুদিগের ত্রিকোনমিতি বিষয় প্রস্তাব দর্শন করিয়া এইরূপ বলিতেছেন:-"However ancient, therefore, any book may be in which we meet with a system of trigonometry,

we may be assured it was not written in the infancy of science. We may therefore conclude that geometry must have been known in India long before the writing of the "Surya Siddhanta."

অঙ্ক শাস্ত্রে (Arithmetic) হিন্দুদিগের বিশেষ কীর্ত্তি যে তাঁহারা দশমিক ভগ্নাংশ (decimal fractions) আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা প্রাচীন গ্রীকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে Edinburgh Review পত্রিকায় (Vol XXIX p 147) এইরূপ লিখিত আছে.—"All this is done in verse The question is usually propounded with enigmatical conciseness; the rule for the computation is given in terms somewhat less obscure; but it is not till the example which comes in the third place, has been studied, that all ambiguity is removed No demonstration nor reasoning, either analytical or synthetical, is subjoined, but on examination, the rules are found not only to be exact, but to be nearly as simple as they can be made, even in the present state of analytical investigation."

হিন্দুরা যে আরবদিগের নিকট কোন বিষয় শিক্ষা করেন নাই তাহা নিম্নোদ্ধৃত মহাত্মা এলফিনষ্টোনের লেখনী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

"Whatever the Arabs possessed in common with the Hindus, there are good grounds for thinking that they received from the latter nation, and however great their subsequent attainments and discoveries, it is to be remembered that they did not begin till the eighth century when they first gained access to the treasures of the Greeks"

যদিও মুসলমানদিগের ধর্ম্মান্ধতা ও কঠোর শাসননিবন্ধন হিন্দু শাস্ত্র সমূহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে তত্রাচ ব্রিটীশ সিংহের ভারত সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসি জ্যোতির্ব্বেত্তা ডিলাহায়ার (De la Hire) যে নক্ষত্র সকল গণনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু জ্যোতির্বিৎ রাজা জয়সিংহ সংশোধন করিয়াছিলেন।

আমাদিগের মত সমর্থন করিবার জন্য যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা এক বাক্যে বলিতেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বিজ্ঞান শিক্ষার উচ্চ সোপানে উঠিয়াছিলেন। এই বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গিয়া আমাদের প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই বিষয় অত্যাবশ্যকীয় ও অবশ্য জ্ঞেয়, অতএব পাঠক মহাশয় নিজ ঔদার্য্য গুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি পরি-

মার্জ্জিত হয়, বিজ্ঞানের বলে আমাদের মনের কুসংস্কারের অপনয়ন হয়। বিজ্ঞানই জগতের রহস্যের দ্বার আমাদিগের নিকট উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। বিজ্ঞানবলে আমরা বলীয়ান হই। ইহা দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি সমস্ত বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি। যে বিজ্ঞানকে অবলম্বন ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না,—বিজ্ঞানকে অবলম্বন ব্যতীত মানবজাতির সুখের বৃদ্ধি হইতে পারে না—বিজ্ঞানকে অবলম্বন ব্যতীত আমরা কোন প্রকার তত্ত্বের প্রকৃত অনুসন্ধান করিতে পারি না. বিজ্ঞানের প্রণালীব্যতীত মানবের মন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বিজ্ঞানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন ও তজ্জন্যই ভারতবর্ষ সমস্ত প্রাচীন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গণ্য ও মান্য ছিলেন। আজ কিনা আমরা বলি যে ভারতবর্ষীয়গণ বিজ্ঞান জানিতেন না। প্রকৃত হিন্দুসন্তান ইহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই সকল কেবল সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য। যখন সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে পঠিত হইতে থাকিবে,—তখন [illegible] সকল অমূলক, মিথ্যা ও অপ্রামাণিক কথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। আমরা বিশেষ করিয়া বলিতেছি যদি যথার্থ আপনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাও, তবে প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণের ন্যায় বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ কর। ইউরোপ খণ্ড আজি বিজ্ঞানবলে বলীয়ান এবং ইহা ক্রমশঃ দ্রুতপদে বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ফরাসি পণ্ডিত রেনা বলেন, আর এক শতাব্দীর পর বিজ্ঞানব্যতীত আর কোন বিদ্যাই মনুষ্য মণ্ডলীর আলোচ্য থাকিবে না। এক শত বৎসর পরে কি হইবে বলা বড় দুঃসাধ্য। তবে সমস্ত জগতে না হউক, ইউরোপে ও আমেরিকায় বিজ্ঞান ক্রমশঃ অপ্রতিহত বলে রাজ্য বিস্তার করিতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিবার বিজ্ঞান একমাত্র সহজ উপায়। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে অতীব উপাদেয় ও মনোহর। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা স্বরূপ। জগতের সমুদায় ব্যবহার্য্য বস্তুই বিজ্ঞানের ফল। বাষ্পীয়যান ও বাষ্পীয় পোত হইতে সাবান দেশালাই পর্য্যন্ত সকলই বিজ্ঞান দেবী কর্ত্তৃক প্রসূত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমরা বিজ্ঞান দেবীর অর্চ্চনা না করি. সে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা বালুকারাশির উপরে সুরম্য হর্ম্ম্যমালা নির্ম্মাণের ন্যায় অসম্ভব। বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে বাণিজ্যে, শিল্পে ও অন্যান্য সকল ব্যবহারোপযোগী বিষয়ে আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব। যে সময়ে আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার স্রোত প্রবল বেগে ধাবিত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যজাতিদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব ও নবজীবন লাভ করিব।

ধর্ম্ম শাস্ত্র হিন্দুদিগের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। অনেক মহাত্মা ধর্ম্মানুসন্ধান করিতে গিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া

ছেন। বেদই হিন্দুদিগের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কয় জন হিন্দু (সম্পূর্ণরূপে বেদ পাঠ করা দূরে থাকুক) ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিষয় যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে তৎসমুদয় বেদ হইতে। ইহাঁদিগের বিষয় জানিবার জন্য বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ আর কিছুই নাই। বেদবিরুদ্ধ কার্য্য মাত্রই হিন্দুদিগের ত্যজ্য ছিল। মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মসংহিতাতে, রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদি গ্রন্থে হিন্দুদিগের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের বিষয় বিশেষ জানিবার বেদ ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। অতএব বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের ষড়্দর্শনের মূলভিত্তি যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তাহা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

সংস্কৃত ভাষায় যত প্রকার গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে কাব্যই অতীব মনোহর। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, কালিদাস, ও ভবভূতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহারা ঘটনাকে এরূপ রঞ্জিত করিতে পারিতেন যে তাহা পাঠ করিলে কবির চিন্তাশক্তির সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা এলফিন্‌ষ্টোন তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ বলিতেছেন :—

"The great strength of the Sanskrit poets as well as their great delight is in description. Their most frequent subjects are scenes of repose and meditation, amidst sequestered woods and flowery banks, fanned by fragrant gales and cooled by limpid waters, but they are not unsuccessful in cheerful and animated landscape"*

সুপ্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি পর্ব্বত, গিরি, গুহা, নদী, ও অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার বর্ণনা অতীব সুন্দর ও মনোহর। তিনি তাঁহার উত্তর চরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে দণ্ডকারণ্য বর্ণনা বিষয়ে এইরূপ বলিতেছেন—

"স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
"স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
"এতে তীর্থাশ্রমগিরি সরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
"সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ।

এই শ্লোক পাঠ করিলে দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি ভবভূতির এই একটি অসাধারণ গুণ জানিতে হইবে। তাঁহার গ্রন্থে অর্থের ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য যথেষ্টরূপে লক্ষিত হয়। তাঁহার মালতিমাধব গ্রন্থে অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও রচনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা এলফিন্‌ষ্টোনের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত [illegible] তাহার পরে তিনি এই প্রকার বলিতেছেন—

"Such is the description of the country round Ujein in the Ninth Act of the Malati and Madhava; where mountains rocks, woods, villages, and glittering rivulets

combined to form an extensive and varied prospect. The city occupies the centre of the view, its towers, temples, pinnacles, and gates are reflected on the clear stream beneath; while the groves on the banks refreshed with early rain, and meadows brightening with recent shower afford a luxuriant resting place to the heavy uddered kine Sometimes also they raise their efforts to the frowning mountain, and the gathering tempest. Bhavabhuti, in particular, excels in this higher sort of description. His touches of wild mountain scenery in different places, and his description of the romantic rocks and solemn forests round the source of the Godavery are full of grandeur and sublimity."

মহাকবি কালিদাসের বিষয় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"Calidasa excels in tenderness and delicacy and is full of highly poetical description. The beauties of his pastoral drama of "Sacontala" have long been diservedly admired The "Hero and Nymph" in Mr. Wilson's collection is in a still more romantic strain and may be compared (in the wildness of its design at least) to the "Tempest" and "Midsummer Night's dream"

মহাকবি কালিদাস প্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তলং", নামক নাটক পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার অলঙ্কার রত্ন স্বরূপ চিরস্মরণীয় মালওয়া দেশীয় কবি এক জন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। সুবিখ্যাত জর্ম্মণ কবি গেটি (Goethe) ইতালিদেশ ভ্রমণ নামক তদীয় গ্রন্থে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন পাঠক মহাশয় তাহা শ্রবণ করুণ———

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the earth and heaven in itself in one name combine?
I name thee, O Socontala, and all at once is said"

যদি অনুবাদ পাঠ করিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এত প্রীত ও চমৎকৃত হইতে পারেন তবে স্বদেশীয়েরা মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া কত প্রীত ও চমৎকৃত হইবেন ও কত আনন্দ অনুভব করিবেন তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাই বলি সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ভাষা শকুন্তলারূপ অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছে তাহার অভ্যন্তরে যে কত মণিমুক্তাদি

রহিয়াছে তাহা বিবেকশালী ও হৃদয়জ্ঞ "অভিজ্ঞান শকুন্তলং" গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এক শকুন্তলা পাঠ করিয়া যখন বিদেশীয়দিগের সংস্কৃত ভাষার প্রতি এত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্ন তখন সংস্কৃত গ্রন্থাদির সমুদ্র মন্থন করিতে পারিলে তাঁহাদের এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে যে সংস্কৃত গ্রন্থের রচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রচনা অপর কোন ভাষায় সম্ভবিতে পারে না। তাঁহাদিগের এরূপ প্রতীতি জন্মিবার পূর্ব্বে প্রথমে স্বদেশীয়দিগের সংস্কৃত ভাষার প্রতি যত্নবান ও আস্থাবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য আমরা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে স্বদেশীয়েরা তাঁহাদের মাতৃ ভাষার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন।

মিল যদিচ শকুন্তলা গ্রন্থকে সবিশেষ প্রশংসা করেন নাই তথাপি এক স্থানে এই রূপ বলিতেছেন :—"The poem indeed has some beautiful passages The courtship between Sacontala and Dushmanta is delicate and interesting; and the workings of the passion on two minds are naturally and vividly portrayed. The picture of the friendship which exists between the three youthful maidens is tender and delightful and the scene which takes place when Sacontala is about to leave the peaceful hermitage where she had happily spent her youth, her expression of tenderness to her friends, her affectionate parting with the domestic animals she had tended and even with the flowers and trees in which she had delighted breathe more than pastoral sweetness."

কালিদাস কৃত এই নাটকে কণ্বঃ মুনি তরু সকলকে এরূপ সম্বোধন করিতেছেন যে তাহা পাঠ করিলে উহাদিগকে সচেতন বলিয়া বোধ হয়।

কণ্বঃ। ভোভোঃ সন্নিহিতবনদেবতা স্তপোবনতরবঃ।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা।

নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা-ভবত্যুৎসবঃ

সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

মিল মহাশয় সমগ্র [illegible] উৎকৃষ্ট স্বীকার করুন আর নাই করুন যাহা স্বীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে শকুন্তলা নাটক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। যাহা তিনি স্বীকার করেন নাই তাহা তাঁহা[illegible]দয়ের অনুদারভাব, সঙ্কীর্ণভাব [illegible] নীচভাব অবশ্যম্ভাবী ফল। তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাঁহার অস্বীকারে আমরা কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষুব্ধ নহি। নানা ভাষা তত্ত্ববিৎ সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা—

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে জীবনের সর্ব্বস্ব ধন বলিযা স্বীকার করেন ও যাঁহারা আজীবন সংস্কৃত ভাষার উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন—স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে শকুন্তলারূপ গ্রন্থ অতি বিরল। একপ গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভট্ট মক্ষমূলার যিনি ভারততত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া আজীবন সংস্কৃত শাস্ত্রানুলোচনা করিতেছেন, সেই মক্ষমূলারই মিলের সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন :—

"The book which I consider most mischievous, nay which I hold responsible for some of the greatest misfortunes that have happened to India, is Mill's "History of British India".. . ...Next to the charge of untruthfulness Mill upbraids the Hindus for what he calls their litigiousness He writes—As often as courage fails them in seeking more daring gratification to their hatred and revenge, their malignity finds a vent in the channel of litigation........................ ... In fact he represents the Hindus as such a nonensuch mass of all vice as Col Van Kennedy remarked–"Society could not have held together, if it had really consisted of such reprobates only."

যখন মহাত্মা সর্ উইলিয়ম জোন্স সাহেব শকুন্তলা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন তখন হইতেই বিদেশীযদিগের সংস্কৃত ভাষার প্রতি আন্তরিক যত্ন হইল ও যাহাতে ইহার চর্চ্চা ও অনুশীলন সমস্ত সভ্য জগতে আরম্ভ হয় তদ্বিষয়ে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। সেই সময হইতেই সংস্কৃত ভাষার পুনরুন্নতি যথার্থরূপে আরম্ভ হইল। সেই সময হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য নিচয়ের মধ্যে যে অমূল্য রত্ননিধি নিহিত আছে, তাহা মন্থন করিবার জন্য প্রয়াস ও যত্ন হইতে লাগিল। সেই সময হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইলেন এবং সেই মহাব্রত উদ্যাপন করিবার জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ধন্য মহাপুরুষগণ। ধন্য—শতবার ধন্য। ধন্য তোমদের উৎসাহ! ধন্য তোমাদের যত্ন! ধন্য তোমাদের সংকল্প! ধন্য তোমাদের ব্রত। তোমরা বিদেশীয হইযাও যে আমাদের মাতৃভাষার পুনরুদ্ধারের জন্য বহুল পরিশ্রম স্বীকার করিতেছ, তদ্দ্বারা তোমরা আমাদের জন্মভূমীর বিশেষ সমাদর রাখিযাছ। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদাযের মধ্যে সর উলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন, বর্ণুফ, স্লেগেল বপ, লাসেন, মিউর, মক্ষমূলার, গোল্ড্‌ষ্টুকার, রোথ, উইবার প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম কাহার না স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই মহাত্মাগণের যত্নে ও উৎসাহে সভ্য ইউরোপ খণ্ডে সংস্কৃত ভাষা লাটীন ও গ্রীক ভাষার প্রায় সমকক্ষ হইযা উঠিয়াছে। বঙ্গবাসীর, সমস্ত ভারতবাসীর ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সর্ উইলিয়ম জোনস কি বলিতেছেন পাঠক মহাশয় দেখুন—"The Sanskrit language is of a wonderful structure; more perfect than the greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either." নানা ভাষাতত্ত্ববিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিত যখন বলিতেছেন যে লাটীন ও গ্রীক অপেক্ষা সংস্কৃত উৎকৃষ্ট তখন আমাদের আর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আজ আমাদের হৃদয় অতিশয় পুলকিত। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে প্রাচীন জগতের জ্ঞান ও সভ্যতার বিষয় সম্যকরূপে জানিতে গেলে প্রাচীন জাতিদিগের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রাচীন ভাষা সকলের মধ্যে সংস্কৃত প্রাচীনতর ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী। অতএব সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন পণ্ডিত মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলনে আস্থাবান হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও আলোচনা একেবারে লোপ পাইত তাহা হইলে আমরা প্রাচীন আর্য্য জাতির বিষয় কিছুই জানিতে পারিতাম না। যদি প্রাচীন জাতিদিগের ইতিবৃত্ত জানিতে পারিলাম না তবে বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন কি? যদি পূর্ব্বকালীন লোকদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম, সভ্যতা ও জ্ঞান জানিতে অসমর্থ হইলাম তবে বিদ্যার কিছুই প্রয়োজন নাই, কারণ, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্যজ্ঞেয়। এরূপ হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলিতে হইবেক। তজ্জন্য সভ্যদেশ সমূহের বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইতিহাস পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ এক খানিও নাই। ইহাতে কেবল মাত্র কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত আছে। আর্য্যদিগের প্রকৃত ইতিহাস নাই, তথাপি তাঁহাদিগের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নহি। যখন তাঁহাদের প্রকৃত ইতিহাস নাই তখন কিরূপে তাঁহাদের বিষয় জানিতে পারিলাম? তাঁহাদের প্রণীত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, সাহিত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদের রীতি নীতি [illegible] আচার ব্যবহার আজ সভ্য জগতে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। যদি সকল সংস্কৃত গ্রন্থ একেবারে লোপ পাইত কিংবা পণ্ডিত মণ্ডলীতে ইহার আদর না থাকিত, তাহা হইলে আজ কি আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত জানিতে পারিতাম? না তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া কর্ণে সুধাবর্ষণ হইত? নিশ্চয়ই না। সেইরূপ অবস্থায় আজ ভারতবর্ষ সভ্য জাতিদিগের মধ্যে স্থান পাইত না। যে ভারতবর্ষ দার্শনিকবৃন্দ, নৈয়ায়িক বৃন্দ ও কবিবৃন্দ উৎপাদন করিয়া বসুন্ধরাকে সমু-[illegible] করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আজ কেহই সেই ভারতবর্ষের গুণ কীর্ত্তন করিতেন না। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে পুরাকালে এক প্রাচীন জাতিভুক্ত ছিলেন তাহা কেবল সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায়। সভ্য ইউরোপ [illegible] আজ আমরা বিজিত [illegible]লেও

আমাদের এত সম্মান করেন কেন। কেবল আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগের মহিমাও গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া। আজ তাঁহারা কেন আমাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন? ইহাও ঐকারণে বলিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ প্রভৃত গবেষণা দ্বারা শব্দবিদ্যানুশীলনপ্রভাবে নিরূপণ করিলেন যে প্রাচ্য হিন্দু ও পাশ্চাত্য ইংরাজ ও জর্ম্মণ এক বংশসম্ভূত, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই পাশ্চাত্যদিগের অন্তঃকরণ প্রাচ্যদিগের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে। ভাল। ইহা অপেক্ষা মঙ্গলতর, কল্যাণতর কার্য্য আর কি সাধন করিতে পারে। ইহা সত্ত্বেও যাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও ইউরোপীয় ইংরাজ ও জর্ম্মণ এক বংশসম্ভূত নহে, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব। তাহারা বড় দাম্ভিক ও সাহসী। তাহারা ভাষাতত্ত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা সত্যের অপলাপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সুতরাং ইংরাজ রূপ সভ্য জাতির সহিত হিন্দুজাতি একীভূত হইতেছে তাহা অনিষ্টকর কখনই বলা যাইতে পারে না। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অপর জাতির সহিত সম্পর্ক পাতাইতেছি না। কিন্তু যাহা সত্য তাহা বলিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না। বোধ হয় পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর বহু দিবস পরে আবার দুই সহোদরের সহিত মিলন হইবার জন্য ইংরাজদিগকে ভারতের অধীশ্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও অনুশীলনে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মন আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্যই বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় [redacted] সংস্কৃত ভাষার পুনরনুশীলনে যত্নবান হউন।

যে সময়ে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে পদচ্যুত করিয়া ভারতের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, সেই সময় হইতেই ভারতবাসীর বীরগর্ব্বের সহিত তাঁহাদের আদরের ধন সংস্কৃত চর্চ্চা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধ হয়। ইহাদিগের ধর্ম্মোৎপীড়ন ও কঠোর শাসন কাহারও অবিদিত নাই। ইহারা বলপূর্ব্বক কোরাণস্থ ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ও তরবারি হস্তে অনেক হিন্দু সন্তানকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই কারণ বশতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মবল ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল এবং সংস্কৃতালোচনা বিলুপ্ত প্রায় হইতে লাগিল ও ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ইহার অতি সামান্য আলোচনা কতিপয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহারা ব্যতীত দেশের লোক সমূহ ইহার কিছুই চর্চ্চা বা কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিতেন না। যদিও এই সময় ইহার চর্চ্চা ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু অসীম সমুদ্র দ্বারা বিভিন্ন সুদূর পশ্চিমস্থ জর্ম্মণ দেশে ইহার বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সন ১৮৬০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্য বিষয় বলিয়া নির্ব্বাচিত হইল। সেই সময় হইতেই বঙ্গদেশে ইহার পুনর্জ্জীবন সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা শিক্ষা

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রত্যাশী কতিপয় ছাত্রব্যতীত শকুন্তলা নাটক কেহ পড়িয়াছেন কিনা সন্দেহ। পাঠক মহাশয় বলিতে লজ্জা বোধ হয় যে জর্ম্মণির একজন সামান্য লোকও ইহা পাঠ করিয়াছে। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে, কিন্তু যথার্থ ঘটনা। যে শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সমগ্র জর্ম্মণদেশ ইহা পাঠ করিতেছেন, সেই শকুন্তলা এখানে কেবল মাত্র অতি অল্প সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাঠ করিয়াছেন।।। ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় ব্যাপার হইতে পারে?

কেহ কেহ বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন যে ইহা দ্বারা কেবল ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা ব্যতিরেকে আর কিছুই হয় না। এটি তাঁহাদের বিষম ভ্রম। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধিই সংস্কৃতালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদিগের মাতৃভাষার উন্নতির জন্য ব্যস্ত। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী যে অতীব প্রশংসনীয় তাহা বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নহেন। ইদানীং আমরা বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ সমাদর দেখিতেছি বোধ হয় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। অধুনাতন বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা কি প্রকারে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধাচারী হইব? আরও অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইতেছে। যে ব্যক্তি ইংরাজি ভাষা বুঝিতে পারেন তিনি ঐ সকল অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থাদির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন ও সার সংগ্রহ করিতে পারেন। এরূপ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যাহার একখানি পুথী আমাদের দেশে বিরল কিন্তু জর্ম্মণীতে অত্যন্ত সুলভ। অতএব সেই সকল গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে গেলে ইংরাজি অনুবাদ ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায় নাই। ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিয়া আমরা যে আর্য্যদিগের বিবরণ সম্যক্ জানিতে পারিয়াছি তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন। অতএব ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা একটি মহদুপকার সাধিত হইতেছে। আমরা বলিতেছি না যে কেবল ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা কর—সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিও না। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু বলিতেছি যে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। ইহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই জন্যই [illegible] প্রবন্ধের অবতারণা।

সন ১৮২৪ সালে উইলসন সাহেব কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। যত দিন ভাষার স্থায়িত্ব থাকিবে, তত দিন উইলসন

সাহেবের নাম বিলুপ্ত হইবে না। বর্ণভেদানুসারে সকল ব্যক্তিই যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারেন, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিবার ইহাই তাঁহার মহদুদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা তিনি যে আমাদের মাতৃভূমির বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই স্বীকার করা উচিত। এই রূপ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই আস্থাবান হওয়া উচিত। সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচুর পরিমাণে হইবে ইহাই উইলসন সাহেবের অভিপ্রায়। ইহা কি মহদুদ্দেশ্য নহে? আশা করি স্বদেশবাসীরা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মাতৃভূমিকে উজ্জ্বল করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে সংস্কৃত কলেজে বেদ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। সংস্কৃত কলেজে যাহাতে নিয়মিত রূপে বেদ শিক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের আন্তরিক চেষ্টা করা বিধেয়। বেদাভ্যাসব্যতিরেকে সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রকৃত অধ্যয়ন হইতে পারে না। বেদ আমাদের পরম ধন। ধর্ম্ম শাস্ত্রই বলুন, স্মৃতি শাস্ত্রই বলুন গণিত শাস্ত্রই বলুন, আর ন্যায় শাস্ত্র কি দর্শন শাস্ত্রই বলুন, আমাদের সকল শাস্ত্রই বেদমূলক। বেদ আর্য্যদিগের সভ্যতা ও জ্ঞানের বিকাশস্থল। ইহা এক খানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ নহে বা এক সময়ে এক জন পণ্ডিতের দ্বারা লিখিত হয় নাই। ইহার দ্বারা প্রাচীন আর্য্যদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বেদের সমসাময়িক লোকদিগের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য ও স্বার্থপরতা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে হিন্দুমাত্রেরই বিদ্যোপার্জ্জনের অধিকার ছিল। ঋগ্বেদ যাহা সকল অপেক্ষা প্রাচীনতর ও শ্রেষ্ঠ তাহাতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি স্থল ব্যতীত ঋগ্বেদের কুত্রাপি জাতিভেদ প্রথা প্রচলন দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে এই বিষয়ে এই রূপ বর্ণিত আছে যে দেবগণ এক পুরুষকে যজ্ঞে বলি দিলেন। সেই পুরুষ হইতেই তাবৎ সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইল। তৎপরে এইরূপ লিখিত আছে।

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কেচো ভয়াদতঃ।
গাবো জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়।
ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্য কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ইহার মুখই ব্রাহ্মণ হইল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়তে পরিণত হইল, উরু বৈশ্য এবং পদদ্বয় শূদ্র হইল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রকৃত গবেষণা দ্বারা নিদ্ধারিত করিয়াছেন যে এই সংস্কৃত আধুনিক সংস্কৃত। ঋগ্বেদের প্রথমাংশের সংস্কৃত এই সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। অতএব ইহা যে আদিম আর্য্য হিন্দুসমাজের পদ্ধতি তাহা কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। আচার্য্য মক্ষ মুলার এই বিষয়ে এইরূপ বলিতেছেন:—

"If, then with all the documents

before us, we ask the question does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of castes, no authority for the degraded position of the sudras. There is no law to prohibit the different classes of the people from living together, from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of people belonging to different castes, no law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma.

Caste as now understood is not a Vedic institution, and in disregarding the rules of caste no command of the real Veda is violated" শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার প্রকাশক উইবার (Weber) ঋগ্বেদের সময় সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেনঃ-

"There are no castes as yet, the people is still one united whole, and bears but one name, that of *Visas.*"

আকার বিশিষ্ট অসংখ্য দেব দেবীর পূজা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উপনিষদে সেই এক মাত্র পরমব্রহ্মের স্পষ্ট উপাসনা প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বেদবিরুদ্ধ কার্য্য আর্য্যদিগের ত্যজ্য কিন্তু এই সকল বেদবিরুদ্ধ কার্য্য হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। আমরা এক্ষণে দেশাচার ও কৌলিক প্রথার দাস হইয়া আমাদের যথার্থ শাস্ত্র বেদ ও উপনিষদাদির মস্তকে পদার্পণ করিতেছি ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করিতেছি। সহমরণপ্রথা যাহা লর্ডউইলিয়ম বেণ্টিক ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধ্যায়ত্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত করণানন্তর তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন—তাহা বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দত্ত সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিষয়ে বেদ হইতে অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"Rise woman, come to the world of life, come to us! Thou hast fulfilled thy duties as a wife to thy husband." পাঠক মহাশয় বেদবিরুদ্ধ কার্য্য হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেখিয়া বড়ই মনে আক্ষেপ হয়। তাই বলি সংস্কৃত শাস্ত্রানুলোচনায় সচেষ্ট হউন। ইহার অভ্যন্তরে যে অনন্ত রত্নরাশি নিহিত রহিয়াছে, তৎসমুদয় উদ্ধার করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। বেদানুমোদিত কার্য্য সমাজে প্রচলিত করিতে পারিলে, সংস্কৃত শিক্ষার যথার্থ ফল লাভ হইল। তাই বলিতেছি যে যাহাতে

সংস্কৃত কলেজে প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের শিক্ষা ও আলোচনা হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যত্নবান হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

সম্প্রতি ঋগ্বেদ সংহিতা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে শুনিয়া প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানেরই আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় একদল পরশ্রীকাতর বঙ্গসমাজের লোক নানা আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন এ অনুবাদ প্রকৃত অনুবাদ হইবে না। বেদ অনুবাদ করিতে গেলে কেবল সায়নের টীকা অবলম্বন করিলে হইবে না। টীকায় অতি সামান্য মাত্র বৈদিক সময়ের আচার ব্যবহার সন্নিবিষ্ট আছে। যে সকল বিষয় টীকায় নাই তাহাও প্রকাশ হইবে না অতএব এরূপ বেদের অনুবাদ কোন কাজেরই নহে, ইহা অসম্পূর্ণ অনুবাদ বলিতে হইবেক। বেদানুবাদরূপ মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে বেদ প্রকৃত রূপে অধ্যয়ন করা চাই। আমরা তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদদ্বারা পাঠকবর্গ সুস্পষ্ট রূপে বৈদিক সময়ের ক্রিয়া কলাপ রীতি নীতি, ও আচার ব্যবহার জানিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সমস্ত না হউক কিছুও ত জানা যাইবে। ইহা কি জ্ঞান নহে? মূল ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে অন্য সাহায্য বিনা সমস্ত বিষয় কি জানা যায়? মূলেও অন্য সাহায্যের আবশ্যক। অতএব ঋগ্বেদ অনুবাদিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেদানুবাদরূপ গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগের যথার্থ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। তিনি এবিষয়ে অনেক খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্যও সহানুভূতি পাইয়াছেন। সেই সকল পণ্ডিতবৃন্দকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। প্রকৃত দেশের কল্যাণে রত অনুবাদক মহাশয়কে সাহায্যদান করিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা আমাদের বিশেষ ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

সংস্কৃত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় হউক, আর ইংরাজিভাষায় হউক, কি অন্যান্য ভাষায় হউক, যে কোন ভাষায় হউক না কেন, অনুবাদিত হইলে মূল ভাষার অনাদর কখনই হইবে না। বরং আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে বোধ হয় যে তাহাতে মূলের প্রতি আদর বর্দ্ধিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নহেন এবং তাঁহাদেরই যত্নে এই বঙ্গদেশে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে। আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় সপ্তাহিক সংবাদপত্র, পাক্ষিকপত্র ও মাসিক পত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখিতেছি। ইহা কেবল সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার ও শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। আমরা আশা করি যে এরূপ সময় শীঘ্র আসিবে যখন সমস্ত ভারতবর্ষে মঙ্গলদাতা বিশ্ব-ভুবন-পাতা পরম পিতা মাতার প্রসাদে সংস্কৃতভাষা পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন করিবে ও আর্য্য মহর্ষিগণের সভ্যতার, জ্ঞানের, ও 'ভগবদ্ভক্তির' হিল্লোল প্রত্যেক ভারতবাসীর শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে বহিতে থাকিবে।

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র।

কলিকাতায় ইঙ্গরেজাগমন।

আকাশপটের চতুর্দ্দিক বিক্ষিপ্ত মেঘপুঞ্জের ন্যায় বিচ্ছিন্ন ও অধঃপতিত মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল সংরক্ষিত করিয়া অদ্য যে ব্রীটন জাতি ভ্রুকুটিতে মন্ত্রার্পিতের ন্যায় সমগ্র ভারতকে শাসন করিতেছে, ভারতে সেই ইঙ্গরেজ জাতির প্রথম সমাগমাবধি কলিকাতায় উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার আশয়ে পদার্পণ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

ইঙ্গলণ্ডেশ্বরী মহারাণী এলিজেবেথের রাজত্বকালে "পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতি" (East India Company) নামক এক দল ইঙ্গরেজ বণিক, ধনলিপ্সু য়ুরোপীয় জাতি নিচয়ের কল্পনায় বহুকাল বিরাজিত বিবিধ রত্নরাজির আকর ভারতভূমিতে, বাণিজ্য করিবার অভিলাষে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর দিবসে উক্ত মহারাজ্ঞীর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। (১) উক্ত সমিতি সম্রাট জাহাঙ্গিরের নিকট হইতে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সনন্দ (Firman) প্রাপ্ত হইয়া সুরাট নগরে প্রথম বাণিজ্যাগার (কুঠি) সংস্থাপিত করেন। (২) ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এই নগর ভারতে ইঙ্গরেজ বণিকদিগের প্রধান বন্দর স্থলাভিষিক্ত ছিল, পরে বোম্বাই নগরে উহা স্থানান্তরিত হয়। এই নগর পোর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে দান করেন এবং ইঙ্গলণ্ডাধিপতি পূর্ব্বোক্ত চার্লস উক্ত নগর পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতিকে প্রদান করেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে ইংরেজ বাণিজ্য কুঠী রক্ষণোপযোগী করিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গিরের নিকট আবেদন করেন। (৩) ঐ বৎসরেই সার টমাস রো (Sir Thomas Roe) ইঙ্গলণ্ডাধিপ প্রথম জেমসের নিকট হইতে দূতপদাভিষিক্ত হইয়া মোগল সম্রাটের সমীপে প্রেরিত হয়েন। মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক যে সকল স্বত্বাধিকার প্রদত্ত হইবে সেই সকল পূর্ব্ব ভারতবণিক সমিতির ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য গ্রহণ করা হইবে, ইহা স্বীকৃত হওয়ায়, সার টমাস রোর মোগল সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইবার সর্ব্ব প্রকার ব্যয়ভার উক্ত সমিতি বহন করিয়া ছিলেন। (৪) এই সময়ে করোমণ্ডল উপকূলে পুলিকুট্ট এবং মসুলিপত্তন প্রভৃতি স্থানে কুঠী স্থাপন করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ওলন্দাজদিগের প্রতি

(১) Vide Bruce's Annals of the East India Company, Vol I. p. 136

(২) Vide Ibid. p 163

(৩) Vide Ibid p 170.

(৪) Vide Bruce's Annals of the East India Company Vol. 1. p. 174.

দ্বন্দ্বিতায় উহা বিফল-প্রযত্ন হইয়াছিল। করোমণ্ডল উপকূলে আর্মাগান নগরে ইঙ্গরেজ বণিকদিগের প্রধান বাণিজ্য কুঠী ছিল, কিন্তু উক্ত স্থানে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় উক্ত স্থানীয় বাণিজ্যাগার ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ পত্তনে স্থানান্তরিত হয়। ঐ নগরে উক্ত প্রদেশীয় নায়েগের (জমিদারের) নিকট হইতে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া যে দুর্গ বিনির্ম্মিত হয়, উহাই ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (Fort St George) নামে অভিহিত হইয়াছিল। (৫) ঐ স্থানেই আধুনিক মান্দ্রাজ নগরের ভিত্তিমূল প্রোথিত হয়। এই নগর ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হয়। (৬)

বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিষয় এইরূপে সংক্ষেপে শেষ করিয়া এক্ষণে আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত যে প্রদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেই বঙ্গ দেশের পরিবর্ত্তিত দৃশ্য ও ঘটনাবলী পাঠক দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। যে সময়ে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার এবং আফজল খাঁ বেহার প্রদেশের সুবাদার পদাভিষিক্ত ছিলেন, সেই সময়ে (১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে) পাটনায় এক বৎসর কাল ইঙ্গরেজ বাণিজ্য কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদনন্তর ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ সম্রাটের নিকট পিপিলীতে কুঠী স্থাপন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। (৭)

প্রায় ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে যখন ইংলণ্ডরাজ প্রথম চার্লস এবং তাঁহার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সহিত যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির বঙ্গদেশে বালেশ্বর এবং হুগলী নগর দুবে দুইটী বাণিজ্যাগার সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে ক্যাভেলিয়াস এবং রাউণ্ডহেড্‌স্ নামক রাজনৈতিক সম্প্রদায় দিগের অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়া প্রযুক্ত গ্রেট ব্রীটেন বারিবাস্থ এবং আলোড়িত হওয়াতে দেশে বিলক্ষণ অশান্তি বিরাজ করিতেছিল বটে, কিন্তু এই ঘটনা সূত্রে পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির বাণিজ্য বিলক্ষণ "চুটিয়া" চলিয়াছিল। কারণ, উপরোক্ত ইঙ্গলণ্ডীয় অন্তর্বিপ্লবোপলক্ষে বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য বড় পরিমাণে সোরা আবশ্যক হওয়াতে উক্ত সমিতি পাটনাস্থ কুঠী হইতে নৌকা যোগে উক্ত দ্রব্য হুগলী বাণিজ্যাগারে আনাইয়া তথা হইতে বাণিজ্য তরি পূর্ণ করিয়া লণ্ডন নগরে প্রেরণ করিতে লাগিল। সুতরাং যাবৎ না ঐ বিপ্লবাবসান হইয়াছিল তাবৎ কাল পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির বাণিজ্য কার্য্য বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দরূপে চলিয়াছিল। (৮)

এই সময়ের কিছু দিন পরে একটী দৈব ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে বঙ্গদেশে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। এই ঘটনাকে বঙ্গে ইঙ্গরেজ বণিক দিগের রীতিমত বাণিজ্যের প্রথম সূত্র-

(৫) Vide Ibid. p. 377—8.

(৬) Vide Ibid p. 484.

(৭) Vide History of Bengal for beginners by Babu Raj Krishna Mukerjee M. A. B. L p. 43.

(৮) Vide Indian review, "Old Calcutta" by J Talboys Wheeler

পাত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে (৯) সম্রাট সাজেহাঁর একটি কন্যার পরিচ্ছদে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহার শরীর ভয়ানক রূপে বিদগ্ধ হইয়া যায়। দেশীয় চিকিৎসক দিগের কর্ত্তৃক উহার কোন প্রকার উপশম হইল না। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজ চিকিৎসকদিগের ক্ষত ও বিদগ্ধ দেহ আরোগ্য করিবার নিপুণতার খ্যাতি ভারতের অনেক স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাদসাহ সাহজেহাঁ এই বিষয় অবগত হইয়া জনৈক ইংরেজ চিকিৎসককে প্রেরণ করিবার অনুরোধ করিয়া অবিলম্বে সুরাটে তাহাদিগের বাণিজ্য কুঠীতে দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ বণিক সমিতির "হোপ ওয়েল" (Hope well) নামক জাহাজের জনৈক শস্ত্র চিকিৎসক (Sargeon) মিষ্টার গেবরিয়াল বাউটন (Mr Gabrial Boughton) সাহেব পীড়িতা বাদসাহ পুত্রীর চিকিৎসার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া সম্রাটের তাৎকালিক সন্নিবেশিত শিবিরে (সন্য নিবেশে) দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলেন। (১০) কিন্তু অর্ম্মি সাহেব বলেন যে, সম্রাট কন্যার চিকিৎসার জন্য বাউটন সাহেব সুরাট হইতে মোগল রাজধানী আগ্রা নগরে আনীত হয়েন। (১১) সম্রাট পুত্রী উক্ত চিকিৎসকের হস্তে আরোগ্য লাভ করাতে সম্রাট অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া অন্যান্য দত্ত দ্রব্যব্যতীত তাঁহার সাম্রাজ্যে, যে কোন স্থানে হউক না কেন, ইংরেজ দিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার এবং বঙ্গদেশে তাহা-

(৯) Vide Bruce's Annals of the East India Company Vol I p 406. বাউটন সাহেব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত এবং ১৬১৬—১৮ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত ফারমন্দের তারিখ লইয়া এন্টর্যার্ট এবং অর্ম্মি সাহেব গোলমাল করিয়াছেন। ইহার উভয়েই বাউটন সাহেবের প্রাপ্ত ফারমান্দের তারিখ ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ নিদ্ধারিত করিয়াছেন। যদিও অর্ম্মি সাহেব ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার উপস্থিতির সময় যে ঘটনা হইয়াছে সে সকল বিষয়ে তাঁহার লেখা অনেক পরিমাণে বিশ্বাস্য। অন্যত্র ব্রুস সাহেবের সমস্ত বিষয় "ইণ্ডিয়া আপিসের" যাবতীয় দলিল পত্র বিশেষ রূপে দেখিয়া লেখা হয়। সুতরাং তাঁহারলিখিত তারিখটী সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস্য। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে ফারমন্দ ইংরেজ বণিকগণ প্রাপ্ত হয়েন, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হইবার উপায় নাই। এই সম্বন্ধে কেবল মাত্র উইলিয়াম মেথওয়াল্ড (Willam Methwold) সাহেব সুরাট হইতে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:——— "The 2d present we received from Agra the king's Firmand which gives liberty of trade unto us in his whole country of Bengal, but restrains our shipping only unto the port of Piply, which Firmand was sent unto us by a servant of our own, which was dispeeded unto Agra"—*History of the Rise and Progress of the Bengal Army by Captain Arthur Broome,* p 5.

(১০) Vide Captain Arthur Broome's "History of the Rise and Progress of the Bengal Army" Vol I p 4

(১১) Vide Ormes Military Transaction in India.

দের (ইঙ্গরেজদিগের) ইচ্ছামত সকল স্থানে বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মাণ করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং তৎসমুদয় বাণিজ্য জাহাজে করিয়া সুরাট বন্দরে প্রেরণ করণার্থ বাউটন সাহেব সম্রাটপ্রদত্ত আদেশ পত্র (Patent) সহকারে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে সময়ে বাউটন সাহেব বাণিজ্য করিবার সনন্দ পত্র (Firman) প্রাপ্ত হয়েন, সে সময়ে বঙ্গদেশে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। সম্রাট-প্রদত্ত সনন্দ পত্রে হৃদয় দৃঢ়ীভূত করিয়া এবং রক্ষক দলে সুরক্ষিত পর্য্যটনোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া বাউটন সাহেব সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র এবং বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যা প্রদেশ সমূহের প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা সুলতান সুজার এবং বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বাউটন সাহেব যদ্যপি নবাবের (সুজার) অন্তঃপুরবাসিনী কামিনী বিশেষের পীড়া শান্তি করিতে সমর্থ না হইতেন, তাহাহইলে বোধ হয় তাহার সম্রাট-প্রদত্ত আদেশ পত্র কোন ফলপ্রদ হইত না এবং তাহার এতাধিক পরিশ্রম ও ব্যয় সমস্ত ভস্মে ঘৃতাহুতি হইত। বাউটনের এইরূপ কার্য্যে নবাব সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ সংসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং অধিক পরিমাণে বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে ইঙ্গরেজেরা সুজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং বাণিজ্য করিবার জন্য আগরা নগরে সম্রাটের নিকট যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঐ ক্ষমতা নবাব কর্ত্তৃক দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশে ইঙ্গরেজ জাতির যে কেহ ব্যবসায় করিবার জন্য আগমন করিবে, সেই উক্ত স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবে এরূপও উল্লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাবের নিকট তাহার এইরূপ প্রতিপত্তির বিষয় তিনি সুরাটের ইঙ্গরেজ প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। উক্ত শাসন কর্ত্তার পরামর্শানুসারে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইঙ্গলণ্ড হইতে দুইখানি বাণিজ্য তরি পণ্য দ্রব্য সহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। এই জাহাজদ্বয়ের প্রতিনিধিগণ বাউটনকর্ত্তৃক নবাব সমীপে আনীত হইলে নবাব তাহাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রম ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাদিগের বাণিজ্যের উন্নতি সংসাধনের জন্য বিশেষ যত্নপর হইলেন। ইঙ্গরেজ বণিকগণ নবাবের এইরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। (১২) এইরূপে সুলতান সুজার সাম্রাজিক সিংহাসন প্রাপ্তাভিলাষে প্রতিযোগিতায় গমন, পরাজয়, এবং মানবলীলা সম্বরণ (১৬৫৭) পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজ বণিকগণ তাহার আশ্রয়ে ও আনুকূল্যে ব্যবসায় কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। (১৩) ১৬৫১--২

(১২) Vide Orme's Military Transactions in India.

(১৩) Vide Captain Arthur Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army Vol. I. p. 5.

খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুজা ইঙ্গরেজ বণিক বৃন্দকে একটী নিশান এবং পরওয়ানা প্রদান করেন। তদ্দারা উক্ত বণিক-সমিতি কেবল অতি সামান্য অর্থ (অর্থাৎ বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা) প্রদান করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে স্বাধীন রূপে ব্যবসায় করিবার বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১৪)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইঙ্গলণ্ডে অন্তর্ব্বিবাদ উপলক্ষে সোরার অত্যন্ত আবশ্যক হওয়া প্রযুক্ত ইঙ্গরেজ বণিক সমিতি কর্তৃক পাটনাতে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য এজেন্সি স্থাপিত হয় এবং ঐ স্থান হইতে উহা আনয়ন করিয়া ইঙ্গলণ্ডে প্রেরণ করিবার জন্য তাৎকালিক বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর হুগলি নগরে একটী বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হয়। যদিও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের আশ্রয়ে এবং অনুগ্রহে ইঙ্গরেজ বাণিজ্যের বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু যাহাতে কোন বিদেশীয়েরা এতদ্দেশে কোন প্রকার সামরিক ক্ষমতা সংস্থাপিত করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেই হেতু তাৎকালিক বাঙ্গালার মোগল প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার কর্ম্মচারিগণ ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির বাণিজ্য কুঠী বিনির্ম্মিত হইবার সময় উহা পরিদর্শন করিয়া উক্ত ইমারতের যে কোন অংশ ঐ সময়ে রক্ষণোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল অথবা ভবিষ্যতে রক্ষা বা শত্রুতাচরণকার্য্যে পরিণত হইতে পারে, সেই সেই অংশ নির্ম্মাণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল। কারণ মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্রাট অথবা তাহার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোন রূপ প্রভুত্বের আকার ধারণ করিতে দেওয়া তাৎকালিক মোগল সাম্রাজ্যের রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে পোর্ত্তুগিজ অথবা অন্য কোন য়ুরোপীয় জাতির অধীনে যে সকল দুর্গ ছিল, ঐ সকল মোগল সাম্রাজ্যের সীমার বহির্ভূত যে সকল প্রদেশ মোগলজাতি কর্তৃক বিজিত হয় নাই, সেই সমুহের রাজগণের নিকট হইতে হয় বলপূর্ব্বক গৃহীত অথবা ক্রীত হইয়াছিল। এতাবৎ মোগল সাম্রাজ্যের অধিকারের মধ্যে কোন য়ুরোপীয় জাতি একটী বুরুজ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় নাই। (১৫)

উপরোক্ত কারণে ইঙ্গরেজ বণিকগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই, এবং যাহাতে মুসলমান গবর্ণমেন্টের প্রতি কোন রূপ বৈরিতাচরণ করিতে সমর্থ না হয়, সেই হেতু ইঙ্গরেজ বণিক প্রতিনিধির সম্মানার্থে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক এনসাইন এবং ত্রিশ জন রক্ষীসৈন্য ব্যতীত কোন রূপ সামরিকবল রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই। ফলে ঐ ক্ষুদ্র সৈনিকদল পূর্ব্বভারত বণিক সমিতির ভবিষ্যতে বৃহদাকারে পরিণত বঙ্গীয় বিভাগের সৈন্যদলের প্রথমাবয়বমাত্র বলা যাইতে পারে। ইঙ্গরেজ বণিকদিগের কার্য্যকারিতা এই প্রকারে সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা

(১৪) Vide Bruce's Annals of the East India Company Vol. I, p. 463—4

(১৫) Vide Ormes Military Transactions in Industan.

দ্বিগুণ পরিশ্রমসহ তাঁহাদিগের নিজের এবং বণিক সমিতির ব্যবসায়ের উন্নতির পরিশীলনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যে যে স্থানে মূল্যবান দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, হুগলী হইতে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণ সেই সেই স্থানে প্রেরিত হইত। কিন্তু বণিক-সমিতির অধীনে যে সকল বণিক প্রতিনিধি বা কুঠীরঅধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল, উহার সংখ্যার অল্পতাবশতঃ বিভিন্ন স্থানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়াতে অধিকাংশ ক্রয় কার্য্য হুগলী নগরেই সম্পাদিত হইত। উক্ত স্থানের প্রধান বণিক প্রতিনিধিগণ দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে অর্দ্ধমূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়া এবং যাহাতে উহারা পণ্যদ্রব্যাদি নিয়মিত সময়ে হুগলী কুঠীতে উপস্থিত করিতে পারে, সেই সম্বন্ধে নিয়মপত্র স্বাক্ষরিত করাইয়া লইত। ঐ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে দেশীয় বণিকগণ ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইত। এই প্রকারে যে সকল দ্রব্যাদির জন্য চুক্তি হইয়া অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত হইত ঐ সকল দ্রব্যের উপর বণিক সমিতির সত্ব বা অধিকারিত্ব জন্মিত, এমন কি, ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার বহু পূর্ব্বে উহা বিলাতে ইনভেষ্টমেণ্ট (Investment) নামে অভিহিত হইত।

এই রূপে কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে ইঙ্গরেজ বণিকদিগের ব্যবসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক বৎসরমধ্যে যখন উহারা অধিক ব্যয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ ও বহু পরিমাণে পণ্যদ্রব্য সকল সঞ্চয় করিল এবং বাজারে ও বিলক্ষণ সম্ভ্রম দাঁড়াইল, তখন নবাব, ইঙ্গরেজবণিকগণ এই প্রদেশ হইতে স্থানান্তরিত হইতে সক্ষম হইবে না স্থির করিয়া, তাহাদিগের প্রতি বিপরীতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। বাউটন সাহেবকে ব্যবসা করিবার জন্য যে অনুমতি পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, ঐ সনন্দকে কখন অস্বীকার এবং কখন বা উহার বিপরীত ভাবার্থ করিতে লাগিল। অপরাপর ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে যেরূপ শুল্ক আদায় হইত, উহাদিগকে ও সেই রূপ প্রদান করিতে আদেশ করা হইল। যে সকল এতদ্দেশীয় লোক ইঙ্গরেজদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া নবাবের শরণাপন্ন হইত, নবাব তাহাদিগের এবং ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির মধ্যে মিটাইবার ভান করিয়া মধ্যস্থ হইতেন। ফলে ইহাতে ইঙ্গরেজদিগকে দেখাইতেন যে তিনি তাহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কিন্তু মধ্যস্থ হইয়া কার্য্যতঃ তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেন। ইহা ব্যতীত নবাব কতকগুলি ভবঘুরে ইঙ্গরেজকে, বণিক সমিতির বিশেষাধিকার ভঙ্গ করিয়া তাহার রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, যে কোন প্রকারে হউক, যাহাতে ইঙ্গরেজ বণিকদিগকে কোন প্রকারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নবাব স্বয়ং তাহাদিগের বিচার করিতে পারেন, তজ্জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা ও কৌশল করিতে ত্রুটি করিতেন না। এইরূপ উপায়ের দ্বারা নবাব ইঙ্গরেজ বণিকদিগকে জরিমানা করিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রকারে টাকা আদায় করিতে পারগ হই-

তেন। যদ্যপি ইঙ্গরেজ বণিকগণ নবাবের এই রূপ অন্যায় দাবি প্রদানে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগের ব্যবসায়ের সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত হইত।

এই রূপ অবস্থান্তরিত হওয়াতে ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির, হয নবাবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নচেৎ উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিলনা। নবাব ইঙ্গরেজ বণিকসমিতির প্রতি পুনঃ পুনঃ নানা প্রকারে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে বাণিজ্যের যেরূপ সুবিধা ছিল, উহা সহসা পরিত্যাগ করা এবং ব্যবসায়ের দরুণ বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে যে সকল টাকা ছড়ান ছিল ও গুদামে পণ্য দ্রব্যাদি মজুত ছিল ঐ সকলের আশা এককালীন জলাঞ্জলি দেওয়া পরিণাম দর্শিতার কার্য্য নহে বিবেচনা করিয়া চল্লিশ বৎসর কাল উক্ত সমিতি কোন সামরিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে বিরত ছিলেন।

অতঃপর যখন বঙ্গদেশে নবাবের উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ইঙ্গরেজ বণিকদিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল এবং সুরাটে ও মোগল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল, তখন অবশেষে ইঙ্গলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় জেমসের অভিমত্যানুসারে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বণিক সমিতি জাহাজসমূহের দুইটী বহর বা দল (Fleet) রচনা করিলেন। তন্মধ্যে একটী দল মোগল প্রজাদিগের তরণী সকল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য সুরাটের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে, অপরটী গঙ্গার মোহানায় উপদ্রব করিবে। উহার সঙ্গে ৬০০শত য়ুরোপীয় শিক্ষিত সৈন্য থাকিবে, উহারা স্থলভাগে বঙ্গের নবাবের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবে। হুগলীস্থিত বণিক সমিতির প্রতিনিধিগণ পূর্ব্বেই এই বিষয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের প্রতি এই রূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যে, তাহারা যাবতীয় বণিক সমিতির কর্ম্মচারী, বাণিজ্য দ্রব্যাদি এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে উক্ত সমিতিসংক্রান্ত যে সকল ইঙ্গরেজ অবস্থিতি করিতেছে, ঐ সমস্ত একত্রীত করিয়া একরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, পূর্ব্বোক্ত জাহাজের দল বালেশ্বরের জলপথে উপস্থিত হইবামাত্র উহারা যাবতীয় লোক এবং দ্রব্যাদি লইয়া জাহাজে উঠিতে পারে এবং ঐ জাহাজ দলের অধ্যক্ষকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, ঐ সকলকে লইয়া চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ করিবে এবং উক্ত নগর হস্তগত করিয়া ঐ স্থানে তাঁহাদিগের আত্মরক্ষণোপযোগী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লইবে।

বণিক সমিতির হুগলীস্থিত প্রধান প্রতিনিধি জব চার্ণক সাহেব এই যুদ্ধের নেতা হইয়াছিলেন। তিনি সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সামরিক বহুদর্শিতা কিছুই ছিল না। ফলে তিনি স্বয়ং নবাবের নিকট যেরূপ লজ্জাস্করূপে অপমানিত হইয়াছিলেন—এমন কি উপরোক্ত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে কশাহত এবং কারারুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন,—তাহাতে তাঁহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়া

প্রযুক্ত তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ প্রদানের জন্য অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। (১৬) পূর্ব্বোক্ত জাহাজ দলের মধ্যে একটী হারাইয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্ব বৃহৎ দুইটী জাহাজ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং অ্যাডমিরাল নিকলসন্ অবশিষ্ট সৈন্য গুলি লইয়া ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। ইত্যবসরে মান্দ্রাজ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য ১৫।২০ জন য়ুরোপীয় সৈন্য এবং কতকগুলি টোপাসি সৈন্য (Topasses) (১৭) রাখিয়া অবশিষ্ট ৪০০ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে হুগলী কুঠীর প্রধান বণিক প্রতিনিধি জব চার্ণক সাহেব কোর্ট অব ডাইরেক্টারের অনুমত্যানুসারে হুগলী কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের অধীনে আর একটি পোর্ত্তুগীজ পদাতিক সৈন্য দল রচনা করিলেন। (১৮) পূর্ব্বোক্ত জাহাজ দল নদীর মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র জব চার্ণক সাহেব ঐ সকলকে তৎক্ষণাৎ হুগলী কুঠীর নিম্নে আসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই সকল সৈনিকদলের আগমনে, ও আরও অধিক আসিবার সম্ভাবনায় এবং হুগলী নগরস্থ ইঙ্গরেজদিগের বৈরিতাভাব প্রদর্শনে নবাব সায়েস্তা খাঁ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং তাঁহার নিকট ইঙ্গরেজগণ যে মুদ্রা দাবি করিয়া থাকেন সে বিষয় সালিসি দ্বারায় স্থির করাইবেন স্বীকার করিলেন (১)।

ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য বাস্তবিক নবাব অকপট অন্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছিলেন কি না সে বিষয় নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছিল যে যদ্যপি কোনরূপ বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই বিবেচনায় তিনি সুবাদারির চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুগলীর অনতিদূরে উক্ত নগরের ফৌজদারের পরিচালনাধীনে সংগৃহীত সৈন্যদল রক্ষা করিয়াছিলেন। যৎকালীন একটী বন্দোবস্তে উপনীত হইবার বিষয় কথোপকথন চলিতেছিল, সেই সময়ে একটী অনপেক্ষিত ঘটনাসূত্রে উহার অন্যরূপ ফল প্রসব করিল। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮সে অক্টোবর তারিখে হুগলীর বাজারে অল্পসংখ্যক ইঙ্গরেজ সেনার সহিত একদল নবাব সৈন্যের বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত বিতণ্ডা ক্রমশঃ এক প্রকার সামান্য যুদ্ধে পরিণত হইয়া উঠে, উহাতে তিন জন ইঙ্গরেজ সেনা আহত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে একদল ইঙ্গরেজ সৈন্য তাহাদিগের সঙ্গিগণের রক্ষা করিবার জন্য উক্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, অন্যদিকে অসংখ্য নবাব সৈন্য ক্রমশঃ সমাগত হইলে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টাকাল চলিতে থাকে; কিন্তু

(১৬) Vide Orme's Military transactions in Industan.

(১৭) Portuguese Infantry

(১৮) Vide Stuart's History of Bengal, p. 314.

(১) Vide Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army, p. 15.

যদিও নবাব সৈন্য পদাতিক এবং অশ্বারোহী উভয়ের সংখ্যা ইঙ্গরেজ-সৈন্য অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক ছিল, তথাচ ইঙ্গরেজ সৈন্যের সাহস এবং অনুশাসনবশতঃ নবাব-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল। উভয় জাতির মধ্যে বঙ্গদেশে এই প্রথম যুদ্ধে ইঙ্গরেজগণ সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ৬০ জন নবাব সৈন্য হত এবং বহুসংখ্যক আহত হইয়াছিল, এবং তোপশ্রেণীর মধ্য হইতে ১১টি কামান ইঙ্গরেজসৈন্য হস্তগত করিয়া ঐ সকল বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল (২০)। এই যুদ্ধের সময়ে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য সংখ্যা ৪০০ শতের নূ্যন ছিল। ইত্যবসরে অ্যাডমিরাল নিকলসন তাঁহার পরিচালনাধীনে যে সকল যুদ্ধতরী ছিল, সেই সকল হইতে তিনি কামান দ্বারায় হুগলী নগরে ঘন ঘন গোলা বর্ষণ করিয়া প্রায় পাঁচ শত গৃহাদি ভস্মসাৎ করিলেন। ঐ সকল বিধ্বস্ত গৃহ সমষ্টির মধ্যে পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির গুদামঘর ছিল, উহা পুরাতন কুঠী নামে অভিহিত হইত। এই কাণ্ডে হুগলী নগরের বহুসংখ্যক বিবিধ প্রকারের দ্রব্য সামগ্রী বিনষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইঙ্গরেজ সৈন্য লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই। জব চার্ণকের এইরূপ পরিমিতাচারে তিনি কোর্ট অব ডাইরেক্টার কর্তৃক তিরস্কারিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে সৈনিকদিগকে উত্তমরূপে লুণ্ঠন করিতে অনুমতি প্রদান করিলে, দেশীয়েরা ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতার বিষয় বিলক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হইত। (২১)

হুগলীর ফৌজদারের পরাজিত হওয়ার পর যথার্থই যেন তিনি ভয়ানক ভীত হইয়াছেন, এই রূপ ভান করিয়া তিনি যুদ্ধ হইতে বিরাম করিবার প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে ইঙ্গরেজগণ কহিলেন যে যদ্যপি তিনি সমিতির অবশিষ্ট দ্রব্যাদি এবং বিশেষতঃ সোরা, যাহা প্রচুর পরিমাণে গুদামে রক্ষিত ছিল, তাহা জাহাজে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে পারেন। সন্ধি সম্বন্ধে পুনর্ব্বার কথোপকথন চলিতে লাগিল, পরিশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, যে পর্য্যন্ত না সম্রাটের নিকট হইতে নূতন ফারমান্দ প্রাপ্ত হওয়াযায়, তাবৎকাল ইঙ্গরেজগণ তাঁহাদিগের পুরাতন স্বত্বাধিকার অনুযায়ী ব্যবসায় করিতে থাকিবেন এবং বণিক সমিতির যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, উহা বিবেচিত হইয়া উহার মূল্য ৬৬ লক্ষ মুদ্রা নির্ণিত হইল। (২২)

এইরূপ কথোপকথন ও বন্দোবস্ত হইতেছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুনরাক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে মুসলমানগণ উদ্যোগ করিবার জন্য এইরূপ সময় ক্ষেপণ করিতেছিল। যুদ্ধের এই বিরামকালিন নবাব

(২০) Vide Bruce's Annals of the East Idnia Company Vol II. p. 579 and Stuarts History of Bengal, p. 314—15.

(২১) Vide Bruce's Annals of the East India Company Vol. II. p. 596.

(২২) Vide Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army Vol. I. p 16.

ঢাকা, মালদহ, পাটনা এবং কাশিমবাজারস্থ কুঠী সমূহ আক্রমণ, দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, এবং বণিক সমিতির প্রতিনিধিগণকে কারাবাস করিবার [redacted] আজ্ঞাপ্রদান করিয়া ছিলেন এবং ইত্যবকাশে তিনি অন্যান্য স্থান হইতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ফল ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঐ সকল সৈন্যকে তিনি হুগলীর সন্নিকটে একত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নবাবের এইরূপ সৈন্য একত্রিত করণের বিষয় অবগত হইয়া ইংরেজ বণিক সমিতির প্রতিনিধি, এবং কার্য্যকারিসভার সভ্যগণ সম্মিলিত হইয়া এই অভিমত স্থির করিলেন যে, এস্থানে আর অধিক কাল অবস্থিতি করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিরাপদ এবং সুফলপ্রদ নহে। এই অভিমত্যানুযায়ী তাহারা ২০সে ডিসেম্বর তারিখে যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য সামগ্রী, সৈন্য এবং জাহাজ সহকারে সুতানুটী গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।(২৩) উক্ত স্থানে সন্ধি সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। নবাব ইংরেজ বণিকদিগের সুবিধাজনক কতকগুলি প্রস্তাব-সহ তাহার তিনজন কর্ম্মচারীকে প্রতিনিধি স্বরূপ জব চার্ণকের নিকটে সুতানুটীতে প্রেরণ করিলেন। প্রস্তাবগুলি এই:— প্রথমত: পুরাতন নিয়মানুযায়ী ইংরেজদিগকে ব্যবসায় করিতে দিবেন। দ্বিতীয়ত: একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার [redacted] তাঁহাদিগকে এক খণ্ড ভূমি দান করিবেন। তৃতীয়ত: তাঁহারা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় (ট্যাকশাল) সংস্থাপিত করিতে পারিবেন। এবং চতুর্থত: নবাব বণিক সমিতির নিকট যে মুদ্রার জন্য ঋণী আছেন তাহা তিনি সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিন্তু যখন জব চার্ণক সাহেব এই সন্ধি প্রস্তাবিত সত্বগুলি সম্রাট এবং নবাবের স্বীকৃত বলিয়া স্বাক্ষরিত করিবার জন্য কহিলেন, তখন নবাবের প্রতিনিধিগণ ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান না করিয়া ক্রমশঃ বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সায়েস্তা খাঁ বিশেষ রূপ শত্রুতাচরণ করিবার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্যত্র ইংরেজদিগের এইরূপ দুর্দ্দৈব দর্শনে ফরাসিস ও ওলন্দাজগণ বিলক্ষণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা যে কেবল বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এমত নহে; ইহা ব্যতীত ইংরেজদিগের বাণিজ্যের প্রাধান্য ভাবশত: তাহাদিগের বাণিজ্যের যে রূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে পুনসংস্থাপিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। (২৪)

(২৩) Vide Bruce's Annals of the East India Company Vol. II. p 581 and Stuart's History of Bengal, p. 315.

(২৪) Vide Broome's History [redacted] the Rise and Progress of the Bengal Army. Vol. 1 p 17

ভৈরব।

অন্ধকার ভগ্ন কক্ষে বসিয়া ভৈরব ভাবিতে ছিল—উপায় কি? একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা নিকটে বসিয়াছিল। বালিকার নাম সুখময়ী—ভৈরবের দুহিতা। এই দুহিতা বই ভৈরবের আর কেহ নাই।

যে ভগ্ন অট্টালিকার ভগ্ন কক্ষে বসিয়া ভৈরব ভাবিতে ছিল, তাহা তাহার পৈতৃক ভবন।—এখন ভগ্নস্তূপ মাত্র, দেখিলে বোধ হয় না কখন বাসোপযোগী ছিল। নিকটে বসতি নাই, কেবল ধু ধু ধু ধু বিস্তীর্ণ মাঠ! সে মাঠে বৃক্ষ নাই, বিহঙ্গ নাই, শ্যামলতা নাই, কেবল শূন্য, শূন্য, সীমাশূন্য শূন্যতা! শূন্য অম্বর তলে শূন্য প্রান্তর! সে প্রান্তরে গাভী চরে না, শস্য ফলে না, রাত্রিতে লোক চলে না। জনপ্রবাদ ভৈরবের পূর্ব্বপুরুষগণ সেখানে ডাকাইতি করিতেন। এখন সে দস্যুবৃত্তি নাই, কিন্তু ভয় আছে।

পূর্ব্বপুরুষগণ যাহাই করুন, ভৈরবের সে ব্যবসায় ছিল না।

ভৈরব নীরবে ভাবিতেছে। নীরবে সুখময়ী নিকটে বসিয়া আছে। উভয়েরই কালি হইতে আহার হয় নাই।

দুরবস্থায় পড়িয়া শৈশবে এ বালিকার প্রবীণতা জন্মিয়া ছিল। সুখময়ী ক্ষুধায় আকুল হইলে আর কাঁদে না, ভৈরবকে কিছু বলে না, কেন না বলিলে ভৈরব কেবল কাঁদিতে থাকে মাত্র। বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে সে রোদন বড় বাজিত। দুর্দ্দশায় দশম বর্ষীয়া বালিকা শিখিয়াছিল—পিতৃ সমক্ষে কেমন করিয়া চক্ষের জল চাপিতে হয়, ভৈরব কাঁদিলে কেমন করিয়া ভুলাইতে হয়, আর পিতার জন্য রাখিয়া আপনি কেমন করিয়া অর্দ্ধাহার করিতে হয়।

দশম বর্ষীয়া বালিকা কালি হইতে আহার পাইল না, হা ভগবান্! উপায় কি? নীরবে প্রশ্ন করিয়া ভৈরব সুখময়ীর মুখ চায়। সুখময়ী নিরুত্তর, নীরস হাসি ফুটিতে ফুটিতে নীরস অধরে মিলাইয়া যায়। সুখময়ীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া ভৈরবের হৃদয় শুষ্ক হয়। অনাহারে এ ননীর পুত্তলি কয় দিন বাঁচিবে। ভৈরব! অনুমান সত্য! তুমি অন্ন চিন্তায় নিয়ত ব্যস্ত, দেখ নাই কুসুমে কীট পশিয়াছে। দুরন্ত ব্যাধি-কীট সুখময়ীর জীবন কুসুম ধীরে ধীরে কাটিতেছে। শান্ত সুবোধ মেয়ে অসুখের কথা কিছু বলে নাই, বুঝি, বুঝিতে পারে নাই। অসুখ হইলে ভাবিত ক্ষুধা, তাই কিছু বলে নাই।

সন্তান ক্ষুধায় আকুল—অন্নদানে অসমর্থ হইলে কি যন্ত্রণা অন্তর্যামী জানেন। বালি-

কার জননী নাই, এ জন্য দুহিতা ভৈরবের আরো প্রিয়তরা। সুখময়ী তাহার শ্মশান বাসে একমাত্র কুসুম, আহা অনাহারে সে বিজন কুসুম শুখাইবে। ভগবান দিয়াছিলে কেন?—উপায়?

নিরুপায় ভৈরব উপায় ভাবিয়া পায় না। দুর্দ্দিনে দুহিতার হস্ত ধরিয়া কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। দূরে যে পল্লী ছিল সেখানে লোকে তাহাকে দস্যু বংশজাত বলিয়া ঘৃণা করিত। ভৈরবের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিত এও দস্যু—দস্যুকে কে দয়া করিবে।

যখন সঞ্চিত পিতৃধন সকলই গেল, ভৈরব ভাবিল 'পৈতৃকসম্পত্তি এই ভগ্ন অট্টালিকা বিক্রয় করি।' কিন্তু ক্রয় করিবে কে? একে বিগলিত ভগ্ন স্তূপ, তাহাতে দস্যুর সম্পত্তি—পাপার্জ্জিত, তার উপর ভৈরব যাহাতে অর্থাভাবে—অনাহারে মরে সকলেরই ইচ্ছা। সম্পত্তি কেহ কিনিল না। কি উপায়। একাহারে, অর্দ্ধাহারে বনের শাক পত্র খাইয়া এ স্বর্ণ প্রতিমা কয় দিন জীবন ধরিবে। ভৈরব অতিথি শালায় অন্ন পায় না, চাহিলে কেহ ভিক্ষা দেয় না, পল্লীতে যায় পথের পরিত্যক্ত অন্ন, শৃগাল কুক্কুরে যাহা ঘৃণায় স্পর্শ করে না, যত্নে কুড়াইয়া আনে। পল্লীর বালকগণ ইট মারে, ঢিল মারে, ভগবান জানেন, নীরবে সকল সহ্য করিয়া, নয়নধারে কুড়াইয়া আনে। পল্লীর লোক দেখিয়াছিল, আর কেহ পথে পরিত্যক্ত অন্ন ফেলিত না। আহারে যাহার জীবন, দুই দিন তাহার উদরে অন্ন নাই! ভৈরব আজি ভিক্ষায় গিয়াছিল, প্রহার খাইয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়াছে। হা হতভাগিনি! তোর ক্ষুদ্র জীবনের কি কোন উপায় নাই?

ক্রমে সন্ধ্যা হইল।—একাকী এ জনশূন্য মাঠে কে যায়? সন্ধ্যা ক্রমে ঘোরতর হইয়া আসিতেছে, গগনে কাল-ছায়া ভাসিতেছে, পথিক দ্রুত পদে অগ্রসর। সহসা প্রবলবেগে পবন বহিল—নীরব প্রান্তরে করতালি সহকারে বিকট অট্টহাস্য উঠিল। এ কি প্রান্তর না প্রেতভূমি! পথিক থমকিয়া দাঁড়াইল। অগ্রে দেখিল ঘোর অন্ধকার, পশ্চাৎ দেখিল—ঘোর অন্ধকার, আকাশ দেখিল—ঘোর কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। অন্ধকার যেন চারিধার হইতে চাপিয়া আসিতেছে। ক্রমে আর দিক দেখা যায় না। পথিক প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—প্রান্তর বিক্ষিপ্ত অস্থিপুঞ্জচয় সে আলোকে হাসিয়া উঠিতেছে। মাঠে দস্যুভয়, অস্থিপুঞ্জচয় তাহার পরিচয় দিতেছে। পথিকের সঙ্গে অর্থ ছিল। সহসা মনে হইল, কোথা যাই, অগ্রে যদি দস্যু থাকে। পথিকের পদদ্বয় শঙ্কা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। ঐ না আলো জ্বলিতেছে! মনে ভরসা হইল, কিন্তু সে ভরসা অধিকক্ষণ রহিল না। অবশ্য এ আলোক কোন দস্যু প্রজ্বলিত। না না, সন্ন্যাসীও হইতে পারে, মনে আবার আশা উঠিল। আবার ভাবিল, হয়ত কোন ভয়ঙ্কর সর্প শিরে মণি জ্বলিতেছে। তীক্ষ্ণ দর্শনে দেখিল আলোক গবাক্ষ রন্ধ্র দিয়া আসিতেছে। পথিক তখন ভগ্ন স্তূপের অতি নিকট। মনে

ভাবিল, সন্ন্যাসী হউক, আর দস্যুই হউক, অনুনয় বিনয় শুনিবে, কিন্তু বজ্রবাত্যা বিনয়ের বশীভূত নয়। পান্থ আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিল।

গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, অতি কাতরস্বরে বলিল—'কে আছ, আশ্রয় দাও।' একবার, দুইবার, তিনবার ডাকিল, প্রত্যুত্তর নাই। দুইদিন আহার হয় নাই সুখময়ী আজি সন্ধ্যার সময় শুইয়াছে। ভৈরব ঘোরতর চিন্তায় মগ্ন।

পান্থ শেষে অধীর হইয়া গবাক্ষদ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল, ও অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। ভৈরব বাহিরে আসিয়া বলিল 'কে ও?'

পথিক উত্তর করিল, 'আশ্রয় দাও।'

ভৈরব বলিল, 'আশ্রয়ের অভাব নাই, কিন্তু আহার বড় দুষ্প্রাপ্য।'

পথিক বলিল 'আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট।'

'এস।'—ভৈরবের মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে পান্থ একটু ভীত হইয়াছিল। সরল ব্যবহারে সে ভয় রহিল না। নিঃশঙ্কচিত্তে ভৈরবের পশ্চাদ্গামী হইল।

সে ভগ্ন অট্টালিকায় দুই তিনখানি ঘর মাত্র ব্যবহারোপযোগী ছিল, পথিক তাহার একটী কক্ষে অবস্থিত হইলেন। অভ্যাগত অতিথিকে আহার প্রদানে অসমর্থ হইলে, মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতে হয়। ভৈরব তাহাই করিতে লাগিলেন।

পথিক ভৈরবের সরল ব্যবহারে প্রীত, দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, প্রাতে ভৈরবকে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিবেন মানস করিলেন। অতিথির কাছে যে অর্থ ছিল, কথায় কথায় ভৈরব তাহা বুঝিয়াছিল।

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ঝিম ঝিম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্লান্ত পান্থ নিদ্রাকৃষ্ট হইলেন। টাকার থলেটি কোমরে বাঁধিয়া, ছিন্ন কন্থা-শায়িত পথিক বৃষ্টি শব্দে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া, প্রিয়মুখ প্রস্ফুটিত সুখ ভবন ভাবিতে ভাবিতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। ভৈরবের চক্ষে নিদ্রা নাই। কখন শয্যাশ্রয় কখন পদচারণ—একি অন্ন চিন্তা? ভগবান জানেন, অন্ধকার কক্ষে, অন্ধকার হৃদয়ে, ভৈরব কাল ফণিনীর ন্যায় কি কাল চিন্তা পুষিতে ছিল।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। নীরব, নীরালোক প্রান্তরে রোদন স্বরে সমীরণ ভ্রমিতেছে। মন্দ মন্দ বরিষণ, মেঘের গুরু গর্জ্জন, থেকে থেকে চমকে দামিনী, ভীষণা যামিনী। ভৈরব বাহিরে আসিল। দেখিল গগনে ঘোর ঘনঘটা বিদ্যুৎ ছটায় ঝলসিতেছে। নিবিড় তিমিরাবৃত প্রান্তর শিহরিতেছে। যাও ভৈরব ঘরে যাও, দেখিতেছ না মেঘে বজ্রাগ্নি।

নির্ম্মল, নিষ্পাপ যার হৃদয়, বজ্রাগ্নিতে তার কি ভয়। কিন্তু তাত নয়। দুষ্টাকাঙ্ক্ষী এই ভৈরব ভাবিতেছিল, কি উপায়ে সেই নিঃসহায়, নিদ্রিত পথিকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে। উপায়ও অবধারিত করিয়াছে——হত্যা!

ভৈরব উন্মাদ অশনি নিনাদ শুনিল, শিহরিল। কোথা যাও ভৈরব? তুমি সর্ব্ব-

সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী কাল, কাল-শর্ব্বরীতে তুমি এক মাত্র প্রহরী! তোমার অনন্ত ভাণ্ডার কি বজ্র শূন্য হইয়াছে।

ভৈরব ঘরে গেল। কি অন্বেষণ করিতেছ! রজ্জু! ভৈরব রজ্জু পরিবর্ত্তে যদি কালসর্প ধরিতে পারিতে, বুঝিতাম তোমার অন্তরে কত বিষ।

সুখময়ী তখন শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। রজ্জু সংগ্রহ করিয়া ভৈরব ভাবিল, 'বৃথা কেন বিলম্ব করি। হত্যা, হত্যা বই উপায় নাই। অনাহারে আত্ম হত্যা বা নরহত্যা এই দুই বই আমার অন্য গতি কই। আমি মরি ক্ষতি কি, কিন্তু সুখ অনাহারে মরিবে, অতিথি তোমার সহস্র জীবন ইহার কাছে কি।'

জাগো, জাগো, সুখময়ী, দেখ তোমার জন্য কি সর্ব্বনাশ হয়। ভৈরব অতিথির কক্ষ দ্বারে, শয্যাপার্শ্বে।

ভৈরব কান পাতিয়া শুনিল, সময় স্তব্ধ। অতিথি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

উঠ, উঠ পথিক! দেখ, দেখ কাল-রজ্জু করে কালচর তোমার শিয়রে। উঠ উঠ! একি কাল নিদ্রা যে ভাঙ্গে না।

ব্যাঘ্র যেমন শীকার গ্রহণের অগ্রে, ওৎ করে, ভৈরব তেমনি ওৎ করিতেছিল। সহসা লম্ফে নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, নিঃসহায় পথিকের উপর পড়িল। সজোরে বক্ষ চাপিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রীবায় রজ্জু জড়াইল। একবার মাত্র কঠোর তীক্ষ্ণ চীৎকার পরক্ষণে আর রব নাই।

পান্থ মহা নিদ্রায় স্থির। ভৈরব শব দেহ ছাড়িয়া শয্যা সম্মুখে দাঁড়াইল। বুঝি নিশ্চিত করিতে দাঁড়াইল, অতিথি এখনও জীবিত আছে কি না। স্পন্দ নাই; শব্দ নাই। ভৈরব অর্থ গ্রহণ মানসে ধীরে ধীরে কর প্রসারণ করিল। ও কার পদ শব্দ! ভৈরব উঠিল, বাহিরে আসিল, অন্ধকারে অভ্যস্ত আঁখি দেখিল, কেহ কোথাও নাই। আবার কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। ভৈরব কার ভয়ে ভীত, অতিথিত জীবিত নাই, শব দেহকে ভয় কি? রুদ্ধ শ্বাসে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ভৈরব অতিথির কোমরে হাত দিল। একি! কে হস্ত চাপিয়া ধরে! ভৈরব হস্ত গুটাইয়া লইল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। কক্ষ স্তব্ধ। ভৈরব এবার যেন দুঃসাহসে ভর করিয়া অতিথির কটিদেশ হইতে টাকার থলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। এক দৌড়ে নিজ কক্ষে আসিল, অর্থ লুকাইল। পরে চিন্তা হইল মৃত দেহের গতি করা আবশ্যক। কি উপায়ে? ভৈরব খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানি বহুকালের মরচে ধরা কোদাল বাহির করিল। ভগ্ন স্তূপের কোন বিজন প্রদেশে গেল। গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টিতে মৃত্তিকা সিক্ত ছিল, গর্ত্ত খুঁড়িতে বড় পরিশ্রম হইল না। গর্ত্ত খনন শেষ হইলে, ভৈরব শব-দেহ তুলিয়া আনিল। গর্ত্তের ভিতর শুয়াইল, তার পর মাটি চাপা দিল। ভৈরবের ভৈরব কীর্ত্তি মেদিনী গ্রাস করিলেন।

হতভাগ্য পান্থ! কোথায় রহিলে? বন্ধুহীন, বিজন, অজানিত দেশে নিদ্রায় হতজীবন;—অন্ধকার ধরণী গর্ভে! পরিজন আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে—তুমি হেথা অনন্ত শয়নে—নীরব, নিশ্চল, নিশ্চিন্ত!

আর ভৈরব তোমার ভৈরব কীর্ত্তি ভূগর্ভে লুকাইয়া ভাবিলে কি তুমিও নিশ্চিন্ত হইলে। না। ঐ দেখ তুমি পশ্চাৎ না ফিরিতে ফিরিতে মেদিনী তিমির কবল ব্যাদান করিল, উগারিল, ভীষণ শবদেহ উগারিল। দেখ দেখ! কণ্ঠে কাল বজ্জু বিসর্পিত। কি ভয়ঙ্কর মুখ। কি ভয়ঙ্কর কর্দ্দমাক্ত দেহ। পান্থ তুমিত অত দীর্ঘ ছিলে না। ভীষণ রসনা লক্ লক্ ঝুলিতেছে, লোহু ঝরিতেছে। ভীষণ রক্তাক্ত নয়নে কি অনৈসর্গিক উজ্জ্বলতা। একি। পান্থ তুমি কি কাঁদিতেছ? কিন্তু ও ত বারি ধারা নয়, ও যে রুধির ধারা। ও কি রব।—পবন?—না তোমার রোদন।

ঘোর অন্ধকার কিন্তু ভৈরব যেন শত সূর্য্য কিরণে সহস্র লোচনে এই বিকট দৃশ্য দেখিল। চক্ষু মুছিল, আবার দেখিল সেই ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তি। ভাবিল একি! গর্ত্ত কি পূর্ণ করি নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিল মৃত্তিকা আদৌ বিচলিত হয় নাই। দ্রুত পদে ভৈরব ঘরে ফিরিল। ঘর অন্ধকার, সুখময়ীর শয্যা পার্শ্বে বসিল। একি সে বিকট মূর্ত্তি আবার কক্ষ দ্বারে।

ভয়ে কম্পিত স্বরে নিবিড় নিরব [illegible] কম্পিত করিয়া ভৈরব তখন ডাকিল—"সুখ। সুখ।" সুখময়ী নিরুত্তর।

ভৈরব আরও ভীত হইয়া ডাকিল—"সুখ! সুখ!" উত্তর নাই।

ভৈরব ঘন ঘন ডাকিতেছে আর দ্বারদেশ দেখিতেছে, বিকট অতিথি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। রোষকষায়িত লোচন ভৈরবের উপর অর্পিত।—"উঠ-উঠ সুখ।"

সুখ কি আর উঠিবে? ভৈরব সুখময়ীর শরীরে হস্তার্পণ করিল, শিহরিল, শীতল—শীতল—শীতল, তুষার অপেক্ষাও শীতল।

ভৈরব। সুখময়ী আর জাগিবে না। রুগ্ন শরীরে তুই দিন অনাহারে সুখ তোমার অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত।

ভৈরব দীপ জ্বালিল।—"সুখ নাই তবে কার জন্য এ মহাপাতক সঞ্চয় করিলাম?"

বিকট-ছায়াদেহধারী বিকট খল খল হাসিয়া উঠিল। "থাম থাম পান্থ। এই নাও তোমার অর্থরাশি।" অর্থ ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

"সুখকে লইবে? দিবনা দিবনা।" মৃতদেহ তুলিয়া বক্ষোপরি চাপিয়া ধরিল।

কঠোর বায়সরবে সে কঠোর যামিনী পোহাইয়া গেল। রাত্রি পোহাইল, কিন্তু সে জনশূন্য প্রান্তরে উষা হাসিল না। ভগ্ন স্তূপের কক্ষে কক্ষে অধীর সমীর কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুরিতেছে, বুঝি সে বিজন কুসুম সুখময়ীর অন্বেষণে ফিরিতেছে। ভৈরবের ভীমকায় ভূমিতলে লম্বমান। শুষ্কহৃদয়ে মৃত সুখ। নীরসনেত্র স্থির, শরীর স্পন্দহীন—একি নিদ্রা না মহানিদ্রা?

ভাইটা নোভা।

"——Wilt thou accept not
The worship the heart lifts above,
And the Heavens reject not—
The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow,
The devotion to some thing afar,
From the sphere of our sorrow?"

কবির স্বপ্নময়ী লেখনী নিঃসৃত কথা শুনিতে অতি মধুর বটে, কিন্তু বোধ হয় জগতে এ পর্য্যন্ত অতি ন্যূন সংখ্যক প্রেমিক স্বীয় হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীকে অকপটে এরূপ বলিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ নিঃস্বার্থ প্রেমে হিংসার বৃশ্চিক দংশন নাই, রোষ হুতাশনের জ্বলন্ত শিখা নাই, ভগ্ন-হৃদয়ের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস নাই, বা প্রতিহিংসার বিষময় ফল নাই। গোপনে সুখের মিলন, পরস্পর সমীপে পরস্পরের হৃদয় উদ্ঘাটন, প্রথম প্রণয় সম্ভাষণের সুখ, দণ্ডমাত্র অদর্শনে দারুণ বিরহ ব্যথা, অকারণ মান, ও তদ্‌ভঞ্জনার্থ 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্' অভিনয়, এ ভালবাসার অঙ্গ নহে। এরূপ প্রণয়ের পাত্র বা পাত্রীর হৃদয় অপরাক আশ্রয় করিলেও ইহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় না। মিলন ইহার চরম উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এ নিঃস্বার্থ প্রেম মানব সমাজে অতি বিরল। জগতের মহত্তম প্রণয়-দৃষ্টান্তেও স্বার্থপরতা লক্ষিত হয়। পুরাকালে গ্রীকদিগের লিউকেডিয়া সমুদ্র ইহার সাক্ষ্য দিয়াছিল। সূর্য্যমুখীর পলায়ন ওয়ার্থরের হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা ও দেহত্যাগ এবং ডেস্‌ডেমোনার লোমহর্ষণ অকাল মৃত্যু ইহার উজ্জ্বল উদাহরণস্থল।

অনেকে মনে করেন এরূপ প্রেম জগতে নাই। ইহা প্লেটোর স্বপ্নমাত্র, কবির কল্পনায় সৃষ্ট ও প্রচলিত, জনসমাজে ইহা আদৌ অসম্ভব। কিন্তু যিনি আধুনিক ইতালীর অদ্বিতীয় কবি ডান্‌টের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই একথা স্বীকার করিবেন না। "ভাইটা নোভা" পাঠক কখনই এ মতাবলম্বী হইতে পারেন না। ইহা ডান্‌টের সর্ব্ব প্রথম রচিত কাব্য। তাহার জীবনের নবম বর্ষ হইতে সপ্তবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। এ কাব্য তাঁহার যৌবনের প্রণয় আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকা স্বপ্নবৎ বটে কিন্তু সকলই সত্য, অন্তহৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস ও সারল্যে আবৃত। ঘটনাগুলি কাব্য আবরণে সজ্জিত হইয়া এরূপ মোহিনীশক্তি ধারণ করিয়াছে, যে তাহারা আর প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও বা কুজ্ঝটিকাভ্যন্তরস্থবৎ অস্পষ্ট চিত্রে কোথাও বা সূর্য্যরশ্মিবৎ উজ্জ্বল দৃশ্যে পাঠক যথার্থ ঘটনাসূত্র হারাইয়া ফেলেন। কাব্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহা আদ্যোপান্ত সাঙ্গরূপক। অতুলনীয়া বিয়াট্রিস বাস্তবিক কোন মানবী নহেন; তিনি মানব জীবনের উচ্চতম জ্ঞানালোক। কিন্তু

যাঁহারা প্রকৃত ডান্‌টেকে বুঝিয়াছেন তাঁহারা কেহই একথা বলেন না। কবি এরূপ অকপটে ও সরলতা সহকারে তাঁহার যৌবনের ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন যে তাহাতে অস্বাভাবিক বা অমানুষিক কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঘটনাগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

ডান্‌টে ও তাঁহার প্রণয়িনী বিয়াট্রিস উভয়েই ফ্লরেন্স নগরীর এক পল্লীতে বাস করিতেন। উভয়েই আশৈশব পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন। উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তৎকালে উক্ত নগরীতে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল; ও পর্য্যায় ক্রমে কয়েকটী পক্ষের উপর শাসনভার অর্পিত হইত। কোন পক্ষ প্রধান হইলে তাহার বিপক্ষেরা নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইত। ডান্‌টের জন্মকালে তাঁহার পিতাকেও এই দশাপন্ন হইতে হইয়াছিল। সেই কারণ বশতঃ বাল্যকালে বিয়াট্রিসের ন্যায় উচ্চ সমাজে তাঁহার গতায়াত ছিলনা।

নবমবর্ষ বয়স্ক ডান্‌টে একদা তাঁহার পিতামাতার সহিত বিয়াট্রিসের পিত্রালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। বিয়াট্রিস তখন দ্বাদশবর্ষীয়া। বালকবালিকার এই প্রথম সাক্ষাৎ ও বালক জীবনের এই সময় অবলম্বনে 'ভাইটানোভার' সূত্রপাত। সেই শৈশবাবস্থা হইতেই বালিকার প্রতি দৃঢ় অনুরাগে ডান্‌টের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। বিয়াট্রিসকে দর্শন মাত্রেই তাঁহার ধমনী শোণিত প্রবল বেগে বহিয়াছিল। এই ঘটনার ঠিক নয়বৎসর পরে 'ভাইটানোভা' বর্ণিত দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে। শ্বেত বসনা বিয়াট্রিস অপর দুইটী সহচরীর সহিত রাজপথে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ডান্‌টে স্পন্দহীন কাষ্ঠপুত্তলি-বৎ মুগ্ধাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিয়াট্রিস অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রেমিক ডান্‌টের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বিয়াট্রিসকে দেখিয়াছেন, তাঁহার দুইটি মধুর বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, ও তাঁহার অভিবাদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইহা অপেক্ষা স্বীয় উদার প্রণয়ের অধিক প্রতিদান চাহেন না। ইহাতেই আনন্দে অধীর হইয়া পাগলের ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে স্বীয় নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করত বিয়াট্রিস চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন। নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় স্বপ্ন দেখিলেন যে প্রণয়দেবতা তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান; তাঁহার হস্তে ডান্‌টের জ্বলন্ত হৃদয় ও ক্রোড়ে বস্ত্রাবৃতা নিদ্রিতা বিয়াট্রিস। রমণী জাগরিত হইয়া দেবের আজ্ঞাক্রমে ডান্‌টের হৃদয় ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর দেবতা রোদন করিতে করিতে অদৃশ্য হইলেন্।

এই স্বপ্ন দর্শনের পর ডান্‌টে অতি উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন ■ বহুদিনের পর আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর তাঁহার বিয়াট্রিসের উপর আসক্তি কেহ জানিতে না পারে এই জন্য তিনি অপর কোন স্ত্রী-লোককে ভালবাসেন বলিয়া ভাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। ইহা সকলের কর্ণগোচর হইল ■ উক্ত রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক রটিবার

উপক্রম হইল। লোকপরম্পরায় এই বিষয় বিয়াট্রিসেরও কর্ণে উঠিল এবং পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আর ডান্‌টেকে অভিবাদন করিলেন না। যুগব্যাপী বিরহের পর প্রণয়ীযুগলের মিলনসুখ অপেক্ষা বিয়াট্রিসের কেবলমাত্র অভিবাদনে ডান্‌টে অধিকতর আনন্দ অনুভব করিতেন। সেই অভিবাদনগ্রহণ মুহূর্ত্তে তিনি বিশ্বপ্রেমিক হইয়া যাইতেন; শত্রু মিত্র ভেদাভেদ কিছুমাত্র থাকিত না, পরকৃত অপরাধ-সমূহ বিস্মৃত হইতেন। স্বকীয় অসীম ভালবাসার কেবল ঐ টুকুমাত্র প্রতিদান পাইয়াই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। আজি সেই অভিবাদনে বঞ্চিত হইলেন। ইহা অপেক্ষা প্রেমিকের মর্ম্মান্তিক যাতনা আর কি হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে গৃহে পৌঁছিয়া হৃদয়ের সুখের বা দুঃখের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার একমাত্র স্থান সেই নিভৃত কক্ষে অশ্রুপাত করত দারুণ হৃদয় ব্যথা সান্ত্বনা করিলেন।

পুনরায় এক বিবাহ সভায় ডান্‌টের সহিত বিয়াট্রিসের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে দেখিবামাত্রেই কবির ভাবান্তর উপস্থিত হইল, [illegible] সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। তিনি পূর্ব্বে বিয়াট্রিসকে এত সন্নিকটে কখনও দেখেন নাই। ঐ রমণী তৎকালে অন্যান্য স্ত্রীবর্গে পরিবৃত ছিলেন। ডান্‌টকে তদবস্থ দেখিয়া রমণীসমাজে কৌতুকরব উঠিল। বিয়াট্রিসও তৎসঙ্গে যোগ দিলেন। পতনোন্মুখ ডান্‌টে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক স্থানান্তরে নীত হইলেন ও তাঁহার অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কেবল এই-মাত্র বলিলেন "আমি জীবনের যে পথে পদার্পণ করিয়াছি সে পথে অগ্রসর হইলে প্রত্যাগমন অসম্ভব।" পরে গৃহে আসিয়া নিভৃতকক্ষে হৃদয় খুলিয়া রোদন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে ডান্‌টের বিয়াট্রিসের প্রতি অনুরাগ জনসমাজের গোচর হইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে কয়েকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী পথে কবির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বিয়াট্রিসকে দেখিবামাত্রই তুমি যদি সংজ্ঞাহীন [illegible] তবে তাহাকে তোমার ভালবাসিবার কি ফল?" ডান্‌টে উত্তর দিলেন "আমার প্রেমের বিনিময়ে কিছু চাহি না ও পাইবার কখনও আশা করি নাই। কেবল বিয়াট্রিসের অভিবাদন পাইয়াই আমি আপনাকে পরম সুখী ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতাম। অধুনা তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াম। তথাপি আমি অসুখী নহি। আজি হইতে বিয়াট্রিসের নাম কীর্ত্তন করাই আমার জীবনের ভাবি উদ্দেশ্য হইল। তাহার যশোগান করিয়াই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। ইহা হইতে সে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।" এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে উক্ত রমণীর নাম গানকরা যথার্থই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। তিনি এই কার্য্যে এত সুখী হইলেন যে পূর্ব্বে ইহা করেন নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এই মহাব্রত কিরূপ মহাপ্রথায় উদ্যাপন করিয়াছিলেন তাহা 'ডিভাইন কমেডি' পাঠকেরা অবগত আছেন।

এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর ডান্‌টের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিয়াট্রিসের রূপ গুণরাশির মাহাত্ম্য কবিতার পর কবিতায় নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে বিয়াট্রিসের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সাইমন ডি বার্ডি নামক জনৈক উচ্চ বংশীয় যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। এই বার্ডি বংশেই পরে জর্জ ইলিয়ট সৃষ্ট রোমোলা জন্মগ্রহণ করেন। সে যাহা হউক বিয়াট্রিসের পিতার মৃত্যুর পর প্রিয়তমার দুঃখে ডান্‌টেও অধীর হইয়া উঠিলেন। শোকাগারের দ্বারদেশেই তাঁহার বাসস্থান হইল। তথাপি গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে, বা যাহারা তথায় গতায়াত করিতে ছিল তাহাদের বিয়াট্রিসের সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইত না। প্রত্যাগমনকারী-দিগের কথোপকথনে সংবাদ জ্ঞাত হইবার আশায় দ্বার সন্নিকটে বসিয়া থাকিতেন। যদি কেহ কহিত "আহা বিয়াট্রিসের রোদন শুনিলে আমাদেরও মরিতে ইচ্ছা করে," অমনি ডান্‌টে মুখ ফিরাইয়া বস্ত্রে নয়ন আবৃত করিতেন।

ইহার অল্পকাল পরে ডান্‌টে পুনর্ব্বার কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। রুগ্ন শয্যায় নিজের মৃত্যু ভাবনা হওয়া দূরে থাকুক, বিয়াট্রিসকে এক দিন মরিতে হইবে এই চিন্তায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইল। নিদ্রি-তাবস্থায় কতই ভীতি জনক স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন। কখনও বা তাঁহার মনে হইল সূর্য্য তমসাবৃত হইয়াছে, নক্ষত্ররাজি রোদন করিতেছে, ঘোরতর ভূমিকম্পে জগৎ আলোড়িত হইতেছে, বিহঙ্গকুল তাঁহার চতুর্দ্দিকে পড়িয়া মরিতেছে। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে যেন কোন বন্ধু তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিল "তুমি কি জান না যে তোমার অতুলনীয়া রমণী প্রাণত্যাগ করি-যাছে।" রোরুদ্যমান স্বপ্ন দর্শক ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন স্বর্গের মুক্ত দ্বার পথে একখানি শুভ্র প্রখর জ্যোতি তেজোময় মেঘ দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নয়নপথ হইতে আকাশ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি যেন বিয়াট্রিসের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে নীত হইলেন। কখন কখন নিদ্রিতাবস্থায় বিয়াট্রিসকে পরিত্যাগ করিতে মৃত্যুর নিকট সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতেন।

পীড়া আরোগ্য হইবার পর কবির মোহিনী শক্তি বলে বিয়াট্রিসের যশোরাশি পুনর্ব্বার দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বিয়াট্রিস সম্বন্ধে কোন ঘটনা ডান্‌টের গোচর হইবা মাত্র কবিতায় পরিণত হইত। উক্ত রমণী বিষয়িণী প্রত্যেক চিন্তা কাব্যা-কার ধারণ করিত। ক্রমশঃ এই রূপে বিয়াট্রিস ফ্লরেন্স নগরে দেবীর ন্যায় আরাধ্যা হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজ পথে গমন করিলে উহা জন সমাকীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু কবির অধিক দিন আর এই রূপে অতীত হইল না। একদা নিজ আবাসে বসিয়া প্রণয়িণী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যে বিয়াট্রিস সত্য সত্যই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তৎ-

ক্ষণাৎ তাঁহার লেখনী স্তব্ধ হইল—বীণা নীরব হইল। এই স্থানেই প্রকৃত 'ভাইটা নোভা'র শেষ—ইহাই তাঁহার পার্থিব প্রণয় কাহিনীর পরিণাম। তাঁহার যৌবনের এই অপূর্ব্ব ইতিহাস রহস্যময় বটে কিন্তু তথাপি ইহা অকৃত্রিম প্রণয়ের উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিয়াট্রিস ডান্‌টের নিকট মানবী নহেন, কোন কলঙ্কিত পার্থিব উপকরণে গঠিত নহেন। বিশুদ্ধাত্মা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্ত্তি। পাঠক যদি এপিসাইকিডিয়ন (Epipsychidion) পড়িয়া থাকেন তবে এইরূপ মূর্ত্তির অর্চ্চনা বুঝিতে পারিবেন :—

"Seraph of Heaven ! too gentle to be human,
Veiling beneath that radiant form of woman
All that is insupportable in thee
Of light, and love, and immortality ;
* * * *
Thou Wonder, and thou Beauty and thou Terror !
Thou Harmony of Nature's art ! thou Mirror
In whom, as in the splendour of the Sun,
All shapes look glorious which thou gazest on !

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী।

হিতাহিত জ্ঞানের মূল কি ?

জগতের মধ্যে কর্ম্ম শূন্য কেহ নহে—সকলই ক্রিয়াশীল। বিশেষতঃ মানবমণ্ডলীর কর্ম্ম ভিন্ন জীবনে অন্য কোন অবলম্বন নাই ; সুতরাং কোন্ কর্ম্ম বৈধ এবং কোন্ কর্ম্ম অবৈধ ইহা মনুষ্য মাত্রেরই একটী সর্ব্ব প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই প্রশ্নের উত্তর যিনি যেভাবে দিবেন, তাঁহার উপর তাঁহার ভবিষ্যত উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে ; এবং এই প্রশ্নের উত্তর যিনি যে ভাবে দিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অতীত কালের উন্নতি অবশ্যই নিয়মিত হইয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম বৈধ তাহার নিশ্চয় করিয়া যে শ্রেণির লোকেরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন এবং কার্য্যের মধ্যে যাহা অবৈধ তাহা স্থির করিয়া যাহারা তাহার অধিকাংশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন—সে জাতিই অবনীমণ্ডলে সভ্যতার উচ্চভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। বস্তুতঃ কর্ম্মই মনুষ্যের ইহজীবনের স্থিতির ও সর্ব্ববিধ উন্নতির একমাত্র উপায়। আমরা এখানে অস্বীকার করিনা—যে এমন যোগী ও ভক্ত আছেন বা হইতে

পারেন যাঁহাদের উন্নতির জন্য কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, যাঁহারা সংক্ষেপত কর্ম্মের অতীত, কিন্তু এ স্থলে ইহাও দেখা আবশ্যক যে এরূপ যোগীও ভক্ত মহাত্মাদিগেরও শরীর ধারণাদি ফললাভের জন্য তদুপায় স্বরূপ কিছু কিছু কর্ম্মেরও আবশ্যকতা আছে। এখন স্থূলতঃ এই বোঝা যাইতেছে যে দেহী মাত্রেরই কর্ম্মের প্রয়োজন আছে, দেহ যত দিন থাকিবে তত দিন কর্ম্মকে ছাড়িতে পারেন এমত মনুষ্য নাই বা হইতে পারে না। যোগীও ভক্তদিগের কথা বাদ দিয়া আমাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মই সর্ব্বে সর্ব্বা—আমরা বাস্তবিকই কর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত কোন অবস্থাই প্রাপ্ত হইতে পারি না; আমরা সর্ব্ব প্রকারেই কর্ম্মের অধীন। কর্ম্মের উপরই আমাদের সমস্তই নির্ভর করিতেছে—আমরা যে ভাবে কর্ম্ম করিব সেই ভাবে আমরা উন্নতও অবনত হইতে থাকিব। যদি ন্যায়াচরণ ও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি তাহা হইলে অবশ্যই সর্ব্ববিধ উন্নতি আমাদের আয়ত্ত হইবে, নচেৎ দৈনিক অবনতি তাহাও আমাদের অধর্ম্মাচরণ ও অন্যায়াচরণের ফল।

কর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, তথাপি সংক্ষেপে আমরা ঐ প্রয়োজনীয়তাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিনা। প্রথমতঃ, কর্ম্মের দ্বারাতেই আমাদের শরীর ধারণাদি হইয়া থাকে—ইহাকেই আমি পূর্ব্বে আমাদের স্থিতি বলিয়াছি। ইহা সহজেই সকলের অনুমেয় যে আমরা নিষ্ক্রিয় হইলে আমাদের কি হীনাবস্থাই হইবে, এমন কি ক্রমে মনুষ্যবংশ লোপ হইবে, সুতরাং এই স্থিতি সাধনের জন্য আমাদের পক্ষে কর্ম্ম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মানব কেবল জীবনধারণ ও ভরণপোষণ প্রভৃতি কর্ম্মেই সুখী বা তৃপ্ত নহে, তাহার অন্যবিধ কাজ আছে। অসভ্যাবস্থায় কিছুদিন কেবল প্রথমাবধি প্রয়োজন সাধনেই মানব সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু ক্রমে যখন মানবের জ্ঞান সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং ক্রমে যখন তাহার মনের মধ্য হইতে অব্যক্ত ভাবরাশি ব্যক্ত ও পরিস্ফুটাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিবার সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে তখন হইতে মানবের কর্ম্মের গতি অন্যদিকে যায় ও সেই অবধি তাহারা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যান্তর বুঝিয়া তৎসাধনোপযোগী কর্ম্মে যত্নবান ও ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করে। মনুষ্যের উন্নতির চেষ্টা স্বাভাবিক—কি করিলে নিজের পরিবারের এবং সমাজের উন্নতি হইবে ইহারই অন্বেষণে মানবীয় মন নানাদিকে ধাবিত হইয়া তাহাদের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বে কর্ম্মের লক্ষ্য সামান্য ছিল, এখন হইতে তাহা প্রসারিত হইতে লাগিল। এই অবস্থাতেই মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় এবং [illegible] অতি গুরুতর অধ্যায়ের আরম্ভ হয়। সুসভ্য জাতিরা এখনও এই চেষ্টা হইতে

শিথিলপ্রযত্ন হবেন নাই। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত এখন তাঁহারা পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য নিয়ত কার্য্য করিতেছেন। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে বৈধ কর্ম্মের প্রয়োজন—এইখানে এই প্রশ্নের মীমাংসা কিছু কঠিন। প্রশ্ন কিছু অন্যবিধ নহে—একই জিজ্ঞাস্য, কোন্ কর্ম্ম বৈধ এবং কোন্ কর্ম্ম অবৈধ? কেবল এই দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্দেশ্য ভেদে, এবং উদ্দেশ্যের গুরুতা নিবন্ধন, আমাদের এই প্রবন্ধের শিরোভাগের প্রশ্নের এই স্থলের মীমাংসা বা উত্তর কিছু কঠিন ও জটিল। আমরা উন্নতির কথা এতক্ষণ আভাসে মাত্র বলিতেছি তাহার সাধারণ সংজ্ঞা Secular বা ঐহিক উন্নতি? এই উন্নতি সাধন করিতে হইলে কিরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং সামাজিক উন্নতি যখন পরস্পরের কর্ম্মসাপেক্ষ তখন কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে মানবগণ সাধারণতঃ সেই রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে তাহা জানা নিতান্তই আবশ্যক। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ—ব্যক্তিগত উন্নতি সমষ্টি বিশেষই সামাজিক উন্নতি। এই দ্বিতীয় বিধ উন্নতির সাধক যে সকল কর্ম্ম তাহা বিস্তার ভাবে আলোচনা করা সহজ ব্যাপার নহে। ইউরোপে সমাজ বিজ্ঞানের এই নূতন আলোচনা হইতেছে মাত্র। ফ্রান্সদেশে কোমৎ এবং ইংলণ্ডে হার্বার্ট স্পেন্সর এই বিজ্ঞানের শিক্ষক। এই যে সামাজিক বা ঐহিক উন্নতির কথা বলা হইল, ইহা কি প্রণালীতে সুসিদ্ধ হইবে, এবং মানব সমাজই বা কি কি শক্তিতে চালিত হয়—এই সকল অতি গুরুতর কথা, ইহার আলোচনা করাও আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে কেহই অবিশ্বাসী নহেন—সকলই ইহার জন্য ব্যস্ত। এই মতে আমরা সকলেই একীভূত হইতে পারি, কিন্তু এ স্থলেও কি উপায় অবলম্বন করিলে সামাজিক উন্নতি সংসাধিত হইবে ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক ও বিবাদ আছে। অনেক এমন লোক আছেন যাঁহারা আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এই উন্নতিকেই মানবগণের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করেন। Secular বা ঐহিক উন্নতি অতি বিস্তৃত কথা। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এই পৃথিবী সংক্রান্ত বিষয় যে উন্নতির লক্ষ্যস্থল সেই উন্নতিকেই ঐহিক উন্নতি সংজ্ঞা দেওয়া হইতে পারে। এই সংসারে কিসে নিজেকে নিজের পরিবারকে, দেশকে ও সমগ্র মানব সমাজকে সুখী করিতে পারিব এই চিন্তাই এক প্রকার উন্নতি প্রাপণেচ্ছুদিগের মনে একমাত্র ধ্যান। এই উন্নতির অন্য আরও এক লক্ষণ আছে—পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এই উন্নতির উদ্দেশ্য নহে। কোন উদ্দেশ্য সাধিত করিতে হইলেই তৎসাধনোপযোগী কর্ম্মের প্রয়োজন আছে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐহিক উন্নতির জন্য আমাদের কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য—তাহা হইলে সেই একই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে—কোন্ কর্ম্ম আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য বৈধ ও কোন কর্ম্ম অবৈধ?

তৃতীয়তঃ। যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ধর্মভীত তাঁহারা সকলেই জানেন যে আমরা সকলেই বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন দশা প্রাপ্ত। ইহার কারণ কি—তাহা লইয়া বিচার করা এখানে প্রয়োজন নাই। এই আধ্যাত্মিক অবনতির অবস্থা হইতে কি উপায়ে পুনরায় আবার আমরা আধ্যাত্মিক বা Spiritual উন্নতির অবস্থা প্রাপ্ত হইব তাহাও আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হইতেছে অনেকেই এই আধ্যাত্মিক উন্নতির নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চন করতঃ নানা তর্কজাল বিস্তৃত করিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, আমরা ইহা বুঝিতে পারিলেও এই শ্রেণীর তার্কিকদিগের সহিত তর্ক বাড়াইব না। আমরা এই স্থলে এই তৃতীয় বিধ উন্নতির সাধন লইয়া যাহা কিছু বলিব তাহা কেবল কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও তৎসম্বন্ধে কর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার প্রদর্শনের জন্য বলিব মাত্র। যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার অবিশ্বাসী তাঁহারা এই টুকু বাদ দিয়া দেখিলেও মূল প্রবন্ধের পক্ষে কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যখন আধ্যাত্মিকতায় স্থির বিশ্বাসী এবং যখন ইহাও জানি যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা আধ্যাত্মিকতায় হীন দশাগ্রস্ত ও পুনরায় আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের পক্ষে রীতিমত ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রয়োজন আছে; সুতরাং প্রবন্ধের সম্পূর্ণতারজন্য আমরা এই আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাসী তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা ভগবৎ প্রসাদে তর্ক ছাড়িয়া শীঘ্রই প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের মোহকে দূর করিতে সক্ষম হয়েন। আমরা এই পৃথিবীতে কি কারণে জন্মিয়াছি, এই মানব জীবনে কি কারণেইবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এই হীনাবস্থা হইতে উন্নীত হইবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা হইলে সেই উপায়ই বা কি—এই সকল বিষয়ে এত কথা বলিবার আছে যে, তাহা সংক্ষেপে বলা সম্ভব নহে। আমরা এই জাতীয় অবস্থা হইতে পুনরায় কি উপায়ে চিন্ময় ধামের উপযুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিব, ও সেই উপায়ই বা কি কি কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এই সকল ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান আলোচনাও সাধনার বিষয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মানবগণ কত প্রকার ভাল মন্দ উপায় অবলম্বন করিয়াছে ও কত প্রকার অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা জাগতিক ধর্ম্মেতিহাসের কিছু মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা, তাহার কিছু না কিছু অবগত আছেন। বস্তুতঃ বলিতে গেলে ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম পৃথিবীতে হইয়াছে বা হইতেছে, তত অধর্ম্ম আর কিছুতে হইয়াছে বা হইতেছে কিনা সন্দেহ। এই সকল অবস্থা যাঁহারা একটু পর্য্যালোচনা

করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে উচ্চ মনের কতদূর হীন দশা হইতে পারে। অনেকেই অবগত আছেন যে ধর্ম্মাচরণের ছলে পূর্ব্বদেশীয় তান্ত্রিকেরা মদ্য পানের ও ইন্দ্রিয়াশক্তির চূড়ান্ত করিয়া থাকেন এবং অনেক খৃষ্টীয়ান তাঁহাদের কোন পর্ব্বাহ বিশেষের সময় মদ্য পানের একশেষ করিয়া খৃষ্টের অনুমতি পালন করিতেছেন বলিয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা ঈশ্বরের নৈতিক শাসনে বিশ্বাসবান্—তাঁহারা ইহাতে ক্ষণিকের জন্য দুঃখিত হইলেও ঈশ্বরের সর্ব্ব মাঙ্গল্যে কিঞ্চিন্মাত্রও অবিশ্বাসী হয়েন না। তাঁহার গীতায় ভগবান যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল থাকেন। যে উপায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অভ্যুদয় সম্ভব তাঁহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা উচিত। আমাদের বিশ্বাস যে সৎধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ অবলম্বনই—আধ্যাত্মিক উন্নতির অতি প্রধান সহায়। এই আধ্যাত্মিক উন্নতি একটু গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই ভক্তি বৈধীও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বরভক্তি আবার উৎপত্তির প্রণালীভেদে দুই প্রকার যথা—আকস্মিক ও ক্রমোন্নতি। এ স্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আমরা এখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি লইয়া যাহা কিছু বলিলাম তাহা আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসের ফল। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে ইহাদের সম্বন্ধীয় যুক্তির অবতারণা কিছু মাত্রই করা গেলনা। অনেক কথাই সংক্ষেপে বলা হইল, কোন কোন স্থলে নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম, কারণ এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা দেখান—ধর্ম্মালোচনা নহে। এই জগতে কাহারও কাহারও "আকস্মিকী ভক্তির" উদয় হইতে দেখা যায় :—যেমন 'সেন্ট পল' 'ওমার' ও জগাই-মাধাই প্রভৃতি জীবন চরিতপাঠে জানা যায়। এই প্রকার আকস্মিকী ভক্তির উদয় হওয়া জগতে বড়ই দুর্লভ। সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে ক্রমোন্নতি প্রণালীই অবলম্বন স্থল। আমরা শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এখানে এই দুই প্রণালীর কথা লিখিলাম। এখন ক্রমোন্নতি প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছি। কর্ম্ম করিতে করিতে যে ভাবের কর্ম্ম করা যায় কর্ত্তার মানসিক গতিও সেই দিকে পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য কাল সাপেক্ষ, তাহাতেই এই পরিবর্ত্তনকে ক্রমিক পরিবর্ত্তন বলে। এই ক্রমোন্নতির জন্যই মানবগণ ধর্ম্ম জীবন প্রাপ্ত অবধি নানা প্রকার সাধনা ও যাগ-যজ্ঞ করিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায় লোকের ধর্ম্ম জীবন প্রাপ্ত হইতে ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রয়োজন আছে, সুতরাং এখানেও সেই একই প্রশ্ন হইতেছে যে কোন্ কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় ও কোন্ কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জনের হানি হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেও বৈধাবৈধের তর্ক উঠে, অর্থাৎ যাহা ধর্ম্ম জীবনে সহায় তাহাই

বৈধ ও ন্যায্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্মজীবনে যাহা অন্তরায় তাহাই অবৈধ ও অন্যায কর্ম্ম। বস্তুতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যাযান্যাযের চরমাবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সংক্ষেপে আমরা এখানে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক প্রযোজনীযতা সম্বন্ধে বলিলাম। এখন ইহা বোধ হয সকলেরই স্বীকার্য্য হইবে যে কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও গতি নাই, অতএব কোন্ কর্ম্ম বৈধ ও কোন্ কর্ম্ম অবৈধ ইহা যে একটী গুরুতর আলোচনার বিষয় ইহা বুঝাইতে আর অধিক প্রযাসের আবশ্যক নাই।

প্রশ্নটি যেমন প্রযোজনীয তেমনই কঠিন। এই সম্বন্ধে মতামতও বিস্তর। এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" এই প্রাচীন কথাটি যেমন খাটে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয অন্য কোন স্থলে তত খাটে না। জগতের আদিকাল হইতে এই প্রশ্ন লইযা কত ঘোর তর্ক হইযা গিযাছে তাহা পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকেই কিছু না কিছু জানেন কিন্তু অদ্যাবধি এমন কোন মীমাংসায কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই যাহাতে সকলেই এমন কি অধিকাংশ লোকেই এক মত হইতে পারেন। দর্শন শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবের সময হইতে আজি পর্য্যন্ত কত দার্শনিক এই প্রশ্নের মিমাংসা করিতে গিযা কত প্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মত প্রচার করিয়া গিযাছেন, আবার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ এই একই প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইযা পূর্ব্বতন দার্শনিক গণের প্রাচীন মত গুলিকে কেহ কেহ পুনরায় নূতন ভাবে প্রচার করিযাছেন, এ সকল কথা বিস্তার করিয়া লেখা মূল প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। গুরুতর বিষয় আলোচনার বিশেষ উপকার আছে ভাবিযা পাঠক গণের সহিত এই প্রশ্ন লইযা একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইযাছি, নচেৎ এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাই এমন স্পর্দ্ধা আমরা করি না। আজি কালি এ দেশে ইউরোপীয দর্শনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব—যাঁহারা ইউরোপীয দর্শন শাস্ত্রের ধারও ধারেন না তাঁহারাও অনেকে ইউরোপীয যুক্তি ও তর্ক ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি বা তর্ক বুঝেন না বা গ্রহণীয মনে করেন না; তাই আমরা ইউরোপীয দর্শন শাস্ত্রের সহাযতায এই বিষযের যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ ইউরোপীয দার্শনিকগণ এই বিষয় লইযা যত আন্দোলন করিযাছেন এই বিষয সম্বন্ধে তত আন্দোলন অন্য কোন দেশীয় দার্শনিকগণ করিযাছেন কি না আমি জানি না। এই প্রশ্ন লইযা যত আন্দোলন হইযাছে তন্মধ্যে একটা স্থূল কথা এই হইতেছে যে—এই বিষয সংক্রান্ত মতান্তরের ভিতর প্রতিপাদ্য বিষয বা শেষ ফল লইযা কোন বিশেষ মতান্তর কাহারও মধ্যে নাই। যেমন চুরি করা মন্দ পরোপকার করা ভাল—এই বিষয দুইটি লইযা মত বিভিন্নতা অতি অল্প। এই খানে যত তর্ক কেবল কারণ ও যুক্তি লইযা অর্থাৎ কি কারণে বা কি যুক্তির বলে পরোপকার করা ভাল ও চুরি করা মন্দ লইযাই অধিকাংশ বিরোধ। কর্ম্মের বৈধাবৈধতা জানিবার উপায নানা প্রকারে নানা ইউরোপীয পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানে আমা-

দের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিতে পারি ; এই মতের বিপক্ষে অনেকে তর্ক করিয়া বলেন যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিবার পক্ষে যদি স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে অধর্ম্মের ও অবৈধ কর্ম্মের এত বাহুল্য কেন ? যাঁহারা এই রূপ তর্ক করেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মত অগ্রাহ্য করিয়া দ্বিতীয় এক মত স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। মতটি সংক্ষেপতঃ এই প্রকার। কর্ম্মের ফলাফল দেখা ও ভোগ করা ব্যতীত কোন্ কর্ম্ম বৈধ ও কোন্ কর্ম্ম অবৈধ তাহা জানিবার কোন স্বাভাবিক ক্ষমতা আমাদের নাই। কর্ম্ম সমূহের ফল দর্শনে ও ভোগে মানব মণ্ডলী কর্ম্ম গুলির মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করিয়া কতক গুলি কর্ম্মের ফল মন্দ জানিয়া সাধারণতঃ সেই সকল কর্ম্মকে অবৈধ কর্ম্ম বলিয়াছেন ও কতক গুলির ফল উত্তম বুঝিয়া তাহাদিগকে সাধারণতঃ বৈধ কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রকার ফল ভোগ ও দর্শন করিয়া কর্ম্মের মধ্যে ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে নিজে কিছু ধারণা করেন নাই তাঁহারা উপরি উক্ত বিজ্ঞ লোকদিগের মত জানিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের কর্ম্মের ফল স্মরণ করিয়া—কোন্ কর্ম্ম ন্যায় ও কোন্ কর্ম্ম অন্যায় তাহা স্থির করিবেন ও তদনুযায়ী কর্ম্মে রত ও নিবৃত্ত হইবেন। এই দ্বিতীয় মতাবলম্বীদিগের ভিতর ঈশ্বরে অবিশ্বাসী লোকেরই সংখ্যা অধিক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন ঈশ্বর বিশ্বাসী পণ্ডিতও আছেন যাঁহারা নীতি বিষয়ে এই মত অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বরের নৈতিক শাসনে বিশ্বাসবান তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রকারে ঐ মতটি স্থাপন করিতে তর্ক করিয়া থাকেন। আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের প্রধান উপায় ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম পুস্তকের লিখনের প্রতি বিশ্বাসকরা তাহাতেযে সমুদয় কর্ম্মের ব্যবস্থা বা নিষেধ নাই, তাহা জানিতে হইলে সেই সেই কর্ম্মের ফল দর্শন করা ও তাহা ভোগ করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যে দুইটি মতের কথা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হইল—তাহাদের মধ্যে অবস্থান্তর ভেদে নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতও আছে। এই সমুদয় অন্তর্গত মত গুলির মধ্যে দুইটি প্রধান বিষয়ের একতা আছে এবং তাহা লইয়াই এই দুইটি প্রধান মতের বিভিন্নতা হইয়াছে। প্রথমটীতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে আমাদের সকলেরই এমন স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তি আছে যাহার দ্বারা কোন্ কর্ম্ম বৈধ ও কোন্ কর্ম্ম অবৈধ ইহা আমরা মনেই বুঝিতে পারি, ইহার জন্য আমাদের সেই কর্ম্মের ফল দর্শনের প্রয়োজন নাই। আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা বৈধাবৈধ জ্ঞান এই রূপে হইয়া থাকে—মানসিক বৃত্তি বা ক্ষমতা বিশেষের দ্বারা আমরা কর্ত্তব্যের মূল তত্ত্ব গুলির বিষয় জানিতে পারি ও সেই রূপে অকর্ত্তব্যেরও মূল তত্ত্ব গুলি বুঝিতে পারি। পশ্চাৎ যুক্তি বলে উপস্থিত কর্ম্মটি কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্বের অন্তর্গত হইলে সেই কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির নিশ্চয় করি, আর ঈপ্সিত কর্ম্মটি অকর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় মূল তত্ত্বের অন্তর্গত হইলে তাহাকে অবৈধ কর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করি। পাশ্চাত্য

নৈয়ায়িক ভাষার এই বিষয় বলিতে হইলে আমরা বলিতে পারি যে স্বাভাবিক জ্ঞানে আমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কেবল সাধারণতঃ Major premise গুলিই জানিতে পারি উহারা স্বতঃই আমাদের মনে প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ কর্ম্ম করিবার বাসনা হইলেই বাঞ্ছিত কর্ম্মটী Minor premise স্বরূপ হইয়া অনুমিতির inference দ্বারা কর্ম্মের ন্যায্যান্যায বুঝিতে পারি। পাশ্চত্যদিগের Syllogism এবং আমাদের দেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মতস্থ অবয়বের ভিতর অনেকটা পার্থক্য আছে বলিয়া আমরা এখানে আমাদের দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত পারিভোষিক শব্দ ব্যবহার করিলাম না। এই কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন এই যে অনেকে আমাদের এই প্রথমবিধ মতটীকে Hutchison প্রবর্ত্তিত নীতি সম্পর্কীয় মত বিবেচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র যাঁহারা কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে Hutchison প্রবর্ত্তিত মতে এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মানবগণের এমন একটি মানসিক বৃত্তি আছে যাহাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ন্যায় আমরা প্রত্যেক কর্ম্মেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা মানসপ্রত্যক্ষ করিতে পারি, সুতরাং এখানে চিন্তাশীল পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা নীতি সম্পর্কীয় যে মতটি এখানে প্রথমবিধ মত বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছি তাহার সহিত Hutchison প্রবর্ত্তিত এই মতের অনেকটা বৈষম্য রহিয়াছে। এইখানে দুইটি কথা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা কর্ত্তব্য, একটি আমাদের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তি—যদ্দ্বারা আমরা সহজেই কর্ম্ম সমূহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা মনে ধারণা করিতে পারি, এবং অন্যটি যে কর্ম্মের ফল দেখিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের সত্যতা কর্ম্ম ফলভোগে দর্শন দ্বারা অবশ্যই প্রতিপাদিত হয়। এখানে এই দ্বিতীয় কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলা প্রয়োজন। কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহার ফল দর্শনের ও ভোগের পূর্ব্বে আমরা সেই কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারি, ইহার অর্থ এই যে আমাদের স্বাভাবিক ও মানসিক ক্ষমতা বা বৃত্তি বিশেষের দ্বারা আমরা কর্ম্ম সমূহের বৈধাবৈধতা নিশ্চয় করিতে পারি। আমাদের কর্ম্ম সমূহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক যে জ্ঞান তাহার সত্যতা বস্তুগত ফল দর্শনের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, অর্থ এই যে এই স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম বৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হয় সেইসকল কর্ম্ম আচরণ করিলে কর্ত্তার ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে মানব সাধারণের হিত হইয়া থাকে এবং এই স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম গুলিকে অবৈধ বলিয়া ধার্য্য হয় তাহার আচরণে কর্ত্তার ও মানব সাধারণের অহিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা কর্ম্মের ফল ভোগ বা দর্শন না করিয়া স্বাভাবিক জ্ঞান প্রণোদিত হইয়া তন্নির্দ্ধারিত বৈধ কর্ম্ম করিলে নিজের ও জগতের হিত হইয়া থাকে এবং তন্নির্দ্ধারিত

অবৈধ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিলেও ঐরূপ হিত হয়, ও তাহাতে রত হইলে আমাদের অহিত হইয়া থাকে। এই মত স্থাপন সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শন করা যাইবে। যাঁহারা জর্ম্মনি দেশীয় সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ Leibnitz এর দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক গুলি পড়িয়াছেন তাহারা এই মতের সহিত তৎ কর্ত্তৃক স্থাপিত "preestablished harmony" বা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত (ফলের) ঐক্যতা নামক মতটির সহিত উক্ত প্রণালীর অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা উক্ত বিখ্যাত দার্শনিকের মত গুলি জানেন তাঁহাদিগের পক্ষে আমাদের এই বর্ত্তমান কথাটা বুঝিতে সহজ হইবে ভাবিয়া এখানে আমরা Leibnitz এর "preestablished harmony" নামক মতটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। দ্বিতীয় মতের সাধারণ লক্ষণ এই যে আমরা যত দিন কর্ম্মের ফল ভোগ বা দর্শন না করি তত দিন আমরা কোন কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে পারি না। কোন কর্ম্ম স্বতঃ ভাল বা মন্দ নহে, তবে কতক গুলি কর্ম্মের দ্বারা কর্ত্তার ও জগতের লোকের হিত হয়। ও কতকগুলি কর্ম্মে কর্ত্তার ও জগতের লোকের অহিত হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুন্সী।

নিশীথ-ছায়া।

বিভাবে বিভোরা যামিনী।
না জানি কি রস আবেশে, অবসাদবাসে, এলোকেশে
সাজিলা অপরূপা যোগিনী।
স্বরগ মরত বাঁধিল কি মন্ত্রে, নীরবে কত কথা তন্ত্রে তন্ত্রে,
ফল আঁখি অনিমিক, তারকা ঝিকি মিক,
দিক ব্যোমপ্রসারিণী।
পর নব অবসাদ ভূষণ, অসিত বরণী রূপ মগন,
নেহার হৃদয়ে তব, দুলত পদরাজীব,
ঝরে কি সুধাতরঙ্গিণী।

এস বিভাবরি! কতকাল তোমার লীলাময়ী ছায়ায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছি, কত বর্ণের কত চিত্র সেই ছায়াতরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে, আর ক্রমাগত এই প্রাণ ক্ষণেক মোহিত, ক্ষণেক বিচলিত বা ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়াছে—এস, এস,

মেদিনী গগন ছাইয়া এস। তোমার সহস্র ঢুলু ঢুলু উজ্জ্বল নয়ন দিগন্তে পাতিয়া, জীবশক্তি-প্রয়োগ ধীরে ধীরে সম্বরিয়া, চিত্ত-বিক্ষেপ-জাত গ্রন্থিহীন বৈচিত্র লইয়া ঝিল্লিরব মন্ত্রে তন্দ্রাজাল বিছাইয়া এস, এস তিমিররঙ্গিণি, মায়া বিসর্পিণি। এস বিভাবরি। সংকল্পে বল দিয়া, সাধন সুগম করিয়া, বাহ্যালোক আকর্ষিয়া, অন্তরালোক উন্মেষিয়া, এস প্রলয়হৃদয়বাসিনি, চরমরসভাবিনি, বিপুলভাববিহারিণি যামিনি। তোমার দ্বিভাবময়ী অঙ্গ-ছায়া—যাহার বহির্ভাবে মোহ, অন্তর্ভাবে মোক্ষ;—দেখাও সে ভীমকান্তরূপ বিভাবরি। দেখাও সে অনির্ব্বচনীয় ভ্রান্ত-শান্ত ভাব।

অত্যাচাররাক্ষস তাহার নির্ম্মমতার, ব্যাভিচারপিশাচ তাহার উচ্ছৃঙ্খলতায়, জিঘাংসাদানবী তাহার ভীষণতায়, লালসা-কুহকিনী তাহার অবৈধতায় মানব আবাস কতবার কলঙ্কিত করিয়াছে, কত সবল চিত্ত প্রতারণাগরলে জর্জ্জরিত হইয়াছে, কত দীন অনাথ জনের আর্ত্তনাদ বায়ুর প্রতিস্তর কম্পিত করিয়াছে, কত সন্তপ্ত হৃদয় নয়ন ধারায় প্রাণসার বিসর্জ্জন করিয়াছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট কত জীবন আত্ম-বৈরিতা সাধন করিয়াছে।—অরণ্যে হিংস্র পশুর শিকারান্বেষণ, আর সমাজে মানবা-কারে তাহার বিবিধ অনুকরণ—যেন নরের নরত্ব ঘুমাইয়া পশুত্ব জাগিয়া—হেন শত শত লোমহর্ষণ দৃশ্য সাক্ষী তার তুমি বিভাবরি।

নয়ন যাহা দেখে নাই, দেখিবে কল্পনা করে নাই, চিন্তা উঠিতে উঠিতে যে স্থান হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, আপনার সসীম ভাব উপলব্ধি করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেই নয়ন দূর, সুদূর প্রসারিত, কল্পনার অলৌকিক ভাবে উৎ-সাহিত। চিন্তা না জানি কি মহিমায় মহীয়সী, অসীম-অঙ্কশায়িনী। যেন নরের নরত্ব দেবত্বে সঞ্জীবিত—হেন পূর্ণানন্দ কর্ত্ত দৃশ্য—সাক্ষী তার তুমি বিভাবরি।

কোথায় কোন বিকশিত কুসুম, বিজন অজ্ঞাত দেশ, আপনার ভাবে আপনি বিভোর, সঙ্গিহীন, কেবল পথ হারা সমীর থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ ভরি-তেছে—অকস্মাৎ শত শত যোজন অন্তরে, না জানি কি কুহক বলে, সেই সৌরভ এক হৃদয় ভরিয়া দিল। বিমলতায় পূত করিল। অমনি সে মহাজন সে সৌরভ ডাকিয়া ডাকিয়া হৃদয় খুলিয়া বিলাইতে লাগিল—ধরা যেন ত্রিদিববাসে আমোদিত।

কোথা কোন গ্রহে কি গীত বাজিয়াছে—গীত আপনি বাজে, শূন্য ভরিয়া দেয়, আবার বাজে, আবার শূন্য ভরিয়া দেয়, সে গীত কেহ শুনিতে পায় না—এককালে এক জীবনতন্ত্রে তাহার আঘাত লাগিল, অমিয় স্বর, দিগ্ দিগন্ত পূর্ণ, জগৎ অপূর্ব্বরসাপ্লুত। স্বর ক্রমে উথলিত, জগৎ ততই উদ্বেলিত—জড়ের যেন চৈতন্য ফুটিয়াছে, প্রকৃতির ভিন্নতা ঘুচিয়াছে—একাত্মা, একস্বর।

ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে একটী রশ্মিধারা ঝুলি-তেছে—যুগযুগান্তর বহিয়া যাইতেছে, কে সেই রশ্মির অস্তিত্ব জানিবে? কি ঘটনায়

তাহার আভা এক চিত্ত মুকুরে কলিত হইল, শত শত সূর্য্যকরচ্ছটায় ঠিকরিয়া ঠিকরিয়া দেশ দেশান্তর আলোকিত করিল—সুপ্ত জাগরিত, হতাশ আশা স্ফূরিত, সংসারে আর সে আভা ধরে না।

হেন অলৌকিক নব নব সমন্বয়, সাক্ষী তার তুমি বিভাবরি।

রূপ আর বর্ণিবার নয়, যেন প্রাণের কি অন্তরতমদেশে সৌন্দর্য্যের ভাবটী অঙ্কুরিত ছিল, আজি তাহা বিকশিত হইয়া নয়ন সমক্ষে বিরাজিত রহিয়াছে —সেই অপরূপরূপ. হায়! সংসার আতপ-তাপে মলিন, যাহার জন্য গোপনে গোপনে এত পরিমল সঞ্চয় করিয়াছিল, কোথায় সে জন? তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে না? উর্দ্ধে, শূন্য পানে, সেই ম্লান বিভোর নয়ন নিক্ষেপিয়া একটী নির্জ্জন কক্ষের গবাক্ষ পার্শ্বে বালা বসিয়া রহিয়াছে। যেন শূন্যের বক্ষে তাহার সেই হৃদয় প্রতিম আসিয়া তাহার প্রেম-খাল ভোগ করিতেছে।

ভাবদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, গাম্ভীর্য্যগৌরব-পূর্ণ বদন, [illegible] লহরে লহরে যেন কি জ্যোতিঃ খেলিয়া বেড়াইতেছে, কোথা কোন সুদূর পর্ব্বত গহ্বরে, শিরে কৃষ্ণ কেশভার, বিশাল বক্ষঃ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত, নিবিড় কাননরাজি ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ নয়ন যেন ভবিষ্য ঘটনা-বলির দৃশ্যে ন্যস্ত। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে স্বাধীনতাধন অপহৃত হইয়াছে, কি উপায়ে পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবের উদ্ধার হইবে? জাতীয় সম্মান রক্ষিত হইবে? প্রাণের আঁধার যেন চৌদিকস্থ আঁধারে আবদ্ধ হইয়া এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করিতেছে।

বিলাস তাহার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে, প্রবৃত্তি যাহা কিছু ভোগ্য আহরণ করিয়াছে, যেন স্বভাবকে বিদ্রূপ করিতে সমুজ্জ্বল কৃত্রিম আলোক মালায় হর্ম্ম্য দীপিত, ঘন ঘন প্রমোদরোলে পার্শ্বস্থ স্তব্ধতা ভঙ্গ করি-তেছে। দেহের প্রতি অঙ্গ যেন ভোগরসে নিমজ্জিত থাকিয়া ■ তৃপ্ত নহে—তাই আকাঙ্ক্ষার এ উন্মাদোচ্ছ্বাস।

জীবিকার্জ্জন জন্য সমুচিত শ্রমান্তে গৃহে প্রত্যাগত, সামান্য আবাস, পরিবারগণকে যথাযোগ্য তুষ্ট করিয়া সামান্যরূপ আহারের পর বিরামসুখে শয়ান। যেন সন্তোষের স্নিগ্ধ কিরণে কি অপরূপ শোভা তথায় খেলা করিতেছে।

হেন বৈসাদৃশ্যময় অনুরাগচয়—সাক্ষী তার তুমি বিভাবরি।

তুমি বিপ্লবিনি। তোমার করাল ছায়ায় কতই পাপরূপ প্রকটিত।

অই দেখ, হস্তে বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া দুর্দ্দান্ত রিপু, কাহার সর্ব্বস্ব বস্তু অপ-হরণ করিতে অগ্রসর। দ্বার খট্ খট্ শব্দে পাতকীকে এই অনর্থসঙ্ঘটন হইতে নিষেধ করিল। নীচ প্রাণী নকুল তাহার কিচ্ কিচ্ রবে "কি করিতে যাও, কি করিতে যাও" বলিয়া বারণ করিল। চেতন হীন বায়ুও যেন কি তপবলে উদ্দীপিত হইয়া বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ-চ্ছলে এ নারকীয় কার্য্যানুসরণে সতর্ক করিল—দুরাত্মা সকল নিদর্শন - তুচ্ছ করিয়া কুক্রিয়াদীপ্ত হৃদয়ে অগ্রসর! যে জন

বিশ্বস্ত সরল অন্তরে তার হৃদয়পুত্তলির ছবি তোর চক্ষে ধরিয়াছিল, পিশাচ। আজি তুই অতিথি বেশে তার প্রণয়িনীর সর্ব্বস্ব ধন, অনুপম রূপের রূপ, বিমল আত্মার আভা নাশ করিতে কৃতোদ্যম। ক্রমে কামান্ধ সতীর শয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহার দেহ রাজ্যের নীলাভমুখ দ্বিরদরদ-নিন্দিত বৃন্তদ্বয় করে ধারণ করিল—তাহারা যেন এই আকস্মিক পীড়নে আকুঞ্চিত হইয়া অন্তঃপুরাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জাগরিত করিয়া দিল। সেই মূর্ত্তিমতী সরলতার কাতরোক্তি, হৃদয় ভেদী অনুনয়, হুতাশনে হবিঃক্ষেপ হইল—দুরাচার সকল নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ক্ষণিক বৃত্তি তৃপ্তির নিকট অনন্তস্থিতি বলি দিয়া অতি কুৎসিত বিভীষিকায় সেই পবিত্রান্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিল, নয়নাশ্রু সিক্ত বদন বস্ত্রাবরণে বরুদ্ধ করিয়া আপন পাশবী ক্রিয়া চরিতার্থ করিল।—রিপু স্রোত ক্ষীণ, জ্বালা—প্রবল জ্বালা, কলঙ্কের ঘোর কালিমা।

হেথায় সর্ব্বগ্রাসী লোভ, শাণিতকৃপাণ করে পূর্ণবিশ্বাস-দেবতাকে আহত করিতে স্থির সংকল্প। নিশ্চয়, এ ধর্ম্মভূষণ নৃপতির যশঃ, ভেরিরবে চারিদিক ঘোষিত হইতেছে। তোরে কর্ত্তব্যপালন জন্য পুরস্কৃত করিয়াও যাঁহার মন তুষ্ট হয় নাই, আপনি অভ্যর্থনা করিতে আগুয়ান, রাজ্যেশ্বর হইয়াও বিনয় গুণে তোর সহিত আত্মপদস্থের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, আপনি তোর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন—রাজ্যাকাঙ্ক্ষোন্মুক্ত শার্দ্দুল। আজি সেই পুণ্যাত্মার শোণিত পাতে স্থির মতি। দেখিতেছিস্ না, তোর নিজ শিরে এই কৃপাণ দোদুল্যমান্। যাহাকে কোথা আপদ হইতে রক্ষা করিবি, যাহার নিকট প্রজা ও গৃহী দুই ভাবে রক্ষণ সম্বন্ধে বদ্ধ—তাহার প্রতি আপনি অস্ত্রক্ষেপ। হায়! নরক-বিবরোদগতা নারকীত্রয়ীর প্রবোচনায় হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে; মনুষ্যত্বের সকল গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দুর্দ্দমনীয় রাজ্যলোভ সুমতি গ্রাস করিয়াছে—দানবীয় বলে বলীয়ান হইয়া সেই শান্তিক্রোড়-লালিত শয়নকক্ষে অমল ধবল নৃপ হৃদয় ভীষণাঘাতে ভিন্ন করিল।—কোথা রাজ্য-সুখ? অনিদ্রায় নিশা যাপন, শয়নে অশনে বিকট ছায়া পার্শ্ববর্ত্তী।

দেখ, দেখ, দারুণ অসন্তোষ সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, হৃদয়ের কোমলতা বিলুপ্ত করিয়া গিরিপ্রাসাদে আত্মপীড়নে রত। বসন্তে ফুল ফুটিলে তাহার হৃদয়ে সুবাস ছুটেনা, উষার তরুণরাগে জীবন ফুল্ল হয় না, সুরব বিহঙ্গ ভাষে অন্তর মধুময় করে না, সংসার—নীরস, ঘোর উত্তাপময়, ধূ ধূ মরু,—ইন্দ্রজাল-সাহায্যে ভৌতিক আত্মা সকল উদ্বোধিত করিয়া তাহাদিগের নিকট বিস্মৃতি প্রার্থনা করিল—ব্যর্থ মনোরথ। হায় নর, ভিতরে যাহার সত্ত্বর রহিয়াছে তুমি বাহিরে তাহার জন্য এত বিপর্য্যয় ঘটাইতেছ—অন্তশ্চক্ষু ফুটিল না, ক্রমে তিমির গাঢ় হইতে গাঢ়তর, প্রাণ মরু হইতে মরু, নির্জ্জীব, চির তিমিরে বিলীন।

হেথায় দেখ প্রবলদম্ভ, দেববলে রক্ষিত পঞ্চ বীরের বিনাশ সাধন করিয়া প্রভুর সন্তোষ বিধানে ধাবমান। হায়, ক্রোধোন্মত্ত-

বীর, তুমি কাহার নিযতি তোমার করতাল গত ভাবিয়াছ? যাহাদিগের প্রাণ-হিংসা সাধন করিবা আপনার বৈরনির্যাতন ■ মুমূর্ষুর ঈর্ষ্যা বৃত্তি তৃপ্ত করিতে দৃঢ়ব্রত—আশামরীচিকাভ্রান্ত, তাহারা অক্ষুণ্ণ, তুমি ঘৃণ্য হুরপনেয় দুষ্কৃতি সাধিয়া আসিলে—পঙ্ক শিশুশিরঘাতি। দুর্ব্বৃত্তির ব্যর্থতায় প্রতিক্ষোভে কি মর্ম্মাহত হইলে।

তুমি অপার রঙ্গিনী বিভাবরি! তোমার অবসাদছায়াভরে কত কৌতুক-জাল মানব মানসে অভিনীত।

স্বুবর্ণ পর্য্যঙ্কশায়ী—পথের ভিখারী, ছিন্ন কন্থায় নিদ্রিত—অপরিমিত ধন লাভে সুখী, পতিহীনা—পতি সুখে মগ্না, প্রিয়ালিঙ্গনবদ্ধা—রোরুদ্যমানা, পঙ্গু—সচ্ছন্দবিহারী, প্রবাসী—গৃহানন্দে প্রফুল্ল। একি স্বপ্ন না উদ্বোধন? বঝি, বিমল সুষুপ্তিকক্ষে অতীন্দ্রিয় জীবনের সুষমা রহস্য প্রচার।

তুমি দীক্ষাদাত্রি! তোমার শান্তিময়ী ছায়ায় কত অনুপম নীরব তত্ত্ব সংরক্ষিত।

রাজ্যসমৃদ্ধি কত কাল? রূপ যৌবন কত কাল? বলবিক্রম কত কাল? ক্ষণ-স্থির বিষয়রসে মন মগ্ন। গতি কি হইবে? লালসার তৃপ্তি নাই, বিলাসের অন্ত নাই—কিন্তু ব্যাধি, জরা, বার্দ্ধক্য, ■ সকল হইতে পরিত্রাণ কোথায়? মায়াচ্ছন্ন হইয়া দারা পুত্র পরিবার লইয়া দিন যাপন—শোক তাপের শান্তি কোথায়? বিপুল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইতেছে—কোটি কোটি প্রাণী এই সংসার ক্ষেত্রে আসিতেছে, কোথায় চলিয়া যাইতেছে। এই চক্রের পর চক্র, তাহাতে জীব কত কাল ঘূর্ণায়মান রহিবে? কেন্দ্রলাভ হইবে কিরূপে? চারিদিকে বন্ধন, মুক্তিলাভ করিবার কি উপায়? এইরূপ চিন্তায় নিদ্রিতা নবযৌবনা প্রণয়িণীর পার্শ্ব হইতে আপনারে বিচ্ছিন্ন করিয়া নবনীতমসৃণকোমলকায় সুতমুখ উপেক্ষা করিয়া রাজপুত্র—সন্ন্যাসী।

অতুলজ্ঞানগরীয়সি! অনন্ত অই যে তোমার অযুত অযুত নয়ন যেন—কত কি ভাষায় পোজ্জ্বল, যেন কত কি কাহিনী নীরবে জগতের তমে তমে নিত্য বিঘোষিত হইতেছে—একবার তাহা দেখিতে এই ক্ষীণ নয়নে বল দাও। দেখাও, বিভাবরি, এ মরভূমি যে অসীম সত্তায় অনুপ্রাণিত রহিয়াছে—সেই অমিত পুরুষ কি ভাবে নিত্যশরীরর আত্মা মুকুরে ফলিত হইয়াছেন। পূর্ব্বঋষিগণের চরণরেণু শিরে ধরিয়া, তাঁহাদিগের বাক্সুধায় চিত্ত সঞ্জীবিত করিয়া একবার এই জ্ঞানহীনে দাও, সেই জ্ঞান, জ্ঞানধাত্রি!

পুণ্যময়ি! যাঁহার শ্যামাঙ্গের ছায়া লইয়া, যাঁহার পর্ণজ্যোতির বিভাস লইয়া তুমি বিভূতিময়ী, সেই সর্ব্বভূতেশ্বর, অখিল মঙ্গলালয় আদিদেব, দুর্দ্দান্তদুরাত্মা-পুরিতা উৎপীড়িতা মেদিনীর ভার হরণ জন্য কারাগারে অবতীর্ণ। সেই ফুল্ল-ইন্দীবরবাঞ্ছিত রূপে তামস কারাগার কি অপরূপ প্রভায় আলোকিত। মেঘ পুষ্প বর্ষণ কর, দিক্ শঙ্খ নাদ কর, বায়ু ধীরে বীজন কর, নক্ষত্রনিচয় উজ্জ্বল

কান্তি ধারণ কর। দেখ, দেখ আজীবন নিবিড় গহনে ধ্যানমগ্ন তপঃশীর্ণ কত তপস্বিগণ দলে দলে সেই চরণে প্রাণ বিকাইতে উপস্থিত।

চন্দ্রিকালহরে স্নাতা ধরণী, কুঞ্জবন, তরুলতা, কুসুম কিশলয় সেই সুধারসে যেন সজীব ভাব ধারণ করিয়াছে, নীল যমুনার জল তরঙ্গে তরঙ্গে সেই আভা ছড়াইয়া খেলিয়া চলিয়াছে। গলে বনমাল, কটিতটে পীতবাস, মোহন চূড়া, মধুর মুরলীকরে, শতচন্দ্রকিরণ পদনখরে ঠিকরিয়া পড়িতেছে, ত্রিভঙ্গিম, বঙ্কিম নয়ন, কে জানে সে অপাঙ্গ মাধুর্য্যে কত যৌবনরাগফুল্ল হৃদয় উদ্ভাসিত, বাঁশী মুখে কত সুধার লহর রাধা রাধারব উথলিত, যমুনা কূল উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া শ্যামসুন্দর। রূপোচ্ছ্বাস-ঢল-ঢল গোপিনীমন আর কি গৃহে জাতিকুল ভয়ে থাকিতে পারে—চলিল, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, লোকাপবাদ, সকল তুচ্ছ করিয়া, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া, চলিল—নয়ন ভরিয়া সে রূপসুধা পান করিতে, হৃদয় ভরিয়া সে রূপ ধ্যান করিতে।

প্রেমময়ী ভীতা। অবিশ্বাসী ক্লীব যষ্টি হস্তে তাহারে সেই হৃদয়ারাধ্য ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত। অন্তর্যামী জানিতে পারিলেন—বংশী ধারী, অসি ধারিনী—বনমালী, নৃমুণ্ডমালিনী, পীতাম্বর দিগম্বরী বেশে উদিত। মোহতমঃ অপসারিত, ত্রিনয়নারবরাভয়করারূপে হৃদয় আলোকিত, প্রাণ ভক্তি ভরে পুলকিত, জোড় করে ধ্যানমগ্না ব্রজাঙ্গনা পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

কালবরণীর কাল ছবি তুমি বিভাবরি, শবপ্রতিম সুপ্ত জীবোপরি বিরাজিতা—তোমার পরম ছায়া পরমাত্মিকারূপোদ্বোধিনী,—তুমিই অভয়া, তুমিই ভৈরবী,—তুমিই সর্ব্ব সিদ্ধি দায়িনী—তুমিই সংহারবরসোন্মাদিনী—তুমিই দিক্‌বসনা মহাযোগিনী—তোমার জিহ্বা শোণিত পানে লক্ লক্, কেশ পাশ আলুলায়িত, ললাট মাঝে বিমল শশধর।

অলৌকিক-ভাব-রঙ্গিনি! তোমার একীভূত বিপুলতমঃ—বিস্তারে ক্ষীণ স্বাতন্ত্র্যতমঃ কোথায় বিলীন হয়, সেই বিশাল ছায়ায় বিমজ্জিত ধ্যাননযস্তজন বাহ্যজ্ঞাননির্লিপ্ত দেশকালপাশমুক্ত হইয়া অপার অস্তিত্ব সুখে সুখী হয়, ও তাহার দেহ যন্ত্রোত্থিত রবে স্তম্ভিত বিশ্ব ভুবন শুনিতে পায়:—

শ্যামা বিহরে প্রলয়উরে ত্রিকালরঙ্গিনী।
দিক্‌বাস, কেশ পাশ আলুলিত কাদম্বিনী।
বিষম ভ্রূকুটি পাশে, সুবিমল শশী হাসে,
বামা চলিতে চরণে ছুটে, অযুত দামিনী!
ব্রহ্ম ডিম্ব ফুটে ফুটে, লোমকূপে উঠে ফুটে,
ধরে কে জানে মহিমা কত ত্রিগুণ ধারিণী।
হিল্লোলিত অঙ্গ ছায়, কোটী রবি ভাসি যায়,
শোভেনিবিড়তিমিরে কান্তি ভুবনমোহিনী।

মোহবদ্ধ, সংসারাচ্ছন্ন জীব, কেন আত্মহারা? এই ত চক্ষু ফুটিবার সময়, এই ত মহাশক্তি মহারাত্রি নারায়ণী জগজ্জননীরে উদ্বোধন করিয়া, পশুরূপী রিপুগণকে বলি দিয়া, অভয় বর যাচিয়া, কৃতার্থ হইবার সময়। ধর, ধর মহাশিক্ষা জীব, চিরসত্যে জাগরিত করিতে আসিয়াছে বিভাবরী! দীক্ষা গ্রহণ কর। মোহ-দুঃখ-হারিণী মহা-

কালহৃদয়বাসিনী মহেশ্বরী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন কর। এই মহা দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে পরীক্ষা কালে যখন বিভাবরী ঘোরা সংহারিণী রূপ ধরিবে, সংসারের চির পালিত স্বপ্ন প্রকট সত্য সংস্পর্শে মুছিয়া যাইবে—তুমি স্থির অটল থাকিয়া সানন্দে বলিতে পারিবে—কি ভয় কালেরে? কালের কাল মহাকাল যাঁর পদানত, সেই কাল-ভয়-নাশিনী জননীর শান্তিময় অঙ্কে আমি সুখ-শায়িত।

শ্রীলঃ—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত এই দুইটীর অভেদ সম্বন্ধ। যতদিন বিধি থাকিবে, যতদিন ন্যায় থাকিবে ততদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যে বিশ্ববিধি মুকুল হইতে পুষ্প উদঘাটিত করে, বীজ হইতে তরু উৎপাদিত করে, সেই বিধিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। কার্য্য ও কারণ এই দুইটীর, অন্যান্য সম্বন্ধ অভেদনীয়। যদি পাপ নামে কোন বস্তু থাকে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত নামে অবশ্যই কোন [illegible] আছে। লেডি ম্যাকবেথ জাগ্রদবস্থায় বিভীষিকাকুলহৃদয়কে স্তোভ বচনে শান্ত করিতে পারেন। দৃঢ়-স্নায়ু পানির আঘাতে প্রবোধোন্মুখ সদসজ্জ্ঞানকে মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু সুপ্ত সময়ে স্নায়ু শিথিল হইবামাত্র মূর্চ্ছিত নির্য্যাতকের জীবন সঞ্চার হইবে, ব্যাহত অঙ্কুর পুনরুদ্যত হইবে। আরবের নিখিল গন্ধদ্রব্যে এই ক্ষুদ্র রুধিরবিন্দুর [illegible] দূর করিতে পারিলাম না। মহীয়সী মহিলা বুঝিয়াও বুঝেন না। রুধিরবিন্দু যেস্থানে রহিয়াছে ওখানে আরবের গন্ধ কিরূপে পশিবে। মানসিক বিকারে এ মুষ্টিযোগ কি করিতে পারে? পাপ ও পতন দুইটী একই কথা এবং পতন ও মৃত্যু দুইটী একই বস্তু।

পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত এই দুইটীর সম্বন্ধ কল্পিত নহে। পাপের আত্মাই দুঃখ পাপের অবয়বনিবর্ত্তকই দুঃখ। শশে যেরূপ বিষাণ সম্ভবে না পাপেও সেইরূপ সুখ সম্ভবে না। পাপ ও দুঃখের সম্বন্ধ এত নিকট যে দুঃখকে পাপের ফল বলিলেও বোধ করি সত্যের মার্গ পরিহার করা হয়। পাপে যে সুখ আছে উহা দুঃখময় সুখ। সুরাপায়ী যেরূপ সুরাপান কালে দেহেরস্ফূর্ত্তি অনুভব করে আত্মার বিস্মৃতি বোধ করে, সেইরূপ পাপীও পাপ আচরণের সময় অলীক সুখানুভব করে। সেই সুখ শুদ্ধ যে দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা নহে, উহার

আত্মাই দুঃখ। শ্মশানের চিতানলের ধূম ও পংক্তি বদ্ধ শবমূর্ত্তি দর্শনে শোকতপ্ত ব্যক্তির হৃদয় যেন শোকতাপ অতিক্রম করে, ইহার কারণ এই বহুর সহিত সমদুঃখ দুঃখী হইয়া আমরা আত্মবিস্মৃতি লাভ করি ও মহাযোগী শিবের ন্যায় উদাসীন ও অচল হই। যেমন এখানে বিস্মৃতি সুখের কারণ, সেইরূপ পাপাচারণকালেও আমরা আত্মবিস্মৃত হই। তত্ত্ববিস্মৃতিই সেই অলীক সুখের আত্মা। সুরাপান করিলে দেহ উত্তেজিত হয়, স্নায়ুমণ্ডল চলিত হয়, রক্ত সঞ্চালন ক্ষিপ্র হইতে থাকে সুতরাং সুখ বোধ হয়, কিন্তু যেমন ঘড়ীর পেণ্ডুলাম সমানুপাতে যাতায়াত করে, ঠিক সেইরূপ ঐ ক্ষিপ্রস্ফূর্ত্তিপ্রবাহ, গ্লানি ও মালিন্য উপস্থিত করে। স্নায়ু মণ্ডল যে পরিমাণে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণে অধঃগতিলাভ করে, সুতরাং শরীর আবিল হইয়া উঠে। পাপ মহাসুরা, ইহার সুখ অলীক, ইহার আত্মাদুঃখ। পাপের স্ফূর্ত্তি আত্মবিস্মৃতি বশতঃ হইয়া থাকে।

পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উভয়ের সম্বন্ধ এইরূপ বটে। পৃথিবীতে যে ইহলোক পরলোক কল্পনা করা হয়, একজন পাপ পুণ্যের বিচারক শিষ্টপালন দুষ্টদমন কারক বিধাতা যে একজন প্রসিদ্ধ আছেন ইহার অর্থ আপাততঃ যেরূপ প্রতীতি হয় সেইরূপ নহে। যেরূপ ভৌতিক জগৎএ কতিপয় বিধির সমবায় লক্ষিত হয় আত্ম জগৎএ ঠিক সেইরূপ কতিপয় বিধি আছে। যেরূপ পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, ঐ কণ্টক পদকে ক্ষতবিক্ষত করে ও দুঃখ প্রদান করে, যেরূপ গিরিশৃঙ্গ হইতে কোন সাহসিক পুরুষ ভূতলে আপনাকে নিক্ষেপ করিলে ভগ্নপাদ হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ পাপ করিলে ভুগিতে হয়। বিশ্ববিধি যেরূপ একজন চিরক্ষরণীর অন্তরালে থাকিয়া পরিচালনা করেন, আত্মজগতেরও ঠিক সেইরূপ একজন পরিচালক আছেন। তিনি দুষ্ট হন না বা মনুষ্যের ন্যায় প্রীতি অথবা অমর্ষের চিহ্ন প্রকাশ করেন না। তাহার সম্বন্ধে ভূত, ভবিষ্যৎ ভিন্ন নহে। মানুষের বৈপরীত্যবোধ তাঁহাতে নাই। তাঁহাকে বিশ্ববিধির পরিচালক বলিলে বোধ হয় দোষ হয় কারণ বিধিই তাঁহার বিকাশ। যেরূপ রশ্মিহীন সূর্য্য থাকেন না, যেরূপ তাপহীন বহ্নি থাকে না ঠিক সেইরূপ বিকাশ রহিত আত্মা থাকিতে পারে না। মানুষের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ নহে, মানুষের ন্যায় তাঁহার মনোবৃত্তি একদেশবৃত্তি নহে; অতএব দ্বন্দ্ব অথবা বৈপরীত্য সেই বিশ্ব আত্মার অপরিচিত। তিনি মানুষের ন্যায় কোটী বদ্ধ নহেন। পুণ্যাত্মাগণের পরিপোষক ও দুষ্টজনের দমন কারক কোন বাসনাধীন মানব সদৃশ বিধাতা নাই। সেই বিশ্বের আত্মভূত পরমবস্তু সকলেই চিরস্থাপিত বিধি অনুসারে করিয়া থাকেন। শুদ্ধ তাহা বলিলে দোষ হয়, এক কথায় তিনিই বিধি। তিনিই সিদ্ধাশ্রমের আত্মা; ঔদাসীন্যের এক ভূমি। লক্ষ জীবের প্রাণহানি, অথবা অসংখ্য কোটী জীবের প্রাণরক্ষা তাঁহার নিকট বিচারের বিষয়

নহে, অথবা যাদৃচ্ছিক চিকীর্ষার বিষয় নহে। সকলই বিধির অধীন এবং তিনিই বিধি। তিনি বিধি স্বরূপ, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব চলিতেছে তাঁহার নিজ আত্মাই নিজের নিকট বিধি। সমুদ্র যেরূপ বিপুল হইলেও সীমা বেলা স্বয়ং রচনা করে, বিশ্বের বিধি স্বরূপ আত্মাও সেইরূপ নিজের বিধি সৃজন করেন। পাপীর শিরে কোন দেব অসূয়াপরবশ হইয়া বজ্র উদ্যত করেন না কোন দেব রোষকষায়িত লোচনে তীব্র শাস্তি নিক্ষেপ করেন না। এক চিরন্তন ত্রিগুণাতীত বিশ্ববিধি স্বরূপ শাস্তি সকলকে চালাইতেছে। চির স্থাপিত অটলবিধিই সকলকে ঘুরাইতেছে, এখানে কোথাও যাদৃচ্ছিকতা নাহি। পাপের ফল প্রায়শ্চিত্তই বটে কিন্তু এ ফল প্রকৃত প্রস্তাবে স্বতঃসিদ্ধ। আশু ফলোৎপত্তিই হউক অথবা বিলম্বই হউক সকলই বিধির অধীন।

বলা হইয়াছে পাপের আকৃতি দুঃখ-পাপের স্বরূপ সিদ্ধির প্রীতি ... । যাহা আত্মার বিরোধী তাহাই আত্মার সম্বন্ধে দুঃখ। ফল [redacted] পাপ শব্দের অর্থই বিরোধ। যেরূপ মৃন্ময় শিলাপাত্র হইতে পারে না, সেইরূপ পাপে সুখ হইতে পারে না। আপাতপ্রতীতি তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। গিল্টি করা জিনিষ যেরূপ অকিঞ্চিৎকর হইয়া সুবর্ণের গৌরব কিছু কালের জন্য ভোগ করে, কলুষস্বভাব পাপও সেইরূপ, অলীক স্ফূর্তির চাক্‌চিক্য ধারণ করে। ব্যবহারে যেরূপ অলীক চাকচিক্য অন্তমিত হয় পরিপাক কালে পাপেরও ঔজ্জ্বল্য এবং মসৃণতা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। যে যাহার [redacted] সৃষ্ট, সে যদি সেই মার্গপরিহার করিয়া অন্যোদ্দেশে ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দোষী বলা হয়। অশ্ব যদি ক্ষীণগতি হয় তাহা হইলে লোক তাহাকে ঘৃণা করে, হংস যদি বিকট গতি হয় কবি তাহাকে চক্ষুঃশূল জ্ঞান করেন। ব্যক্তি বিশেষে উদ্দেশ্য বিশেষ আছে। উন্নিষ্ট মার্গ পরিহার করার নামই ব্যভিচার। পাপ ও পতন এক কথা। যদি আমরা নিরুদ্দেশ্য হইতাম তাহা হইলে আমাদিগের পাপের সম্ভাবনা থাকিত না, কারণ পরিহার করিবার কোন নির্দিষ্ট মার্গ থাকিত না।

বিশ্বনিয়ন্তা পাপ পুণ্যের অধীন নহেন কারণ তাঁহার আর কোটি লক্ষ নাহে, তাঁহার প্রকৃতি শৃঙ্খলিত নহে। বরং পাপ পুণ্যের অঙ্কুর যাদৃচ্ছিক হইতে পারে না। যেখানে প্রবৃত্তিবিরোধ বিশিষ্ট সেই স্থানে পাপের সম্ভাবনা। যদি আমাদের ... ... নাহার কারণ আমাদিগের শরীরে না থাকিত, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ থাকিত, তাহা হইলেও আমাদিগের পাপ হইত না। বিরোধই পাপের মূল ও বিরোধের আত্মা দুঃখ।

একণে দেখা গেল যে পাপ পুণ্য অঙ্কুর যাদৃচ্ছিক নহে, পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের সম্বন্ধও যাদৃচ্ছিক নহে। উভয় চিরন্তন ও অটল। কর্ম ... পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত পরস্পর সংশ্লিষ্ট। যতই পাপ করিব ততই জীবনের উন্নিষ্ট মার্গ হইতে অপসৃত হইব। সাধুর হৃদয়ে কি পরমানন্দ! তাঁহার নেত্রের সম্মুখে কি সুখময় দেশ,

তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে কি নৃত্য গীত। আর পাপী কোথায় ? সে দূরে দূরতমপ্রদেশে মহান জনকের সন্তান হইয়া বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাপানন্দে নৃত্য করিতেছে। ইহা অপেক্ষাই বা কি অধিক দুঃখ হইতে পারে। সন্মার্গ-বিস্মৃতি যেরূপ পাপের মূল, অদৃষ্ট-বিস্মৃতিও সেই রূপ পাপের ফল। লোকে যাহাকে অনুতাপ বলে তাহা একার্থে প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ, অপরার্থে প্রায়শ্চিত্তের শেষ। একত্র যেরূপ আত্মস্মৃতির আরম্ভ, অপরত্র সেইরূপ আত্মস্মৃতির শেষ। অনুতাপ প্রবাসীর স্বপ্নের ন্যায় গৃহ দেখায়। বলে, কোথায় ঘুরিতেছ, ছুটিতেছ ; ঐ দেখ, এই বিপুল তিমির ভেদ করিয়া তোমার গৃহ দীপের কিরণ গগনস্পর্শ করিতেছে। ভ্রান্ত পথিক, হতাশ্বাস হইও না, সকল বস্তুরই শেষ আছে, তোমার কষ্টেরও শেষ আছে। ছি। তুমি তোমার নিজ গৃহ চেন না।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারতের ভাবী আশা।

কি রূপে মনুষ্যসমাজ গঠিত হয় তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে মোটামুটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি মনুষ্য জাতির মধ্যে আদিম অবস্থায় জ্ঞানের সঞ্চার ও সেই জ্ঞান-বৃদ্ধি-সূত্রে পরস্পরের মধ্যে একত্র বসবাস ইচ্ছা—সম্প্রদায় বদ্ধ হইবার অভিলাষ—ক্রমে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা হইতেই ধীরে ধীরে সমাজ গঠিত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্বার্থ (Community of interest, সম মনোভাব (Community of ideas) এবং সম সংস্কার মনুষ্যদিগকে সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং ক্রমশঃ সেই সমাজ উন্নতি মুখে অগ্রসর হয়। যে আদিম মনুষ্য সম্প্রদায় মধ্যে কোন নৈসর্গিক কারণবশতঃ জ্ঞানের বিকাশ না পায় সে মনুষ্য সম্প্রদায় পূর্ব্বমত অবস্থাতেই পতিত থাকে। সে সম্প্রদায়ের আর উন্নতি হয় না। সমাজ চিরদিন একভাবে বা এক অবস্থায় থাকে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সমাজের অবস্থাও পরিবর্ত্তনশীল। জাতির উন্নতি ও পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের উন্নতি অবনতি, বা সম অবস্থায় (Same state) থাকিয়া যায়। ভারতবর্ষ তাহার সাক্ষী দিতেছে। এই ভারতবর্ষে ক্রমাগত বহুবিধ জাতির আক্রমনে, বসবাসে, নানাপ্রকার রাজনৈতিক বিপ্লবে ও অন্যান্য কারণে হিন্দুসমাজের মূল অবস্থা পূর্ব্বমতই চলিয়া আসিয়াছে। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার সুবিধা হয় নাই। ইহার কারণ

আর কিছুই নয়, বিভিন্ন জাতির ক্রমাগত সময়ে সময়ে বসবাস স্থাপন নিবন্ধন কোন জাতিরই কোন জাতির উপর সহানুভূতি ঘটে নাই। যে যার নিজ নিজ সমাজ সংস্কার অনুযায়ী কার্য্য করিত তাহাতেই আবদ্ধ থাকিত। কেহ কাহারও সহিত মিশিত না। কোনও সমাজ কোন সমাজকে এ কারণ নিবন্ধন জয় করিতে পারে নাই। আজ যদি ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এ দেশ ত্যাগ করেন ও চীনেরা আসিয়া এদেশে রাজা হয়েন তাহা হইলে কি হিন্দু সমাজ চীনদেশীয় সমাজের সহিত মিলিত হয়েন? আমার বিশ্বাস এরূপ কখনই হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজ জগতের মধ্যে এখনও একটা পৃথক ভিন্ন সমাজ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা হিন্দু সমাজের অপরিবর্ত্তনের কারণ অন্য প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করেন, আমরা তাঁহাদের মতের সহিত ঐক্য হই না। এখন অন্য কারণে পরিবর্ত্তন মূলের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন ভারতে পাশ্চত্য জ্ঞানের সহিত প্রাচ্য মনের সংযোগ হইতেছে। সেই সংযোগসূত্রে সময়ের উপযোগী উপকরণে সমাজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নবীনমূর্ত্তিতে গঠিত হইতেছে কিনা, আমাদের সমাজ ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে কি না, শিক্ষা জ্ঞানানুগত আমাদের পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা নির্ণীত হইতেছে কি না, আমাদিগের জীবন উৎকৃষ্ট পন্থায় নীত হইতেছে কিনা, এখন আমরা এইগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা সভ্যতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে কতক মৌলিকাংশ material ও আধ্যাত্মিক Spiritual অংশ আছে। আধ্যাত্মিক অংশকে আবার আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিব। মনুষ্যের মনকে যেরূপ জ্ঞান অনুভব শক্তি ও ইচ্ছা বা কার্য্যকারী শক্তি এই তিনটি লক্ষণাক্রান্ত বলা যাইতে পারে, সেইরূপ আমরা সভ্যতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব।

১ম। জ্ঞান বিষয়ে আমাদের সভ্যতার উন্নতি অর্থে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান সাময়িক উন্নতির তুলাদণ্ডে আমাদের মধ্যে সত্যের আদর বাড়িতেছে কি না এবং সমালোচন, বিশ্লেষণ, ভাল মন্দ বিচার করিবার উচ্চ শক্তি জন্মিতেছে কি না?

২য়। অনুভব শক্তি সম্বন্ধে সভ্যতার উন্নতি এই রূপ বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানের সহিত ইহা মিলিত হইয়া আমাদের মধ্যে নৈতিক মূল নিয়ম সকলের ক্রমিক আদর বাড়িতেছে কি না? স্বার্থগত মূলনীতি সূত্র গুলি একে একে তিরোহিত হইতেছে কি না এবং তৃতীয়টীর সহিত সভ্যতার উন্নতি বুঝিতে হইবেক যে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার আদর বাড়িতেছে কি না?

আমাদিগের মধ্যে এই সকল গুলি কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে অগ্রে আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের অবস্থা কিরূপ

ছিল। যদিও আমাদের পূর্ব্বকার অবস্থা জানিবার কোন সহজ পন্থা নাই, তথাপি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা সমাজের পূর্ব্বকার অবস্থার কতক আভাস পাইতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত আমাদের পূর্ব্ব অবস্থার বিশেষ-কোন সংস্রব নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-জ্ঞান সংযোগে এবং সহবাসে আমাদের যেরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত, তাহারই চিত্র অঙ্কিত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে সমাজের পূর্ব্ব অবস্থার কোন বিষয়ের কোন লক্ষণের সহিত বর্ত্তমানের তুলনার সমালোচনার প্রয়োজন হয়, তাহাই ইহাতে সম্ভব মত হইতে পারে।

প্রথম কথা—জ্ঞানের সহিত সভ্যতার উন্নতি হইলে ক্রমশঃ সত্যের আদর বাড়িবেক। বুঝিতে হইবে সত্য কাহাকে বলে, কেই বা তাহা বুঝিতে সক্ষম এবং কাহার নিকটেই বা সত্যের আদরের সম্ভাবনা। কেহ কেহ এমত বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষিত মনুষ্য অপেক্ষা আদিম অবস্থায় মানব সত্যের অধিক আদর করিত। কথাটা কতদূর ঠিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যদি আদিম অবস্থার চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করি তাহা হইলে তৎকালে সত্যের আদর অধিক হইত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। হইবে বা কিরূপে যাহার ধর্ম্মজ্ঞান হিতাহিত বিবেচনা নাই, এ জগতে "আপনার" বলিবার কোন বস্তু নাই. যাহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই, বনে বনে ভ্রমণ, যাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য, কিছুই নাই সে যে সত্য কি, তাহা জানিবে, কেনই বা সত্য কহিবে এবং কেনই বা সত্যের আদর করিবে, তাহা আমাদিগের ধারণা হয় না। এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে যদি আমরা ভারতের গৌরবের সময়ের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? মুনি ঋষি এবং ব্রাহ্মণগণ সচরাচর অপর সাধারণ অপেক্ষা সত্যের সম্মান এবং ধর্ম্ম ও নীতি রক্ষা করিতেন। কেন করিতেন? তাঁহাদিগের জ্ঞান ও মানসিক উৎকর্ষতা অপর সাধারণ অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের ছিল বলিয়া তাঁহারা তাহা করিতেন। অবশ্য তাঁহারা যে ব্রতের ব্রতী ছিলেন, সেই ব্রতই তাঁহাদিগকে অনেকটা সত্যবাদী এবং ধর্ম্মপিপাসু করিয়া রাখিয়াছিল ইহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলত জ্ঞান এবং মানসিক উৎকর্ষতাই যে তাঁহাদিগকে সেই ব্রতে ব্রতী করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা এবং সত্য প্রিয়তার আরও বিকাশ করাইত সে বিষয় বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে তখন সত্যের অর্থ যে ভাবে গৃহীত হইত, এখন আর সে ভাবে হয় না। তাঁহারা আরও বলেন যে, মনুষ্যমণ্ডলীর জ্ঞান পাইয়াও নিজের স্বার্থ পূরণ এবং ইষ্ট সাধন জন্য কত মিথ্যা কথা কহিতেছে। আমরা স্বীকার করি শিক্ষিত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মিথ্যা কথা কহেন এবং মিথ্যা এই পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ হইবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যের মূল নীতি গুলির প্রতি অধিক আদর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যের প্রতি অধিক ভক্তি দেখা যাইতেছে। চিন্তাশীল পণ্ডিতবর রুসো সাহেব বলিয়াছেন যে আমি মন্দ আদর্শ অপেক্ষা মন্দ কার্য্যকে অধিক ভাল বলি (I prefer a bad action to a bad example) পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে এরূপ হইতে পারে যে কেহ কেহ সত্য কহিত, কিন্তু বর্ত্তমানের সত্যের মূল নীতিগুলি শিক্ষিত মানবমণ্ডলীর মূল উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়াছে এবং সেই স্থলে সত্যের আদর বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বাস্তবিক মূল নৈতিক নিয়মগুলির প্রতি শিক্ষিত মানবজাতীর স্পৃহা বাড়িতেছে কিনা এবং মনুষ্যের কার্য্য অপেক্ষা কার্য্যের মূল নীতিগুলির (Principles) ভাল হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি চিন্তাশীল পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিলাম।

The epoch which occupies us is without doubt one of the most brutal one of the rudest in our history, one of those in which we meet with the greatest amount of crime and violence... ... To him who merely takes into consideration the positive and practical state of society all this poetry, all this morality of chivalry appears like a mere falsehood. And still we cannot deny but that chivalry morality poetry, existed side by side with these disorders......... It is precisely this contrast which forms the great characteristic of the Middle Ages Carry back your thought towards other societies, towards Greek or Roman societies for example, towards the first youth of Greek society, towards its heroic age of which the poems which bear the name of Homer are a faithful mirror There is nothing there resembling that contradiction which strikes us in the Middle Ages The practice and theory of manners are nearly conformable, we do not find that men have ideas far more pure, more elevated more generous than their daily actions The heroes of Homer do not seem to have an idea of their brutality, their ferocity their egoism, their avidity, their moral knowledge is no better than their conduct, their principles do not rise above their acts It is the same with almost all other societies in their strong and trubulent youth. In our Europe on the contrary in those Middle Ages which we are studying facts are habitually

detestable. Crimes, disorders of all kinds abound and still men have in their minds, in their imaginations pure, elevated instincts and desires, their notion of virtue far more developed their ideas of justice incomparably better than what is practised around them, than what they practised themselves .... We every where encounter it in the Middle Ages in the popular poems in the exhortations of priest, everywhere the moral thought of men aspire far above their life. We should be careful not to suppose that because it does not immediately govern actions, because practice incessently and strangely gives the lie to theory, the influence of the theory was therefore null and worthless.

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল ইহার অধিক আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই তবে এই কথা বলিয়া এইখানে শেষ করি যে, মনই মনুষ্যের কার্য্যের অনেকটা হর্ত্তা কর্ত্তা।

মানব আদিম অবস্থায় সর্ব্ব প্রথম নৈতিক নিয়মের সহায়তা লইয়া সভ্যতা মুখে অগ্রসর হয়। আমরা এস্থলে বলিয়া রাখি যে অনুভবশক্তি হইতে মূল নৈতিক নিয়মের উৎপত্তি হয়।

প্রায় সকল সভ্যজাতীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, মানব যখন প্রথম জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয় তখন কবিতাই তাঁহাদের প্রথম চিন্তার স্থান অধিকার করিয়াছিল। কবিতায় যে প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করে মনুষ্যের নিহিত নৈতিক নিয়মগুলিকে যে ভাবে প্রস্ফুটিত করে বোধ হয় অন্য কোন রূপে হয় না। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় যখন তাহাদের সমাজ বন্ধন শিথিল ছিল তখন নৈতিক নিয়ম গুলি অনেকটা উপকারে লাগিয়াছিল। ধর্ম্মই মানব ইতিহাসের সভ্যতার চিত্র। আমি এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে মূল নিতি গুলির কথা বলিতেছি। মূল নিতি সকল হইতেই মানব চরিত্র সংঘটিত হইয়াছে। মূল নীতি গুলি লইয়াই মনুষ্য ও পশু চরিত্রে প্রভেদ। মূল নীতি গুলির পূর্ণ বিকাশ পাইলে ও তাহার সহিত জ্ঞানের সংযোগ ঘটিলে মনুষ্য পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। আজ কাল অনেকের মুখে একরূপ শুনা যায়, যে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান লোকেরা পরস্পরকে ভক্তি শ্রদ্ধা কম করে। পূর্ব্বের ন্যায় সে প্রকার ভক্তি মান্য শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক ইহা যদি সত্য তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এখন লোক প্রত্যেক বিষয় নিজে নিজেই ভাল মন্দ বিচার করে। এক জনকে ভক্তি করিতে বলিলেই তাহাকে ভক্তি করে না। এখন একটা ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতার (Plea for Individuality) কথা উঠিতেছে। প্রত্যেক

বিষয়ে স্বাধীন সমালোচনা চলিতেছে। এটা আমাদের সমাজের শুভ চিহ্ন। ব্যক্তিত্ব কি, তাহা আমরা চিন্তাশীল মিল সাহেবের মত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"The human faculties of perception judgment, discriminative feeling, mental activety and even moral preference, are exercised only in making a choice. He who does anything because it is the custom, makes no choice He gains no practice either in discerning or in desiring what is best. The mental and moral, like the muscular powers, are improved only by being used. The faculties are called into no exercise by doing a thing merely because others do it, no more than by believing a thing only because other believe it If the grounds of an opinion are not conclusion to the power's own reasons his reason can not be strengthened but is likely to be weakned by his adopting it and if the inducements to an act are not such as are consentaneous to his own feelings and character, it so much done towards rendering his feelings and character inert and torpid, instead of active and energatic.

মূল নীতিগুলি পূর্ণ বিকাশ পাইলেই সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য সফল হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে তৃতীয়টীর সহিত সভ্যতার উন্নতি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ক্রমেই স্বাধীনতার আদর বাড়ীতেছে কিনা। এখন জিজ্ঞাস্য স্বাধীনতাটা কি ইহার অর্থে আমরা কি বুঝিব। নিজমত এস্থলে না বলিয়া পণ্ডিতবর গুজো সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইল।

The first that which forms the *foundation of the whole quarrel is* liberty—free will, the human will. In order to understand this fact exactly it must be disengaged from all foreign elements and strictly reduced to itself It is, I believe for want of this care, that it has been so *often but ill comprehended,* men have not placed themselves in front of the fact of liberty and of that alone, they have seen and described it so to speak, mixed up with other facts which occupy a very close position to it in moral life, but do not the less essentially differ from it For example, they have made human liberty to consist in the power to deliberate and choose between motives of action. The deliberation and judgment which proceed there from, have

been considered as the essence of free will. It is nothing of the kind. These are acts of intellect and not of liberty. It is before the intellect that the different motives of action interest, passions, opinions &c appear, the intellect considers, campares estimates, weighs and finally judges them. This is a preparatory work, which precedes the act of Will, but does not in any way constitute it. When the deliberation has taken place when man has taken full cognition of the motives which presented themselves to him and of their value then comes an entirely new fact, entirely different the fact of liberty.

Remove all recollection of intellectual deliberation of motives known and appreciated, concentrie your thought and that of the man who takes a resolution at the very moment that it occurs to him, when he says "I will, I will do so" and ask him if he could not will and do otherwise. Of a surety, you will answer—he will answer 'yes'. Here the fact of liberty is shewn.

আমাদিগের বোধ হয় স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জর্ম্মান ও ইংরাজী পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বাধীনতা মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম। আমরা কোন কোন বৃদ্ধকে এরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিতে পাই, যে পূর্ব্বে যে প্রকার ক্ষমতাশালী বিচক্ষণ পণ্ডিত লোক জন্মাইত, এক্ষণে সেরূপ জন্মে না। কথাটা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারিনা। তবে কেহ কেহ এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। যাহা হউক আমরা শ্রদ্ধাস্পদ বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ ('Plea for Individuality) হইতে এইটী উদ্ধৃত করিলাম, কারণ ইহার সহিত এই বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

"Achilles was of more importance to his soldiers than Napoleon was to his, Pericles was of greater importance to Athens than Mr. Gladstone is to England. An ordinary knight in the middle ages enjoyed more power than the richest noblemen of today. The advancement of the masses in the progressive countries of the world has effected the change. It is not that great men have ceased to be born, nor is it that they have come down to a lower level in modern time."

বিনয়কৃষ্ণ।

কবিতা।

সুখের দিবস।

(শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।)

হাসিতে খেলিতে, সুখের দিবস,
যখন আসে গো কাছে,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন,
কি ঢাকা তাহার মাঝে।
পুলকের রাঙ্গা গোলাপ কপোল,
মুখানি সুবর্ণ ভায়।
ভাবের আবেশে আঁখি ঢুলু ঢুলু।
আধ নয়নে চায়।
হেরে সে মাধুরী, আপনা পাশরি,
হৃদয় বিভোল পারা,
প্রফুল্ল কাননে, বসন্তের দিনে,
বিস্মৃতি বরিষা ধারা।
হায়! কুসুমের বুকে, গোপনে যেমন
কুটিল কীটের বাস।
বিজলীর বুকে চাপা সে যেমন
বিকট-বজ্র-ভাষ।
শিশুর বুকেতে লুকান যেমন
মৃতা জননীর ছায়া!
সুখ দিবা বুকে তেমতি গোপন
দুঃখের কালিমা কায়া।

দিন চলে যায়।

(শ্রীপ্রমীলা বসু।)

ধীরে ধীরে স্রোতের মতন,
নীরবেতে দিন ব'য়ে যায়,—
কত আশা কালের সাগরে
তারি সনে ধীরে মিশে যায়!
স্মৃতি টুকু রাখিয়ে অন্তরে,
নয়নের উপরে থাকিয়ে,
পক্ষ, মাস, বরষ, নীরবে,
একে একে যেতেছে চলিয়ে,
সময় অধীনে কার(ও) নয়,
থাকেনা সে কাহারও কথায়,
ভবপানে ফিরে ■ না চেয়ে
নিজ মনে নিজে চলে যায়,
রহিয়া'ছে পশ্চাতে পড়িয়ে,
জীবনের কাজ গুলি হায়;—
বৃথায় যে যেতেছে সময়,
দিনে দিনে আয়ু কমে যায়,
সঙ্কল্প যে পারি না সাধিতে,
এ সংসারে বাধা পদে পদে।
মানুষের স্বার্থপর মন,
প্রাণে প্রাণে হয় না মিলন।
ভীষণ পাপের আঁধারেতে
ধরণী যে রহিয়াছে চেয়ে।
জীবনের পবিত্র বাসনা
পূরে নাত কভু গো হেথায়।
মনে হয় অনন্ত সংসার
বিদ্রূপ করিছে প্রতি কাজে,
মানবের মন রেখে হায়,
চলিতে হতেছে, একি দায়!
তুচ্ছ করি নিন্দা গ্লানি সব
পাপ ভরা মানব বচন,

সংসারের পানে না চাহিয়ে,
নিজ কাজ সাধ ত্বরা মন,
বিভু পদে রাখিয়ে জীবন
যা করিতে এসেছ ধরায়,
সাধন তা কর এই বেলা,
চেয়ে দেখ দিন চলে যায়।

জয়দেব।

(শ্রীরাজচন্দ্র গোস্বামী।)

রাধার মঞ্জীর রব যমুনা পুলিনে,
শ্যামের বাঁশরী গান তমালের তলে,
কালিন্দীর কলস্বনে, পিক কুহু বোলে,
লবঙ্গ-লতিকা-মধু মঞ্জু কুঞ্জ বনে,
কে রেখেছে গাঁথি ওই ললিত স্বননে—
জগত-মধুর-ভাষা-সঙ্গীত বিমলে?
আজি ও ভারতবাসী পরাণ উথলে
কাহার সে বীণাধ্বনি পশিলে শ্রবণে?
পুরব গগনে রবি উঠি চিরদিন,
ঢালেন কিরণ ধারা জগত মাঝারে—
পুরব ভারতাকাশ সদাই মলিন
কিন্তু হায়! আবরিত ভীষণ আঁধারে।
তুমিই সে তমভেদী উদিলে হে রবি,
উজলি ভারত ভূমে জয়দেব কবি।

বিষাদ।

(শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ।)

আশা নামে ছিল রমণীয় তরু
পরণ কোমল কুসুম-শোভিত,
তার শাখা প'রে মন পাখী মোর,
গগন ভরিয়া পুলকে গায়িত।
সে পাখী অতীব ছিল সুকুমার'
সামান্য শবদে হইত চঞ্চল;
ঘন কিসলয়ে লুকায়ে রহিত,
আপনার স্বরে আপনি বিহ্বল।
হেরিত বিপিন ভেটিত গোপনে,
ভক্তি উপহার বিভুর চরণে,
সেবিত মলয় তপন কিরণে,
ভ্রমিত কখন বন হ'তে বনে।
জলিয়া গিয়াছে সে তরু সুন্দর
সে পাখী সেখানে নাহিক আর,
সে ভূমে এখন ভস্ম রাশি ভরা,
উত্তাপের ধরা জীবন সংহার,
কভু ভূমিকম্প কভু অগ্নি শিখা
গভীর গরজে হয় উদ্গীরণ,
গলিত ধাতুর প্রবল স্রোত
ধূমে সমাচ্ছন্ন দিগঙ্গনাগণ।
আর উর্ব্বরতা হবেনা তথায়,
আর সেই ভূম ছাবেনা লতায়,
ফিরিবে না পাখী পাতায় পাতায়,
বহিবে না আর বসন্ত বায়।
বহে খরস্রোতে ভীম হুতাশন,
করিবে বলিয়া প্রলয় পেষণ'
হৃদয় সম্পদ সে চারু কানন,
ছিন্ন ভিন্ন দগ্ধ বিকট দর্শন।

মেঘেতে বিজলী।

(শ্রীবামাচরণ ভট্টাচার্য্য বি, এ।)

স্বরগ-বাসিনী, মধুর হাসিনী,
বারিদ-সোহাগিনি, বালে!
অপাঙ্গে ধিক ধিকি, আলাচকমকি,
খেলিছ মেঘান্তরালে,
বারিদ-সোহাগিনি, বালে।

২

স্বরগ-দ্যুতি আনন-জ্যোতি,
বিমল-কান্তি, শোভনে,
চঞ্চলে চপলে হরষিত কপোলে,
প্রকাশিত জীমূত-ক্রোলে,
ত্রিদিব-বাসিনী, বালে !

৩

বিস্তৃত গগনে, ত্বরিত গমনে,
প্রসন্ন আননে, খেলে,
মেঘ-আবরণে, শ্রান্তি-নিবারণে,
মেঘসনে, মিশি গেলে,
শ্রম-কাতরে, বালে ।

৪

চারু-আননে, দর্দ্দুর-শোভনে,
দীপ্তি বিকাশনে, চমকে,
স্বীয় বয়ান দেখি, পদ্মমুখী সুমুখী,
ক্ষিপ্রগতি, সতি, রূপ ঠমকে
কায়-বিকাশনে, চমকে ।

৫

ত্র্যম্বক ভালে, ধক ধক জ্বলে'
যেমতি মহতী জ্বালা,
বারিদ অঙ্গে, তেমতি সুরঙ্গে,
সোহাগে খেল, প্রেম বিহ্বলা,
মোহন-মূরতি, ত্রিদিব-বালা ।

৬

বিশাল ব্যোম-পটে, উল্লাসে ছুটে,
প্রকাশ স্বীয় রূপ-গরিমা,
স্বরগ-বালে, চঞ্চলে চপলে,
প্রিয়-সোহাগে সদা পূর্ণ কামা,
সুখী, সুমুখী, তুমি, ত্রিদিব রামা !

৭

দশ দিশি আলা, তোমা রূপে বালা,
কৃষ্ণমেঘ সমাগমে, পুলক বিভোরা,
সোহাগে মরি মরি, কাঁপে তনু থর থরি,
প্রেম-বশে, ঘোর মাতোয়ারা,
বারিদ-সমাগমে, পুলক বিভোরা !

৮

যমুনা সলিলে, আনন্দে খেলে,
নাগর-কোলে, যথা ব্রজবালা,
তেমতি তুমি সতি, সোহাগে নিতি নিতি,
খেলহ জীমূত ভালে,
বারিদ-সোহাগিনি, বালে ।

৯

চারু-সঙ্গিনী, মানস-রঙ্গিনী,
আছ নিজ ভাব-বিভোলে,
ক্ষণ-প্রভা জ্যোতি, সদ্ভাব স্ফূরতি,
সুমহান্ চিত্ত অন্তরালে,
শোভনে, মোহিনি, ত্রিদিব-বালে ।

মিছে কেন থাকি এ ধরায় ।

(শ্রীলালগোপাল চক্রবর্ত্তী বি, এ,)

জন্ম যাহাদের সাথে তারা সব চলে গেল,
কেন মিছে পড়ে থাকি হায় ?
ভ্রমি দেশ দেশান্তরে এত কাল ঘুরে ফিরে,
তেমন একটী আর পাই না দেখিতে ।
নয়ন অস্থির হায় হেথা হোথা সদা চায়
কি যেন কি যেন তার, হারায়েছে ধরায়,-
শ্রবণ ব্যাকুল তায় কি যেন শুনিতে চায় ।
প্রাণ পাগলের পারা, যেন সদা দিশে হারা,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা, কি জানি সে
কিবা চায় ।
কি জানি কিসের তরে সারাদিন ঘুরে মরে
কি জানি সে কাহারে বা চায় ।
মিছে কেন থাকি এ ধরায় ?
কেন, অবিরাম গতি, অগ্রগামী স্রোতস্বতী
ধায় যথা সাগরের পানে,

বাধাবিঘ্ন নাহি মানি, কোথা যায় নাহি জানি,
চলিয়াছে আপনার মনে।
কি যেন কি যেন হায়, আকর্ষিয়া লয়ে যায়,
বুঝি আর পাবে না ফিরিতে,
বুঝি এই ভ্রমণের হবে নারে অবসান,
চিরকাল হবে রে ঘুরিতে।
সংসারের পথে আজি ভ্রমিতেছি একা একা
তাই ভয়ে কাঁদেরে হৃদয়।
তাই সদা ভাবি মনে চাহিয়া আকাশ পানে
মিছে কেন থাকি এ ধরায়।
যে দিকে নয়ন রাখি সদাই দেখিতে পাই
কি যেন কি যেন হায় চলিয়া গিয়াছে ছাড়ি,
এই আছে এই নাই, এই হেথা অন্য ঠাঁই
"কিছুই থাকেনা হায় এ জগতে এক ঠাঁই।
অভাগা আমিই শুধু চলে যেতে নাহি পারি॥
হেরিয়াছি বনফুলে অলি আসি, ফুলে ফুলে,
হরিয়া ফুলের মধু যবে তারা গেল চলে,
অভিমানে বনফুল, কাঁদিয়া হয়ে আকুল,
আপনি আপন মনে মাটিতে পড়িল ঢলে।
আমার প্রাণের মধু কে আজি করেছে চুরি
তাই সদা কেঁদে কেঁদে ভ্রমি ঘুরি ফিরি।
তাইরে আকুল হয়ে যেতে চাই নিজ গেহে,
তাইরে নয়ন মেলি, থাকি পথ পানে চেয়ে
যদি কা'রও সঙ্গ পাই পুন ঘরে ফিরে যাই।
জানিনারে কোন পথে এ ভবে আসিয়াছিনু,
জানিনারে কার সাথে ফিরে যেতে হবে পুনঃ।
জন্ম যাহাদের সাথে, তারা সব চলে গেল
জানিনারে কেন আজি জানিনারে কার তরে,
জানিনারে ▪ ধরায়, কেন মোরে ফেলে
গেল।
ভগ্ন প্রাসাদের মাঝে হুতাশ সমীর সদা
বহিতেছে ঘোর বেগে কেমনে বহিব সেথা?
কেমনে এ ভগ্ন দেহে প্রাণ বায়ু করে বাস?
হৃদয় আকুল আজি তাই ফিরে যথা তথা
আশার ভরসা করি, সবে মিলে দেহ তরি
ভাসাইনু জীবনের জলধি মাঝারে।
সকলেই চলে গেল একাকী একাকী আমি
বিশাল জলধি মাঝে রহিনু পড়িয়ে।
এবে ভগ্ন তরি লয়ে না জানি কোথায় যাই,
না জানিরে কোন পথে ফিরে পুনঃ ঘরে যাই,
তাই প্রাণ দিশে হারা আজি পাগলের পারা
কি যেন খুঁজিয়া সারা কি যেন সে কিবা
চায়।
তাই সদা ভাবি মনে চাহিয়া আকাশ পানে
কাজ কিরে এ জীবনে মিছে কেন এ ধরায়॥

খোকা।

(শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।)

কাছে থাক', খেলা কর', স্নেহের পুতলি!—
স্বরগের ছবি খানি ধরিয়া সমুখে।
হেথা আমি ব'সে থাকি উথলিত সুখে,
দেখি শুধু অনিমেষে আপনারে ভুলি!—
কি কথাটি কহিতেছ বাহু তুলি তুলি,
এত হাসি কেন বল ফুটিতেছে মুখে,
শিখেছ কি মার কাছে, বাঁধিতে এ বুকে
কোমল স্নেহের ব'লে লোহার শিকলী?
"এস' তবে হাসিরাশি, শ্রান্ত এ বুকেতে
আধেক আমার আর আধেক তাহার!
বিজড়িত স্বপ্ন-কান্ত কুতুক চোকেতে,
দিশেহারা হ'য়ে আমি ভাবি কর্ম্মকার!
অনন্তের ভারে আজি টলমল প্রাণ,
এক কণা মাঝে তুই অনন্তের গান!

গীত।

(মালকোষ)

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।)

নিবিড় জলদ জাল, যেন রে প্রলয় কাল,
গভীব জলধি জল——নাহি পারাবার।
শূন্য মহা শূন্য ঠাঁই, শূন্য বিনা কিছু নাই,
শূন্যেব জঠরে যেন——পৃথিবী কান্তার।
পৃথিবীব এক কোণে, বসে আছি এক মনে,
এক মনে একাসনে——ধ্যান বাবম্বার,
একই জগত প্রাণ, একই জগত ধ্যান,
একই সুরেব গান, দিতেছে আকাব।

——

পথ-হারা।

(শ্রীরসিক লাল দে।)

১

কাব কাছে কাঁদিব বা আমি
কে শুনিবে ক্রন্দন আমাব।
থামাবে কে শোকেব উচ্ছ্বাস,—
পরাণেব ঘোর হাহাকাব।

২

অনলে অন্তব পুড়ে যায়—,
দীরঘ নিশ্বাস বহে প্রাণে।
বিষাদ, আঁধার, পাপরাশি,—
চাবি পাশে তীক্ষ্ণ শেলহানে।

৩

আকুল, ব্যাকুল, ক্ষিপ্তমন—
অসহায়, বিষণ্ণ নিরাশ।
কে তরায় সাগর দুস্তর!
[illegible] প্রাণের পিয়াস?

৪

কে বলেরে এই ভূমণ্ডল—
সুখময় শান্তির আলয়।
কোথা স্নিগ্ধ শান্তি সরোবর,
কোথা তবে সুখ আশা-চয়।

৫

আনন্দ কুসুম কোথা ফুটে—
কোথা হয় প্রেমের অঙ্কুর।
কই হেথা সৌন্দর্য্য বিকাশ?
সংসার যে চঞ্চল ভঙ্গুর।

৬

আশা বিভা হৃদয়েতে ল'য়ে—
কুসুম-কানন মাঝে হায়।
যাইলাম লোভিতে সুবাস,
ডুবিলাম নৈরাশ্য ছায়ায়।

৭

হেরিলাম তরুতলে প'ড়ে—
ছিন্ন বৃন্ত কুসুম কোমল।
কোথা তার সৌন্দর্য্যের ছটা
শুষ্ক এবে, কোথা পরিমল?

৮

ভীতিময় শ্মশানের ছায়া—
শোক, তাপ, দুঃখ রাশি রাশি—
"শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"—
স্মৃতি পথে দেখা দিল আসি।

৯

বসিলাম তটিনীর তটে—
জুড়াইতে বিদগ্ধ এ প্রাণ।
কুলু ব'হে গেল তরঙ্গিনী –
না শুনিল বিষাদেব গান।

১০

বিষাদের [illegible] তুফান
ব'হে গেল হৃদয়ের মাঝে!
অধীর, আকুল, কাঁদে প্রাণ;
দুর্ব্বিসহ শেল বুকে বাজে!

১১
আঁধার আঁধার দেখা দিল—
পুরাণেতে হ'ল বড় ভয় ?
কি করিব, কোথা যাই চলে,
মনে হ'ল চিন্তার উদয়।

১২
জগতে কি শুধু কোলাহল—
সকলি কি শোক দুঃখময় ?
হেথা নাহি ফুটে সুখ আলো—
নাই হেথা শান্তির আলয় ?

১৩
হইয়াছি পথহারা আমি ;
লক্ষ্য ভ্রষ্ট, আঁধারেতে প'ড়ে।
কোথায় সুখের পথ আছে—,
নিরাশায় কেবা দেয় ব'লে ?

১৪
কাতরে করুণ স্বরে ডাকি -
চিদানন্দ কোথা প্রেম ময় ।
ব'লে দাও কোন পথে গেলে—
পাব আমি শান্তির আলয়।

——

স্মৃতি।

(শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ বি, এ, ।)

আমার সাধের নেশা ও কেরে ভাঙ্গিল আসি
পাইয়া নির্জ্জন।
ঘুমন্ত পুরাণ কথা ও কেরে নীরব হাসি
জাগাল এখন।
ঘুম ভাঙ্গা কথা গুলি আবেশে পড়িছে ঢুলি
হৃদয়ের চাবি ধার ঘুরিতেছে পথ ভুলি।
ও কেরে কপাট তার সাবধানে দিছে খুলি ?

(২)
সংসারের কোলাহলে ডুবে থাকি অবিরত,
আপন ইচ্ছায়।
একটু নির্জ্জন হ'লে পূর্ব্ব হাসি কান্না যত,
কে আসি ভাসায়।
অতীতের চিত্র গুলি, সম্মুখেতে ধরে তুলি
মগন সতত যাহা অগাধ বিস্মৃতি-নীরে
কতটী অস্ফুট রেখা জাগ্রত বসিয়া তীরে ॥

(৩)
ও কেরে পাগল করে গাহি পুরাতন গান
পুরাণ ভাষায় ?
ও কেরে ঢাকিল আসি এ মোর নূতন প্রাণ
পুরাণ ছায়ায় ?
আমার নূতন হাসি, ও কেরে ডুবাল আসি
পুরাতন অশ্রুমাঝে পাইয়া নির্জ্জন মোরে ?
আবার আঁধার কেন সে ঘোর নিশার
ভোরে ?

(৪)
মরুর উত্তপ্ত বায়ু সাধের উদ্যানে মোর
ও কেরে বহায় ?
নবস্ফুট ফুল গুলি আপন হাসিতে ভোর
ও কেরে শুকায় ?
জীবন্ত সংসার মোর, ও কেরে শ্মশান ঘোর
ও কেরে জ্বলন্ত চিতা যতনে দিতেছে আনি ?
ধু ধু ধু ধু শুনাইছে ও কেরে পুরাণ বাণী ?

(৫)
এই বিভীষিকা মাঝে ও কেরে আবার গায়
মধুর সুতানে ?
বাল্যের সঙ্গীত গুলি জাগিয়া বিস্ময়ে চায়
ও উহার পানে।
এ ভীতি মাঝারে তারা কেমন পাগল পারা
গেয়ে উঠে আধ আধ আপনার মনে।
ও কেরে ডাকিছে গেয়ে বাল সখাগণে ?

(৬)
সুরগের চিত্র খানি সুমুখে ধরিল কেরে
অমূল্য করেতে ?

আপনা হইতে হায় ওই চিত্র খানি হেরে
আঁকা কি রঙেতে।
ওই ত সে সখাগণ, সেই পবিত্র মিলন
সংসারের মাঝে থাকি তবু তার কতদূরে।
কেবল সরল হাসি বদন রয়েছে পুরে।

(৭)

কে তুমি বলনা মোরে এমনি অদৃশ্য ভাবে
রয়েছ লুকায়ে?
আলো আঁধারের খেলা কত এমনি দেখাবে
নির্জ্জন পাইয়ে?
দুঃখ সুখ কান্না হাসি, হৃদে দেখা দেয় আসি,
তোমার সঙ্গীত শুনে যখন যেরূপ গাওগো
কত পুরাতন কথা হৃদে মম উথলাও।

(৮)

চিনিয়াছি তোমা আমি তুমি প্রিয়তমা স্মৃতি
সঙ্গিনী আমার।
নির্জ্জন পাইলে মোরে এস তুমি নিতি নিতি
হৃদয় মাঝার।'
গেয়ে উঠ সেই খানে, অস্ফুট মধুর তানে
কি জানি কেমন ভাবে পুরাণ সঙ্গীত গুলি।
হৃদয়ের গ্রন্থি গুলি একে একে যায় খুলি" ॥

জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ।

সম্প্রতি হিন্দুমহলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীগণের মধ্যে একটি অতি সুন্দর বিরোধ চলিতেছে। বিরোধটি এইরূপ—

জ্ঞানবাদীগণ বলেন—আমরা সকলেই পরমাত্মায় লীন হইতে পারি। মানুষ জ্ঞানাদির অনুশীলন দ্বারা মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া ঈশ্বরে পরিণত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মনুষ্যের ইহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল পন্থা শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য, অল্পধী ও হীনধীর জন্য। জ্ঞান না হইলে কদাচ মানব মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। ভক্তি সকাম—সাকার উপাসনাবৎ ইহাতে কাম্য ফল প্রদান করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ইহা কদাচ মানবকে মুক্তি দিতে সমর্থ নহে। অজ্ঞান ভক্তি আবার সম্পূর্ণই নিষ্ফল।

ভক্তিবাদীগণ বলেন—আমরা সকলেই ঈশ্বরে পরিণত হইতে পারি, জ্ঞানবাদীগণের এই যে কথা, ইহা ঘোর অহঙ্কারের কথা। মানুষ চিরদিন মানুষই থাকিবে, অথবা প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় মানবে ও ঈশ্বরে চিরদিনই একটা স্বাতন্ত্র্য থাকিবে। মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি পক্ষে জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠতর উপায়। জ্ঞান ভ্রান্ত হইলে, মানুষকে অন্ধকূপে নিপতিত করিতে পারে। ভক্তি অন্ধ হইলেও শুভদা।

জাঁনাদিতে মনুষ্যত্বের যদি স্ফূর্ত্তি হইত ও যদি তাহাহইলে মানুষ ঈশ্বর হইতে পারিত, তাহাহইলে জন ষ্টুয়ার্ট মিলও ঈশ্বর হইতে পারিতেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এতদিনে ঈশ্বর হইতে পারিতেন। ভক্তি ঈশ্বরে লীন হইতে চাহে না, ভক্তি মোক্ষ চাহে না। ভক্তি রাধিকা ভগবানের প্রেমানুরতা সেবিকা। মানুষের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ আর নাই, থাকিলেও তাহার জন্য চেষ্টা অনাবশ্যক।

জ্ঞান ও ভক্তির যে বিরোধের কথা উপরে লিখিত হইল, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বড়ই সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উহাতে উভয় পক্ষেরই যেন দুই একটি বিষয়ে ভ্রম রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে যে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ সম্ভবপর, এ স্থলে যেন সে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ হইতেছে না। জ্ঞান যেন নিজের অর্থ অনর্থক বাড়াইতেছেন, ভক্তিও যেন তাঁহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া অন্য পথে গমন করিতেছেন। বিরোধের সিদ্ধান্তে গোল, বিরোধের বিষয়েও যেন গোল। আমরা এই গোলযোগে পড়িয়া বড়ই কষ্টে পতিত হইয়াছি। এবং সেই কষ্ট হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় মনস্বীগণের নিকট জ্ঞান-ভক্তির বা আমাদিগের এই গোলযোগ উপস্থিত করিতেছি, ভরসা করি তাঁহারা এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথা সাধ্য উপদেশ প্রদান করিবেন।

সর্ব্ব প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্ঞান ও ভক্তি আপনাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে উহাদের তুলনা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। একজন বলিতেছেন, মানুষ ঈশ্বরে লীন হইতে পারে, মোক্ষই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, অন্য জন বলিতেছেন, মোক্ষ মানুষের পক্ষে অহঙ্কারের কথা। তবে তুলনা হইবে কি লইয়া? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কও যেরূপ প্রকৃতির, ইহাও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির। জীবনের উদ্দেশ্য এক না হইলে ধর্ম্ম এক হইল, একথা আমরা বলিতে সম্পূর্ণ নারাজ। ভক্তি এই স্থলে বোধ হয়, স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। গীতায় যে ভক্তির কথা আছে, অন্য হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে যে ভক্তির কথা আছে, সে ভক্তি ও উপরোক্ত ভক্তি যেন এক নহে। হিন্দু ধর্ম্মোক্ত ভক্তি ত মোক্ষ স্বীকার করিয়া থাকে এবং আপনাকে সেই মোক্ষের একটি উপায় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত ভক্তি আসিল কোথা হইতে? যেখান হইতেই

'আদি' বলার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মটাকেও জ্ঞান আপনার করিয়া লইতেছেন। বস্তুতঃ জ্ঞান-ভক্তির এতদ্রূপ বিরোধে কর্ম্মের স্থান উভয় দিকেই আছে। তাহাত থাকিতেই হইবে। জ্ঞানীরও কর্ম্ম চাই, ভক্তেরও কর্ম্ম চাই, কর্ম্ম ভিন্ন কেহ সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের স্বতঃ কোন ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু এই কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "কর্ম্মণো ন সাক্ষাত মোক্ষ হেতুত্ব সমুচ্চয়ানুষ্ঠানঃ শ্রুতিষ্বাক্ষিপ্তভাবাদিভিরস্তু গম্যতে।"—কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু নয়, কিন্তু অপ্রাক্ষিপ্তভাবে কর্ম্ম যে মোক্ষের হেতু ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

আত্মক জ্ঞান, তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে প্রস্তুত নহে। যদি আমাদিগের পূর্ব্ব-কথিত ভক্তিবাদী মানুষের মোক্ষ সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিতেন, আমাদিগের প্রবন্ধ এই খানেই শেষ হইত। এই খানেই আমরা দেখাইতে পারিতাম যে জ্ঞান অনর্থক ভক্তির সঙ্গে লড়াই করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের ভক্তিবাদী তাহা করেন নাই। তিনি বলিতেছেন "ভক্তি ঈশ্বরে লীন হইতে চাহে না, ভক্তি মোক্ষ চাহে না। ভক্তি বাধিকা, ভগবানের প্রেমানুরতা সেবিকা। মানুষের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ আর নাই, থাকিলেও তাহার জন্য চেষ্টা অনাবশ্যক।"

এ কথায় ভঙ্গান্তরে বলা হইয়াছে যে মোক্ষ স্বীকার করিলেও ভক্তি স্বীয় পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। ভক্তির পদ, তাঁহার মতে, মুক্তের পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা এখন দেখাইতে চাহি যে, ভক্তিবাদী এ কথাও কহিলে জ্ঞানী তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, তুলনায় সমালোচিত হইবার জন্য তর্ক করিতে যাইতে পারে না। তুলনা হইবে কি লইয়া? ভোগ লইয়া? তাহাত সম্ভবপর নহে। জ্ঞানের ভোগ ও ভক্তির ভোগে যে তুলনীয় বড় একটা কিছুই নাই। থাকিলেও তাহা লইয়া জ্ঞানবাদীর তর্কই বা কেন? আত্মার যদি স্বাধীনতা না হইল, আত্মার যদি আত্মজ্ঞান না হইল, মোক্ষ না হইল, তবে হইল কি? ভক্তিবাদীর সুখ বা ভোগ ত কেবল তাঁহার অজ্ঞানতা নিবন্ধন! তাঁহাদের আত্মায় ও পরমাত্মার যে পার্থক্য নাই, ইহা তাঁহারা না বুঝিতে পারিয়া, সেই পরমাত্মাকে আরাধনা করিয়াই ত তাঁহারা সুখ লাভ করিয়া থাকেন, জ্ঞানের সঙ্গে এর আবার তুলনা কি? তবে যদি ভক্তিবাদী বলেন যে অজ্ঞানতাই যেখানে সুখ, সেখানে, জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতাই, বড়। আমরা এতদুত্তরে বলিব যে এ কথা সত্য নহে। অজ্ঞান ভক্তিতে যে সুখ, জ্ঞানে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ। ইহাত সহজ কথা। তত্ত্বজ্ঞানীর আত্মা যে ভক্তের আত্মার আরাধ্য পদার্থ। কোন্ পদ বাঞ্ছনীয়? আরাধ্যের না আরাধকের? কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলে বোধ হয়, ভক্তিবাদীকে এই খানেই স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞান ভক্তি অপেক্ষা বড়।

এ পর্য্যন্ত ভক্তিবাদীর যে সকল তর্ক অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ সম্পূর্ণ বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন করা গেল, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত ভক্তিবাদীর সেইরূপ কোন তর্ক নাই। প্রকৃত ভক্তিবাদী মোক্ষ স্বীকার করেন, কেবল যে স্বীকার করেন তাহা নহে, আমাদিগের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়াই মনে করেন ও আপনাকে সেই লক্ষ্য-সাধনীভূত একটি উপায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার তর্ক, মোক্ষ পক্ষে জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

কথাটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার পূর্ব্বে আর কয়েকটি কথা বলার আবশ্যক।

জ্ঞান ও ভক্তি যদি বাস্তবিক তুলনা করিয়া দেখিতে হয়, তবে তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন মতে সম্ভবপর নহে।

আমরা পূর্ব্বে ভক্তিবাদিগণের যে প্রমাদ গুলি দেখাইয়াছি, সে প্রমাদগুলি না থাকিলেও এরূপ প্রণালীতে তর্কাদি করিলে, কোন রূপ ফল লাভ এক প্রকার অসম্ভব। যাহা লইয়াই তর্ক হউক না কেন, তর্কিত বিষয়টি পূর্ব্বে অতি বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই। আমাদিগের প্রাচীন তর্কশাস্ত্রে তাই প্রত্যেক আবশ্যকীয় কথা গুলির সংজ্ঞাবলী প্রথমেই প্রদত্ত হইত। তার্কিকগণ হয় সেই সংজ্ঞা স্থির মানিয়া তাহাদিগের বক্তব্য কথা বলিতেন, নয়, সেই সংজ্ঞাই তাঁহাদিগের তর্কের বিষয় হইত। আজ কাল এইরূপ প্রথা ব[illegible] একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকেই অনেক কথার সংজ্ঞা মনে রাখিয়া তর্ক বিতর্কাদি করিয়া থাকেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে অপর পক্ষ তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া আন্তরিক একতা সত্ত্বেও কথার জন্য অথবা কথা না বুঝিবার জন্য পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়েন। আজ কাল অনেক কথারই যেন কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেই রূপেই সেই কথা ব্যবহার করেন। এইরূপে পরিষ্কার কথা গুলিও ক্রমশঃ অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া পড়িতেছে। পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু একথাটি আমাদিগকে অনেক স্থলে বুঝাইয়াছেন। ইহাতে যে কিছুমাত্র ফল নাই, বা কথার অর্থ বিস্তৃতি যে, কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাঁহারা কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হবেন, তাঁহাদিগকে কথার [illegible] স্বাধীনতা প্রদান করিলে চলিবে না। তাহা হইলে কুতর্কে তাঁহাদিগের বিচার্য্য সত্যকে ঘোর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে— যুগযুগান্তরেও তর্কের সমীচীন মীমাংসা হইবে না। আমরা জ্ঞান ভক্তির পূর্ব্বোক্ত প্রকারের তর্কে এ কথাটি যেন জলন্ত ভাবে দেখিতে পাই। আমরা মোক্ষ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির সংজ্ঞা ধরিয়া এ কথা পাঠক বর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখিতে হইবে, মোক্ষ কি ?

মোক্ষের সহজ অর্থ মুক্তি। কিসের মুক্তি ? কি হইতে মুক্তি ? এই দুইটি প্রশ্নের মধ্যেই ইহার সমগ্র ব্যাখ্যা নিহিত আছে। আমরা এখন ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মোক্ষ অর্থ আত্মার মুক্তি। মানবীয় আত্মার মুক্তির নামই মোক্ষ। সংক্ষেপে ইহাই আমাদিগের প্রথম প্রশ্নের উত্তর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ২।১টি কথা বলিবার আছে। সকলেই জ্ঞাত আছেন, হিন্দু শাস্ত্র মতে 'মানব' শুদ্ধ পঞ্চভূতাত্মক দেহ লইয়া নহে, জড় প্রকৃতি লইয়া নহে, [illegible] চিন্ময় আত্মা লইয়াও নহে, মানব এই জড় প্রকৃতি [illegible] চিন্ময় আত্মা এই উভয় লইয়া। এই উভয়ের সংযোগ, সমবায় বা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্তি হইতেই মানবের উৎপত্তি। এবং এই যে সংযোগ বা সমবায় ইহা হইতে, অথবা যে এই জড় প্রকৃতি ইহা হইতে, আত্মার স্বাধীনতা [illegible]ভেই, আত্মার মোক্ষ। এখন দেখিতে

হইবে জ্ঞান, ভক্তি কাহাকে বলে। কর্ম্ম লইয়া কোন গোল নাই।

জ্ঞানের সহজ অর্থ—জানা। বস্তুর স্বরূপ জানাই জ্ঞান। কথাটি কিছু বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাপক ও বড়ই প্রমাদ সঙ্কুল। আমরা এই জ্ঞানকে এই স্থানে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি। এক ভাগের নাম 'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'আত্মার আত্ম জ্ঞান'—অপর ভাগের নাম লৌকিক জ্ঞান। এরূপ বিভাগ যে আমরা নূতন করিয়া লইলাম, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। শাস্ত্র এই তত্ত্বজ্ঞান বা বিদ্যা, লৌকিক জ্ঞান বা অবিদ্যাদি লইয়া বিলক্ষণ বিচার করিয়া গিয়াছেন। সে সব বিচারে আমাদের সম্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি এই ভাগ দুইটিকে মনে রাখিলেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ভক্তির সহজ অর্থ—ভজনা। সেবা, উপাসনা প্রভৃতিকে ভক্তি বলা যাইতে পারে। জ্ঞান কথার ন্যায় ভক্তি কথায় ততটা গোল নাই। ভক্তির অর্থ প্রায়ঃঠিকই আছে—এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা নিষ্প্রয়োজন।

যদি মোক্ষ, জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ভক্তির বিরোধের কিছু মাত্র তাৎপর্য্য নাই। কথাটি ক্রমে পরিষ্কার হইবে।

আমাদিগের আত্মা সেই পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। এই অংশ ■ সমষ্টিতে গুণগত কোন ভেদই নাই। আমাদিগের আত্মাও যাহা, ঈশ্বরও তাহা। কিন্তু আমরা ও ঈশ্বর এক নহি। আমাদিগের আত্মা ছাড়া স্বতন্ত্র এক একটী ত্রিগুণময় চিত্ত আছে। এই চিত্তের স্বাতন্ত্র্য বা অবিশুদ্ধতা জন্য আমাদিগের আত্মা একটি "মোহময় আবরণ" কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত থাকে। পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী পাতঞ্জল যোগসূত্র সমালোচন কালে নবজীবনে পত্রগুলির এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। (১)

"আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, নিত্য, পরিবর্ত্তন-শূন্য, অর্থাৎ বরাবর একরূপই থাকে। ইহাতে বাহ্যবস্তুর এবং নিজ প্রতিবিম্ব যুক্ত চিত্তের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া জ্ঞান (২) ও অভিমান উৎপন্ন করে। যেমন স্ফটিক মণি বা নির্ম্মল কাচের নিকট জবা পুষ্প বা কোন রূপ রঙ্গিল পদার্থ আনীত হইলে এই স্ফটিক মণি বা কাচ সেই জবা পুষ্প বা রঙ্গিল পদার্থের রঙ্গে রঞ্জিত হয়, সেই রূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সম্মুখে বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব যুক্ত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া আত্মাকে স্বীয় রঙ্গে রঞ্জিত করে। এইরূপে বুদ্ধির বৃত্তি সকল আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়াতে আত্মার নিজের বলিয়া ভাসমান হয়। এইরূপে বুদ্ধির বৃত্তি সকল আত্মাতে প্রতিফলিত

১। নবজীবন। আশ্বিন, ৩য় সংখ্যা। ১৩৭ পৃষ্ঠা।

২। এই যে জ্ঞান কথাটির উল্লেখ হইল ও যে জ্ঞানের কথা ইহার পরেও উল্লেখ হইবে, এই জ্ঞান আমাদিগের সংজ্ঞাত লৌকিক জ্ঞান—অথবা তত্ত্বজ্ঞানেতর জ্ঞান বিশেষ। আমাদিগের পূর্ব্ব-বর্ণিত জ্ঞান কথাটির দ্বিবিধ অর্থ মনে না থাকিলে, এরূপ স্থলেও গোল হইবার সম্ভাবনা।

হওয়াতে আত্মার কর্তৃত্বাদি অভিমান, সুখ, দুঃখ ও নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আবার যেমন ঐ স্ফটিক বা কাচের সম্মুখ হইতে সেই জবা পুষ্প বা রঙ্গিল পদার্থ দূরে অপনীত করিলে উহার স্বীয় নির্ম্মল স্বরূপে অবস্থান করে, সেই রূপ বুদ্ধি যখন বৃত্তি শূন্য হইয়া নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, তখন আত্মাও স্বীয় নির্ম্মল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহাতে কোন রূপ বৃত্তির প্রতিবিম্ব থাকে না। বুদ্ধি ও আত্মা এক ভাবই ধারণ করে।" (১)

পূর্ব্বে আমরা যে মোহময় "আবরণের" কথা বলিয়াছি, তাহা অপসারণ করিলেই আত্মা এই নির্ম্মল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে পারে। "মোহময় আবরণ" এই কথাটি বড়ই গভীর অর্থযুক্ত। আত্মা পরিবর্ত্তন-শূন্য সুতরাং মানব দেহে ইহার অবস্থান্তর স্বীকার করা যায় না, অথচ মানবের আত্মা ও পরমাত্মায় বিস্তর প্রভেদও রহিয়াছে, এই দুইটি কথা ঠিক রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মানবের আত্মা একটি আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। যেমন কোন ভস্মস্তূপস্থিত স্বর্ণখণ্ড ও পরিষ্কার স্বর্ণ খণ্ডে মূল গত কোনই প্রভেদ নাই প্রভেদ মাত্র তাহাদের স্থিতি জন্য—সেই রূপ মানবের আত্মায় ও পরমাত্মায় মূলগত কোন প্রভেদ নাই —প্রভেদ মাত্র মানবের আত্মা আবরণাচ্ছাদিতাবস্থায় স্থিতি জন্য। আবার দেখ সে আবরণটিকে 'মোহময়' বলা হইয়াছে। কি সুন্দর বিশেষণ! সে আবরণটি আর কিছুই নহে 'মোহময়' অর্থাৎ "মায়াময়"। এখানে মায়া কথা বুঝিতে পারিলে, কথার তাৎপর্য্য অতি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং আমরা কেবল মাত্র পাঠকবর্গকে কথাটির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিতে ইঙ্গিত করিয়াই সরিয়া পড়িব। এই যে মোহের আবরণ, এটি আত্মারই (২) মোহের। আত্মা নিজে যে জানিতে পারিতেছে না যে, সে সেই পরমাত্মার অংশ, এই অজ্ঞানতা, এই মোহই, তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া পরমাত্মা হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। এই আবরণ দূর করিতে

১। এই অংশটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে আমাদিগের আত্মা ও চিত্তের সম্বন্ধ অতি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এই বিবেচনায় আমরা ইহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছি। চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের বৃত্তিশূন্যতাই যে আত্মার আত্মজ্ঞানের কারণ, তাহাও ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে। পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রীর নবজীবনে সমালোচিত পাতঞ্জল যোগসূত্র অতি উপাদেয় জিনিস হইতেছে।

২। স্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার যদি অজ্ঞানতা এখানে স্বীকার করা গেল, তবে তাহাকে পরমাত্মার ন্যায় পরিবর্ত্তন শূন্য বলি কিরূপে? এরূপ তর্কের উত্তর করিতে গেলে, পৃথক্ এক প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। আমাদিগের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। আমরা আত্মার পরিবর্ত্তন-শূন্যতা প্রমাণ না করিয়াও আমাদিগের কথা প্রমাণ করিতে পারি। মোক্ষ পর্য্যন্ত আমাদিগের আত্মার ও পরমাত্মার, পার্থক্য মানিতে আমাদিগের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বাস্তবিক কিন্তু কথা তাহা নহে। যাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে বেশি জানিতে চাহেন, পুস্তকগুলির যোগসূত্র পড়িলে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

পারিলেই, আত্মার মোক্ষ হইতে পারে। আত্মার 'সোঽহং' এই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলেই আত্মার স্বাধীনতা লাভ বা মুক্তি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে মোক্ষ পক্ষে আত্মার আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান একান্তই আবশ্যক। যদি তাহাই হইল, তবে এ হেন তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি বা কর্ম্মের তুলনা চলেনা। জ্ঞানবাদীর ন্যায় ভক্তিবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার ভক্তি এই তত্ত্বজ্ঞান আনয়নে সমর্থ, নতুবা তাহাকে আমরা মোক্ষের উপায় বলিতে পারি না। (১)

তাই বলিতেছিলাম, জ্ঞান ও ভক্তির যে বিরোধের কথা প্রথমেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উভয় পক্ষেরই ভয়ানক ভ্রম আছে। যে জ্ঞান ও যে ভক্তির তুলনা সম্ভবপর, উহাতে সে জ্ঞান ও সে ভক্তির তুলনা হইতেছে না। জ্ঞান যেন নিজের অর্থ অনর্থক বাড়াইতেছেন, ভক্তি যেন তাঁহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া অন্য পথে গমন করিতেছেন। কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই কি? না হইয়া থাকিলে এ সম্বন্ধে আরও ২।১ কথা এখানে বলিয়া লইতে পারি।

জ্ঞানবাদী তাঁহার জ্ঞানের অর্থ 'তত্ত্বজ্ঞান' ও 'তত্ত্বের জ্ঞান' উভয়ই ধরিয়া লইয়াছেন। ভক্তিবাদী সে দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন না। তত্ত্বজ্ঞান যে সাক্ষাৎ মোক্ষ একথা ভুলিয়া গিয়া তিনি সেই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গেই ভক্তির তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। মূল কথা, কিন্তু উভয়েরই ভুল। 'তত্ত্বজ্ঞান' সম্বন্ধে কোন তর্কই নাই। উহাতে আর মোক্ষে প্রভেদটা কি? প্রকৃত বিরোধ তত্ত্বজ্ঞানেতর জ্ঞানের ও ভক্তির সঙ্গে, অথবা আমরা যেরূপ বলিয়াছি—লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে ও ভক্তির সঙ্গে। এরূপ বিরোধে বোধ হয়, ভক্তি তত হটিবার পদার্থ নহে। আমরা তাহাও নিম্নে বিচার করিয়া দেখিতেছি।

সকল প্রকার লৌকিক জ্ঞানই কিছু মোক্ষের উপায় নহে। তাহা যদি হইত তবে, ভক্তিবাদীর ন্যায় আমরাও বলিতাম যে হার্ব্বার্ট স্পেনসর, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, প্রকৃত মোক্ষাধিকারী। আত্মা ও চিত্তের সম্বন্ধ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, কেবল মাত্র সেই রূপ লৌকিক জ্ঞানই মোক্ষের উপায় বটে। কেহ কেহ এরূপ জ্ঞানকেও তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু 'তত্ত্বজ্ঞান' অর্থে 'সোঽহং জ্ঞান', বুঝিয়াছি। কথার অর্থে বস্তুতঃ বড়ই গোল বাধায়। আত্মার আত্মজ্ঞান ও চিত্ত ও আত্মা সম্বন্ধীয় এই লৌকিক জ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে আবার কোন গোলযোগ উপস্থিত না হয়। একস্থলে আত্মা চিত্ত এক হইয়া বুঝিতেছে যে আমিই পরমেশ্বর—অন্যস্থলে

১। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি এ কথাই সত্য হয়, তবে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিনটি মোক্ষের উপায় এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি? অতঃপরে আমরা সেই শিখী ধিনাঃ পুরুষো ন নষ্টঃ ন্যায়ের কথা পাড়িব। এখানে জ্ঞান অর্থ যে তত্ত্বজ্ঞানেতর জ্ঞান তাহা অতি পরিষ্কারই পড়িয়া রহিয়াছে।

চিত্ত আত্মাতে এই বুদ্ধি আনিতেছে যে, আত্মা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ, তাহার মোক্ষ মানব জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি। এক স্থলে আত্মা অনুভব করিতেছে, অন্য স্থলে আত্মা কেবল মাত্র বুঝিতেছে। আর বিশদ করিতে গেলে অনেক সূক্ষ্ম হইয়া পড়িবে, এই স্থলেই এ কথা স্থগিত রাখিলাম। উক্তবিধ লৌকিক জ্ঞান কিরূপে মোক্ষের উপায় হয় তাহাও বলা যাইতেছে। উক্ত জ্ঞান মানবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, যাহাতে আত্মা পরমাত্মায় লীন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা স্বরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করে। সেই কর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মিয়া আত্মার আত্মজ্ঞান হয়—মোক্ষ হয়।

ভক্তের মোক্ষ অন্য উপায়ে সংসাধিত হয়। ভক্ত প্রথমে মোক্ষ কামনা করে না। ভক্ত প্রথমে কামনা করে ভোগ। কিন্তু এই ভোগ কামনা হইতে পরিশেষে মোক্ষ কামনা জন্মে। কিরূপে জন্মে তাহা বলা যাইতেছে।

ভক্তি অর্থ সেবা, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভক্ত পরমাত্মাকে সেবা করেন—অবশ্য ভোগের জন্যই সেবা করেন। কিন্তু সেব্য সেবককে ভোগ দিয়াই সন্তুষ্ট নহে—তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ। সেবককে ক্রমেই সেই সেব্যের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যাদিতে রত থাকিতে হয়। নহিলে ভোগ হয় না। সেইরূপ কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে, ক্রমশঃ সেবকের চিত্তশুদ্ধি জন্মে ও পরিণামে তাহার আত্মাও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভক্তিবাদীর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির কথা কেবল মাত্র জ্ঞানের বিস্তৃতার্থকে সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়া তাহারই অনর্থক দোষ ধরা মাত্র। আর জ্ঞানবাদীর ভক্তিকে মোক্ষদ না বলার কথা, তাহাও ভক্তির প্রথম ফল ও শেষফলে পার্থক্য না দেখিয়া অনর্থক দোষ ধরা মাত্র। অর্থাৎ, যে অর্থে হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি জ্ঞানী, সে অর্থে জ্ঞানকে শাস্ত্রে মোক্ষদ বলা হয় নাই, আবার যে অনুষ্ঠান দেখিয়া ভক্তিকে কাম্যফলদ কিন্তু মোক্ষদ নয় বলা হয়, সেই অনুষ্ঠান মাত্রকেই শাস্ত্রে মোক্ষের উপায় বলেন নাই—সেই অনুষ্ঠান ও সেই অনুষ্ঠানের পরিণাম বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র ভক্তিকেও মোক্ষদ বলিয়াছেন।

এক্ষণে মোক্ষের উপায় স্বরূপে চিন্তা করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানকে আমরা নিম্ন লক্ষণান্বিত দেখিতে পাই।

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা প্রথম-হইতেই উচ্চতম। পথ বড় কঠিন ও দুর্গম, পদে পদেই পদস্খলনের সম্ভাবনা।

ভক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রথমে অতি সামান্য থাকে, ক্রমে ইহা বাড়িতে থাকে, পরিশেষে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার ন্যায়ই ইহার আকাঙ্ক্ষা পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার কার্য্য চিরদিনই কিছু সকাম থাকেনা। কিন্তু ভক্তিতে ভয় নাই। ভক্তিতে বিপদ নাই। ইহাতে যে কার্য্য করে, তাহা এক প্রকারে না এক প্রকারে শুভফল প্রদান করিবেই করিবে।

কথিত হয় যে, ভক্তি সকাম, জ্ঞান

নিষ্কাম ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভক্তি প্রথমে সকাম থাকিলেও পরে নিষ্কাম হয়।

যদি ইহা দেখিয়াই বিচার করিতে হইত, তবে আমরা অম্লান বদনে এ হেন ভক্তিকে শ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত করিতে পারিতাম—উপনিষদের ধর্ম্মাপেক্ষা পুরাণের ধর্ম্মকে প্রাধান্য দিতে পারিতাম। কিন্তু একটি ঘোরতর সন্দেহে আমাদের হৃদয় আন্দোলিত করিতেছে। ভক্তি-মার্গ কি সকলেরই অবলম্বনীয়? যাহার বিন্দুমাত্র মোক্ষের উপায়ীভূত লৌকিক জ্ঞান আছে, তাহার পক্ষে ভক্তিযুক্ত কর্ম্ম কি সম্ভবপর? যদি তাহাই না হয়, তবে ভক্তিকে জ্ঞান অপেক্ষা কি করিয়া বড় বলিব? বুদ্ধি লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, সেই বুদ্ধির সঙ্গে যাহার অবস্থিতি অসম্ভব, তাহাকে কি করিয়া জ্ঞানাপেক্ষা বড় বলিব? কিন্তু তবু যেন অজ্ঞানী আমরা, আমাদিগের বলিতে ইচ্ছা হয়, ভক্তিই বড়—এ সমস্যা কে ব্যাখ্যা করিবে? (১)

আদর্শ নারী।

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air"

Gray

এই অনন্ত জগতে কত শ্রেষ্ঠ সুন্দর সুগন্ধি ফুল অন্ধকারে বনে ফুটিয়া অদৃশ্য ও অজ্ঞেয় ভাবে প্রকৃতির কোলে মিলিয়া যায়। কেহ দেখে না—তাহার সুগন্ধ অনুভব করিয়া সার্থক হইতে পারে না। কত শত নর নারী এ সংসারে স্বর্গীয় দেব ভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সুযোগাভাবে সংসারের দৃশ্যে পড়িতে বা পৃথিবীর বিশেষ কোন উপকারে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, চিরকাল গুপ্ত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছেন। আজ পর্য্যন্তও এ বঙ্গ গৃহে এরূপ এক একটী আর্য্য

---

(১) সম্প্রতি 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিমবাবু এই দুইয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিতেছেন। তাঁহার মতে দুইই প্রয়োজনীয়। জ্ঞান বিকাশ ভিন্ন ভক্তির বিকাশ ও ভক্তি বিকাশ ভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ—উভয়ই পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ-পরিপন্থী—সুতরাং মোক্ষের অন্তরায়। জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীগণ উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরস্পর মিলিত হইতে পারেন না কি?

বর্ণিত গৃহলক্ষ্মী জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহারা দয়া, দাক্ষিণ্যে, সততায়, স্বীয় কর্তব্য প্রতিপালনে, আত্মীয় স্বজন স্বামীর প্রতি ব্যবহারে, ধর্ম্মপরায়ণতায়, গৃহকার্য্যে, সমস্ত সভ্য দেশের আদর্শ নারী হইতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে চিরকাল জীবনচরিতের অভাব। এদেশের লোকেরা পাশ্চাত্য লোকদের মত নিজেদের গুণ নিজেরা গাহিতে শিক্ষা করে নাই। তাই এদেশে চিরকাল জীবনচরিতের অভাব। অথবা আজ কাল "জীবন বৃত্ত" নামে যে দুই এক খানি গ্রন্থ বাহির হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকার জীবনী-নায়কের জীবনে যে দুই একটী লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল—কি প্রকারে তিনি দ্বাবিংশতি মাত্র সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক শত্রু পক্ষকে পরাজয় করিয়াছিলেন—কি প্রকারে তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া অন্য দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন—অথবা কি প্রকারে তিনি উত্তাল তরঙ্গ-মালা-সমাকুলিত দুলঙ্ঘ্য নদ নদী অবাধে অতিক্রম করিয়াছিলেন, অধিকাংশ সেই সকল কথা লিখিয়া থাকেন। যে স্থলে রূপের গর্ব্ব, ধনের অহঙ্কার, মানের গৌরব, বা পরাক্রমের দাম্ভিকতা, সেই সকল স্থান লইয়াই গ্রন্থকার ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বভাব সম্বন্ধে, দৈনিক কার্য্য সম্বন্ধে, যাহা পাঠ করিলে লোকে প্রকৃত ভাল হইতে পারে, শিক্ষা পাইতে পারে, সে সকল একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। এটী দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে নিতান্ত অব্যবস্থার কথা।—স্ত্রীলোকের যে দুই এক খানি জীবনচরিত বাহির হইতেছে সে সমুদায়ই পাশ্চাত্য ধরণে লিখিত। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করিয়াছেন, বিলাত গিয়াছেন, দেশের কুসংস্কার নিবারণ করিয়া বিধবা বিবাহ দিয়াছেন, মূর্খ পিতা পিতামহ অনুমোদিত জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া অজ্ঞান কুসংস্কার দূর করত ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া শূদ্রে পরিণত হইয়াছেন, স্ত্রী অধীনতা পরিহার করিয়া জ্ঞান আলো প্রকাশে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সাড়ী ছাড়িয়া গাউন হ্যাট পরিয়াছেন, এক কথায় যাঁহারা সর্ব্বোতোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষা প্রাপ্ত তাহাদেরই জীবন-চরিত বাহির হইতেছে।

আমরা আজ যে লক্ষ্মীমূর্ত্তিটি সম্বন্ধে দুটী কথা জনগণকে জানাইয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তিনি আর এ জগতে নাই, তাঁহার আত্মা স্বর্গে গিয়াছে। স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তিনি নিশ্চয় তাহা লাভ করিয়াছেন। জগতে ধর্ম্মনিষ্ঠায় যদি স্বর্গ হয়, সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের আরাধনা—আর্য্য হিন্দু প্রবর্ত্তিত নিত্য নৈমিত্তক সন্ধ্যা বন্দনাদি ব্রত, নিয়ম করিলে যদি স্বর্গ হয়, দরিদ্রের প্রতি হৃদয়ের দয়ারি সদাব্রত ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিলে যদি স্বর্গ হয়, কায়মনে স্বামী দেবতার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে যদি স্বর্গ হয়, গুরুজনের প্রতি সরল অকপট ভক্তি করিলে যদি স্বর্গ হয়, সন্তান সন্ততি প্রতি কর্তব্য জ্ঞানের সহিত সাধ্যানুসারে শিক্ষার বিধান করিলে যদি স্বর্গ হয়, সর্ব্বদা

নিজের ত্যাগ স্বীকার করিয়া লোকের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিলে যদি স্বর্গ হয়, রোগীর শুশ্রূষা করিলে যদি স্বর্গ হয়, আমরণ সত্য পথে থাকিলে যদি স্বর্গ হয়, এক কথায় আর্য্যজাতি প্রবর্ত্তিত সংসারাশ্রমের স্ত্রীধর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিলে যদি স্বর্গ হয় —সজ্ঞানে পতি পুত্র পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরের শান্তিময় নাম করিতে করিতে স্বামী দেবতার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া হিন্দুবিহিত নারায়ণ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলে যদি স্বর্গ হয়, এক কথায় হিন্দু ধর্ম্ম মানিলে যদি স্বর্গ হয়, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র আত্মা স্বর্গে গিয়াছে তাহার জীবন পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় আলোকিত হয় নাই জগতে তাঁহার নাম ধন সম্পদ ও পদ মর্য্যাদায় সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তবু এচরিত্র আর্য্যজাতির আদরের ও শ্রদ্ধার সন্দেহ নাই-এহেন পবিত্র জীবন হিন্দু জাতীর মধ্যে চিরকাল আদর্শ চরিত্র। তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং প্রত্যেক পদ নিক্ষেপে আমরণ সে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ পঞ্চ ভূতে মিশাইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক গৃহিণীর আদর্শ নারি হইতে পারেন, গৃহ কার্য্যে লক্ষ্মী রূপা পতি সেবায় দময়ন্তী—স্থির অথচ ক্ষিপ্র। কার্য্যে সুশৃঙ্খল অথচ মিষ্ট ভাষী। স্নেহপ্রবণ অথচ স্থিরচিত্ত, গম্ভীর অথচ হাস্য মুখী, সর্ব্ব প্রাণীতে সম দয়া লইয়া এইরূপ নারী জন্ম গ্রহণ করিলে যদি সে দেবী চরিত্রের জীবন চরিত লেখা আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে স্বর্গীয় বামাসুন্দরী দেবীর জীবনী সম্বন্ধে দুটী কথা লেখা বোধ হয় অনাবশ্যক নহে এবং এ হেন দেবী চরিত্র যদি আদর্শ-স্থল হইতে পারে তাহা হইলে বামাসুন্দরী আদর্শ নারী ছিলেন।

তিনি কি প্রকার সদয় ভাবে দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার করিতেন—কি প্রকারে বাটীর সকলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যত্ন গ্রহণ করিতেন—কি প্রকার গৃহের সমুদায় দ্রব্যের-ভাল দ্রব্য হইতে সামান্য দ্রব্যের পর্য্যন্ত-সতর্কতা লইতেন এবং সেই সতর্কতা দ্বারা সাংসারিক অবস্থার কি প্রকার উন্নতি করিয়াছিলেন—গৃহাগত সামান্য ব্যক্তির পর্য্যন্ত কি প্রকার আদর করিতেন, কি প্রকারে নারী জাতির কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতেন, তাহা লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া বুঝা অপেক্ষা অনিমিক নয়নে ভক্তিভরে প্রত্যক্ষ করিলেই ভাল অনুভব করা যায়। যিনি এ প্রকার সৎস্বভাবান্বিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা পরের জন্য কাঁদিয়াছে—যিনি আমরণ ধর্ম্ম জীবন যাপন করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে স্বর্গীয় দেবী ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। এ হেন নারী চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সংসার স্বর্গ, বলিয়া বোধ হইবে, শান্তির সুমধুর নিনাদে নরগণ যন্ত্রণা ভুলিয়া মর্ম্মান্তিকতা, ভুলিয়া আমোদে ভোর হইবে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন গুপ্ত।

চিন্তা* ও কণকাঞ্জলি†।

(গীতিকাব্য।)

বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র অঙ্কন যেরূপ মহাকাব্যের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকারের ভাব চিত্রণও সেইরূপ খণ্ডকবিতা বা গীতি কাব্যের উদ্দেশ্য। খণ্ড কবিতাকার মানবের মন হইতে এই ভাবগুলি বাছিয়া লইয়া, তাহা বিশ্লেষিত করত তাহার অণু পরমাণু পর্য্যন্ত পাঠকবর্গকে দেখাইতে চাহেন—সেই ক্ষুদ্র অণু পরমাণু কবিতারূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাঠকবর্গের নিকট সুস্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল ও বৃহৎকায় বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি কখন সাধারণ দৃষ্টিতে অবিভাজ্য ভাব-পিণ্ডকে অতি সুন্দররূপে ভাগ করিয়া ঠকবর্গকে চমৎকৃত করেন। কখনও বা ভাববিশেষের বহিরাবরণটি নিরাকৃত করিয়া তাহার স্বরূপ প্রদর্শনে পাঠকবর্গকে মোহিত করেন। সাধারণ পাঠকবর্গের সাধারণ দৃষ্টিতে, উহাদের যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি গুণগরিমা পরিব্যক্ত থাকে, তাঁহারা অনেক সময়ে উহাদের আকৃতি প্রকৃতি গুণগরিমা তদতিরিক্ত দেখাইয়া পাঠকবর্গকে বিস্মিত করেন; পুরাতন দ্রব্যে নূতন আকার প্রদান করিয়া—পূর্ব্বানুভূত ভাবে নূতন অনুভব সংলগ্ন করিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করেন। মহাকাব্য ভাব ও ঘটনা-বলীর সমষ্টি ও সমবায় লইয়া, এক একটা Concrete চরিত্র লইয়া—খণ্ড কবিতা শুদ্ধ এই Abstract ভাব লইয়া। খণ্ড কবিতা সুতরাং মহাকাব্যের তুলনায় কিছুই নহে, কেননা মহাকাব্যে এই খণ্ড কবিতাও থাকিতে হইবে, কিন্তু তবু খণ্ড কবিতাও অবহেলার পদার্থ নহে। কারণ, ইহা না হইলে মহাকাব্য হয় না। ভাব বিশেষে ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা করিতে খণ্ড কবিতা অতি অদ্ভুত সামগ্রী।

চিন্তা ও কণকাঞ্জলি দুই খানিই খণ্ড কবিতা গ্রন্থ—গীতি কাব্য, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। যখন মানব মনোভাব কবিতার প্রাণ, তখন ঐরূপ ঘটনাই সম্ভবপর। মনুষ্য হৃদয়ে অনন্ত ভাবরাশি, অনন্ত সমুদ্রে অনন্ত লহরীর ন্যায় অবিরাম অনন্ত ক্রীড়া করিতেছে। বহিঃ প্রকৃতিতে যেরূপ অনন্ত দৃশ্য পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে—ঐ তারামালিনী মধুময়ী যামিনী, ঐ ঘনান্ধকারা ঘোরা বিভাবরী; ঐ মলয়ামোদিত ফুল সুশোভিত সুগন্ধি উদ্যান-ভূমি, ঐ ভীম ভ্রূকুটিশালী প্রচণ্ড বাত্যা-

---

* "চিন্তা।" শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৭৯নং পিপেল্‌স লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত মূল্য ১, এক টাকা।

† "কণকাঞ্জলী"। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল প্রণীত কলিকাতা ২ সুকিয়াস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য আট আনা।

লোড়িত ভীষণ সমুদ্র; ইহারা সকলেই বহিঃপ্রকৃতির যেরূপ বিভিন্ন আকৃতি বা শোভা—ঘৃণা, ভালবাসা, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি নিরাশা, মোহ, উন্মত্ততা প্রভৃতিও সেইরূপ মনোপ্রকৃতির বিভিন্ন আকৃতি বা শোভা। ফলতঃ বাহিরে আমরা যাহা দেখিতে পাই, ঠিক তাহারই সারভাগ আমাদিগের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন শোভার Essence গুলি যেন কেহ তুলিয়া আমাদিগের মনের ভিতর বাধিয়াছে। বাহিরে যাহা দেখিতে পাই, তাহা যেন শোভার শরীর—ভিতরে যাহা রহিয়াছে, তাহাই যেন শোভার প্রাণ। মহিমাময়ের এইরূপই সুন্দর রচনা কৌশল। এই বিভিন্ন প্রকারের Essence গুলিই বিভিন্ন প্রকারের খণ্ড কবিতার প্রাণ। চিন্তা ও কণকাঞ্জলি দুইটি অতি সুস্পষ্ট বিভিন্ন দলের দুই খানি অতি স্পষ্ট বিভিন্ন গীতিকাব্য। এই দুই গ্রন্থের পার্থক্য বুঝিতে হইলে, যে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা ইঁহারা মনে মনে আদর্শ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই পরিচয় পূর্ব্বে প্রদান করিতে হয়।

ইহাদের এক শ্রেণীর কবিতা যেন বিলাসিতার উদ্যানক্ষেত্র। সোহাগ, আদর, অভিমান, স্পর্শ, কটাক্ষ, আলিঙ্গন প্রভৃতি সুকোমল ফুলগুলি অতি যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে। আবেশের মৃদুমন্দ হিল্লোলে ফুলগুলি দুলিয়া দুলিয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। যৌবন-ভ্রমর এই ফুলগুলির জন্য আকুল হইয়া মত্তবেশে চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। মধ্যে স্থানে স্থানে সেতার বাজিতেছে—কলকণ্ঠ রমণীগণ তবলা মধুর ধ্বনির সঙ্গে আপন মৃদু স্বর মিশাইয়া ছোট ছোট মিষ্ট রাগিণী করিতেছে। এখানে সবই পুষ্পময়, মধুময়। এখানে শ্রোতারাও সব টেড়ী কাটা, মিহি ধুতি পরা, মিহি উড়নি গায় সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ দ্রব্য মাখা—যেন এলাইতে এলাইতে ভ্রমণ করিতেছে। সকলেই যেন গোলাপী নেশায় বিভোর। এখানে

"ধীরি ধীরি বহে মৃদুল বায়
ধীরি ধীরি ফল দুলিছে তায়
হাসিয়া হাসিয়া লতার গায়।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস
কোকিল বসিয়ে কোকিলা-পাশ
* * * হরিষে গায়॥
ছোটি ছোটি ফুল ফুলিয়ে
গলে গলে রাখি ঢুলিয়ে
চুপি চুপি * * *
ফোটি ফোটি চোকে চায়॥"

প্রহ্লাদ চরিত্র।

অন্য শ্রেণীর কবিতা যেন "সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী তরঙ্গ-ভঙ্গভীষণ, অগম্য অজেয়, ভয়ঙ্কর।" সমুদ্র যখন নিদ্রিত থাকে, অনন্ত বিস্তৃত গগনের তলে, সুধামাখা চন্দ্রকিরণ বক্ষে করিয়া, সমুদ্র যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তাহার স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি দ্রষ্টার মনে কেমন এক ঈষৎ আবেশময় শান্তি—

উদ্রেক করিয়া দেয়। আবার সমুদ্র বক্ষে প্রবল ঝটিকা হয়—ঐ বক্ষস্থিত চন্দ্রবিম্বের যখন সমুদ্রের হৃদয় খানি খণ্ড খণ্ড চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, যখন তাহার হৃৎপিণ্ডগুলি সবেগে ঊর্দ্ধাধো-প্রহত হয়, তখন তাহার তরঙ্গভঙ্গভীষণ অজেয় রুদ্র মূর্ত্তি দেখিলে, দ্রষ্টার হৃদয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রের ন্যায় বিলোড়িত হইয়া থাকে।

শ্রেণী দুইটির আদর্শ এই রূপই বিভিন্ন। ইহাদের তুলনা চলে না। এক দল কবিতার কোমল হস্ত প্রাণটিকে ব্যজন করিয়া হৃদয়ের ক্ষত প্রদেশে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া নিদ্রিত করিয়া থাকেন, আর একদল ভাবের গাম্ভীর্য্যে হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া হৃদয়টিকে উন্মত্ত করিয়া তোলেন। একই পদার্থ বা ভাব দুই দলের লোক দুই বিভিন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। এই একটা সাধারণ কথা বলিতেছি। ভালবাসার কথাই ধরা যাউক। ভালবাসার দুই মূর্ত্তি—এক হরমূর্ত্তি, অপর গৌরী-মূর্ত্তি। এক পুরুষ মূর্ত্তি—অপর প্রকৃতি মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তিতে প্রেমিক হর আত্মবিস্মৃত হইয়া জগতের প্রেমে উদাসীন—অন্য মূর্ত্তিতে গৌরী আধস্নেহ আধ ভক্তিতে লতার ন্যায় হরগাত্র বেষ্টনে চেষ্টিত। ভালবাসার স্পর্শও দুই প্রকারের—এক প্রকারের স্পর্শ পুষ্পময়, অতি কোমল, স্নিগ্ধ মধুর; অন্য প্রকারের স্পর্শ অকরুণ—মর্ম্মভেদী, অতি তীক্ষ্ণ, অতি গম্ভীর। ভালবাসায় নিদ্রা মোহ তন্দ্রা, স্বপ্নও আছে, ভালবাসায় সজীবতা, চৈতন্য গাম্ভীর্য্য, ও বীরত্বও আছে। এই দুই দলের কবি ইহার দুই মূর্ত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এক দল লইয়াছেন গৌরী-মূর্ত্তি—অন্য দল লইয়াছেন হরমূর্ত্তি। অন্যান্য পুস্তক হস্তে থাকিলে, একই বিষয়ের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদিগের কথাগুলি প্রমাণ করিতে পারিতাম।

এক দলের কবি বাহির হইতে ভাবগুলিকে যেন সদর্প বলে আহ্বান করিয়া ভিতরের হৃদয়গ্রাহ মৃদুহস্তে স্পর্শ করিতে বলেন—সে স্পর্শ পুষ্পময় অথবা হৃদয়ের উপরের স্তরে যে সকল ভাব অতি শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকে, তাহাই আস্তে আস্তে বাহিরে টানিয়া আনেন—সে বিশ্লেষণ তন্দ্রাময়।

নমুনা দেখুন :—

স্বপ্নরাণী (কণকাঞ্জলির)

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হোতে
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত হিয়া,
আসি সখা তোমায় দেখিতে।

(২)

ধীরে পড়ে বায়ুর নিশ্বাস,
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস।
ছোট ছোট তারাগুলি, ঘুমে পড়ে ঢুলি ঢুলি
ঠোঁটে কাঁপে সরমের হাস ;
নদী-পারে ডাহুক পাখী, আধ-ঘুমে থাকি থাকি,